জাতীয়তার মন্ত্রগুরু যাঁরা

প্রিয়নাথ জানা

বাণীনিকেতন
২১৭ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বর্ষ
১৫ অগস্ট ১৯৬০

প্রকাশিকা :
শ্রীমঞ্জুশ্রী জানা
২১৭, বিধানসরণী, কলিকাতা-৬

মুদ্রক :
শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

চিত্রশিল্পী :
শ্রীচন্দ্রনাথ দে

শ্রদ্ধার্ঘ্য

জাতীয়তার মন্ত্রগুরু যাঁরা
তাঁদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে

পরিচয়

বিশাল বিশ্বে মানুষের পরিচয় তার জাতীয়তায়। আর জাতীয়তার জন্ম ভৌগোলিক সীমারেখায়, স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতায় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে। যতদিন ভৌগোলিক সীমাবন্ধনে রাষ্ট্রিক অস্তিত্ব এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে, ততদিন জাতীয়তাবোধও বিরাজ করবে।

বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ ব্যতিরেকে আন্তর্জাতিকতার স্বপ্ন শূন্যে সৌধ নির্মাণের সমান। জাতি হিসেবে শক্ত সবল না হলে বিশ্বে ঠাঁই মেলা ভার। অবশ্য ইউরোপের উগ্র জাতীয়তাবোধের, অমানুষিক জাতি-বৈরতার বিভীষিকাময় ছবি মানুষের মন থেকে সহজে মুছে যাবার নয়; কিন্তু সে তো মানবতা-বিবর্জিত বিকৃত আদর্শভ্রষ্ট জাতীয়তার পরিণাম।

যে জাতির জাতীয়-দর্শনের মূল কথা মানবতা, তার জাতীয়তাবোধ তীব্র হলে তা আন্তর্জাতিকতার অন্তরায় না হয়ে বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধির সহায়কই হবে। ভারতবর্ষ সেরূপ একটি দেশ যার জাতীয়-দর্শনের ভিত্তি সত্য, শান্তি ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এদেশে জাতীয়ভাব জন্ম নিয়েছে আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে সামনে রেখে। এদেশে আধুনিক জাতীয়তার জনক যে রামমোহন বলতে গৌরববোধ করি, সেই রামমোহনই আবার শুধু ভারতে বা এশিয়ায় নয়, সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিকতার প্রথম পুরোহিত। স্বদেশের মুক্তি-ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত নির্যাতীত, নিপীড়িত দেশের মুক্তি কামনায় বিভোর হতেন তিনি।

রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তো ভারতে জাতীয়তার ভাব সংবর্ধিত হয়েছে বিগত সুদীর্ঘ সার্ধ শতাব্দী ধরে। তাই জাতীয়তা এবং

আন্তর্জাতিকতা দুই অন্তরঙ্গ সুহৃদের ন্যায় পাশাপাশি চলেছে। স্বাধীন সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্রের আদর্শ আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র। তীব্র আন্তর্জাতিক অনুভূতির জন্য অনেক ক্ষেত্রে ভারত তার জাতীয় স্বার্থও ক্ষুণ্ণ করতে দ্বিধা করে না।

পরাধীন অবস্থায় সমগ্র দেশ এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখের কথা স্বাধীনোত্তর ভারতে জাতীয়তাবোধ অত্যন্ত ক্ষীণ—বহুলাংশে বিলুপ্তপ্রায়। অথচ স্বাধীনতা রক্ষায় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অর্জনে জাতীয়তার অনুসরণ ও অনুশীলন অপরিহার্য।

সাম্প্রতিক জাতীয় দুর্গতির দিনে "জাতীয়তার মন্ত্রগুরু যাঁরা" গ্রন্থখানির প্রকাশ আমাদের জাতীয় জীবনের এক শুভ সূচনা। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীরা কিভাবে সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, সাহিত্য-সাধনা, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা, সমাজ-সেবা, রাজনৈতিক আন্দোলনাদির মাধ্যমে বিরাট মহাভারতীয় জাতিকে সহস্র শতাব্দীর সুপ্তি থেকে জাগিয়ে তোলে স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তারই সুনিপুণ ও সবিস্তার বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে এ-গ্রন্থে।

লেখকের সঙ্গে আমি সুদীর্ঘ দিন সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ। তিনি আবাল্য স্বাধীনতা-সংগ্রামী, নির্যাতীত রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর সুগভীর স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে আমি সুপরিচিত। গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে তাঁর সেই স্বদেশপ্রেম যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। জাতিকে তার জাতীয় জাগরণের ইতিহাস-সচেতন করতে গ্রন্থখানি সবিশেষ সহায়ক হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিমলেন্দু ভট্টাচার্য
সভাপতি,
মাতৃভাষা পরিষদ্

পূর্বাভাষ

বিগত শতকের বঙ্গজননী সত্যই ছিল রত্ন প্রসবিনী। মনীষীর মিছিল চলেছিল সমগ্র উনিশ শতকের বাংলায়। এর পুরোভাগে ছিলেন রামমোহন, আর পশ্চাতে সুভাষচন্দ্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের সুরু রামমোহনে, এবং পরিণতিপ্রাপ্তি সুভাষচন্দ্রে। এর মাঝে অগণিত মনস্বী মানুষ— শ্যামলা বাংলামায়ের কোল আলো করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁদের শুভসমাগমে উদ্ভাবিত হয়েছিল শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারত। বিশ্বও বিমোহিত হয়েছিল এঁদের অসাধারণ মনীষায়। শত শতাব্দীর সুপ্তিমগ্ন পরপদানত জাতির কর্ণকুহরে এঁরা দিয়েছিলেন জাগরণী মন্ত্র— জাতীয়তার মহামন্ত্র। তাই এঁরা জাতীয়তার মন্ত্রগুরু।

সেই অমৃত-নিষ্যন্দী মন্ত্রে জেগে উঠেছিল বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ। ছিন্ন হল পরাধীনতার শৃঙ্খল। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় স্বাধীনতা লাভের পর জাতির সেই মন্ত্রগুরুগণের গৌরব-কাহিনী এবং তাঁদের প্রদত্ত সঞ্জীবনী মন্ত্র দেশবাসীর বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। অথচ স্বাধীনোত্তর ভারতে জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সংবর্ধনে সে-সবের স্মরণ মনন ও অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজন। কেবল স্বাধীনতার সংগ্রামেই 'জাতীয়তার মন্ত্রে'র কাজ ফুরোয় না, স্বাধীনতা-সংরক্ষণেও তার প্রভাব অপরিসীম। সর্বদেশে সর্বযুগে মনীষী-দত্ত মন্ত্রই হয় স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী।

বর্তমানে জাতীয় জীবনের চরম সঙ্কটের দিনে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি জাতির মহামনস্বী মন্ত্রগুরুদের এবং তাঁদের জাগরণী মন্ত্রের কথা। তাই ভারতের স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন দিবসে "জাতীয়তার মন্ত্রগুরু যাঁরা" গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ।

সুদীর্ঘ শ্রমে সুগভীর অনুসন্ধান, অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্রভাবে প্রণীত হয়। কিছুকাল পূর্বে এগুলি প্রায় সবই 'জনসেবক', 'গ্রামীণ'. প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রয়োজনবোধে গ্রন্থাকারে প্রকাশ এই প্রথম। এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনে আমার অগ্রজপ্রতিম প্রবীণ সাহিত্যসাধক শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত মহাশয় আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁর নিকট আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার আমায় প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি দেখতে দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। ঐ সব প্রতিষ্ঠানের নিকট আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। আমার পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ শিবরাম মুদ্রণ সংশোধনে সহায়তা করেছে। সে আমার স্নেহভাজন। জাতীয় জীবনে গ্রন্থখানির প্রয়োজনবোধ অনুভূত হলে শ্রম সার্থক মনে করে কৃতার্থ হব।

প্রিয়নাথ জানা

সূচীপত্র

শিশু যেমন সহস্র বলবান ব্যক্তিকে ফেলিয়া বিপদের সময় পিতার কোলে আশ্রয় লইতে যায়, তেমনি আমরা দেশের দুর্গতির দিনে আর সকলকে ফেলিয়া আমাদের স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের অটল আশ্রয় অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তখন আমাদের নিরাশ হৃদয়ে তাঁহারা যেমন বলবিধান করিতে পারেন এমন আর কেহই নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ
যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদের নিত্য পরিচয়।

তাঁদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এদেশে জাতীয়তার উন্মেষ

জাতীয়তা বলতে বোঝায় একটা অখণ্ড ও অকৃত্রিম ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থানকারী মনুষ্যগোষ্ঠীর নিজ নিজ ভাব, ভাষা, চিন্তা-ভাবনা, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কৃষ্টি, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির প্রতি মমত্ববোধ এবং সে সবের স্বাধীন ও স্বাচ্ছন্দ চর্চা ও উন্নতিবিধানের প্রয়াস। ঐসবের মধ্যে যখন যথাযথ ঐক্য দেখা যায়, তখনই ঐ মনুষ্যগোষ্ঠীকে একই জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ বলা যায়। রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতাও এই জাতীয়তার সীমা নির্দেশক।

মানব সমাজের মধ্যে এই জাতীয়তার উদ্ভব সামাজিক ও ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফল। আদিম মানুষেরা গোষ্ঠীগতভাবে বিভক্ত ছিল। গোষ্ঠীপতি হ'ত তাদের প্রধান। এই প্রধানের নির্দেশেই সবাই পরিচালিত হ'ত। তাদের মধ্যে বংশধারা, ভাষা এবং জীবন-যাপন প্রণালীর ঐক্য অবশ্যই থাকত। পরবর্তীকালে মানুষের মধ্যে যখন ধর্মের প্রবর্তন হ'ল তখন ধর্মই হ'য়ে উঠল জাতীয়তার প্রধান পরিচায়ক। এই ধর্ম-প্রবর্তনা মানব সমাজের যা উপকার করেছে, অপকার করেছে ও করছে তার সহস্র গুণ। মানুষকে ঐক্যের বন্ধনে সম্মিলিত করতে গিয়ে, ধর্ম পরিশেষে তার শৃঙ্খলে পরিণত হ'ল। পরবর্তীকালে এই ধর্মই হয়েছে শোষণ, শাসন ও পরাধীনতার অমোঘ হাতিয়ার। বেশ কয়েক সহস্র বছর ধরে মানুষ ধর্মীয় সংস্কার ও কুসংস্কারে আত্মমগ্ন হয়ে নানা উন্মাদনার মধ্যে ব্যর্থ জীবন যাপন করে। এর জন্য দায়ী ধর্মের প্রবর্তক ও বিশেষ করে অনুশাসনকারীরা। পরে রাষ্ট্র-প্রবর্তন ও তার ক্ষমতা সম্প্রসারণের অবসম্ভাব্য ফলই জাতীয়তার ভিত্তিমূল। এই জাগ্রত জাতীয়তাবোধকে আশ্রয় ক'রে এক একটি স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্রের পত্তন হয়।

আদিমকাল থেকেই শক্তিশালী গোষ্ঠী অথবা জাতি অপর অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোষ্ঠী বা জাতিকে তার পশুশক্তির দ্বারা অধীনস্থ করেছে এবং তার উপর নানাভাবে পীড়ন ও ও নির্যাতন চালিয়েছে। আর অত্যাচারিত গোষ্ঠী বা জাতি ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করে স্বাধীনতা অপহরণকারী শত্রুকে পর্যুদস্ত করে স্বাজাত্য বা জাতীয়তা ও স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এই ধারা আদিকাল থেকে চলে আসছে এবং আজও চলছে। মানুষের মধ্যে এই পশুত্বের পরিসমাপ্তি এবং মানবতা বা বিশ্বজনীনতার অভ্যুদয় মানুষের শুভবুদ্ধির উন্মেষের উপরই নির্ভর করছে। আর বহুলাংশে নির্ভর করছে নয়া সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর।

সমগ্র বিশ্বেই মানবজাতিসমূহের মধ্যে আধুনিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছে খুব বেশী দিন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এর সূত্রপাত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে এই জাতীয়তার বীজ নিহিত। পশ্চিম ইউরোপের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন রাজ্যাংশগুলি এরই ফলে একীভূত হয়েছে।

উপমহাদেশ সুবিশাল ভারতবর্ষেও এই জাতীয়তার বিকাশের একটা সুস্পষ্ট (ধারাবাহিক না হলেও) ইতিহাস আছে। অনুকূল প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান ভারতবর্ষীয় মানব সমাজের মধ্যে এক জাতীয়তাবোধের অনুভূতির এক অতুলনীয় ও অত্যাদ্ভুত পরিবেশ তৈরী করে রেখেছে। এক জাতীয়তা বন্ধনের এমন অনুকূল অবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারপর তার সুপ্রাচীন ও অত্যুন্নত সাংস্কৃতিক ধারা জাতীয়তা উন্মেষণার পথে অধিকতর সহায়ক—অপর এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু তবুও সেই অতি আদিকাল থেকেই ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়ভাব জাগ্রত ছিল, এমন কথা বলা যায় না। তখন খুব হাল্‌কাভাবে হলেও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক ছিল ভারতীয় সংস্কৃতিলব্ধ বেদবেদান্ত, দর্শন, উপনিষদ এবং আরও পরে রামায়ণ ও মহাভারতাদি জাতীয় মহাকাব্যে।

প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল সর্বভূতে মৈত্রীভাবনা, নিখিল বিশ্বের কল্যাণ কামনা, তাই সীমাবদ্ধ স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতিবাৎসল্যরূপ কোনো সঙ্কীর্ণ আদর্শকে তাঁরা হৃদয়ে স্থান দেন নি। তাঁরা বৃহৎ আদর্শের মধ্যে ক্ষুদ্র আদর্শকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। এদেশীয় এক সাধকের উক্তি উদ্ধৃত করে এ-কথার প্রমাণ প্রদত্ত হ'ল :

> "মাতা মে পার্বতীদেবী পিতা দেব মহেশ্বরঃ।
> বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥"

আমাদের সুবিশাল শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করলে এইরূপ অজস্র উক্তি দেখতে পাওয়া যাবে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে মৈত্রীভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হবার উপায় বর্ণিত হয়েছে। উহা আমাদের বিমুগ্ধ করে। জাতীয়তা বা স্বদেশপ্রেম বলতে বর্তমান যুগে আমরা যা বুঝি, তার আদর্শ আমাদের শাস্ত্রে কোথাও নেই। তথাপি, একথা বলা চলে না যে, ভারতীয় শিক্ষাবিধিতে স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তার কোনো স্থান ছিল না। কেবল এইমাত্র বলা চলে যে, এ বিষয়ে ভারতীয় আদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের মতে স্বদেশপ্রেমের যথার্থ পরিচয় রয়েছে স্বদেশের আত্মার মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করায়। এবং এই আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়েই তাঁরা শুধু স্বদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বের হিত ও মৈত্রী উপলব্ধি করতেন। স্বদেশ বা স্বাধীনতার

আস্বাদ এবং পরবশ বা পরাধীনতার পীড়ন বা দুর্গতির বিষয় তাঁরা সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য মিলে নিম্নোদ্ধৃত সুপ্রাচীন প্রবচনটি থেকে :

"সর্বং আত্মবশং সুখম্,
সর্বং পরবশং দুঃখম্।"

ভারতের প্রচলিত ইতিহাস পাঠ করে অনেকের এই ধারণা জন্মে যে, ভারতে কোনোদিনই একটি মহাজাতি গড়ে উঠে নি। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এরূপ ধারণাকে একেবারে মিথ্যা বলা চলে না, সংহতির অভাব যে ভারতের দুর্গতির অন্যতম কারণ, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য বলেই স্বীকার করতে হয়। তবুও এ-কথাও সত্য যে নিখিল ভারতের একটি ভাবগত ঐক্য কোনোদিনই ক্ষুণ্ণ হয় নি। ইংরেজ শাসনাধিকারের সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা কখনো আত্মপ্রকাশ করে নি বা প্রাদেশিকতার নামে কখনো জঘন্য বর্বরতার অভিনয় হয় নি। ভারতবাসীরা যাতে সমগ্র ভারতের ভাবগত বা সংস্কৃতিগত অখণ্ডতা উপলব্ধি করতে পারে, তার জন্যই শাস্ত্রকারগণ তীর্থ যাত্রার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। তীর্থস্থানসমূহের দর্শনে সত্যই আমাদের পুণ্যলাভ হয়। কারণ, এর মধ্য দিয়েই আমরা ভারতের অখণ্ডত্ব ও পাবনত্ব উপলব্ধি করি। যিনি বিশ্ব জননী, সতী, তিনি তখন আমাদের নিকট ভারত-জননীরূপে প্রকাশিত হন। তখন 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের রহস্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। এবং রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত সঙ্গীতটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে :

"ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্বমায়ের) আঁচল পাতা।"

তর্পণের যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তার মধ্য দিয়েও দেশবাসীর মনে অখণ্ড ভারতের উপলব্ধি জেগে উঠে। যেমন—

"কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা-প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তিহ।"

অপর একটি মন্ত্র আরও সুস্পষ্ট। যেমন—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে—'যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।' আমাদের দেহ তাই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আবার বলা হয়, 'যাহা নাই ভারতে,

তাহা নাই জগতে।' তাই শাস্ত্রের নির্দেশ—'নিজের দেহকে পুণ্যভূমি ভারতভূমি বলিয়া মনে করিবে, আর সর্বদা এই চিন্তা করিবে যে সকল তীর্থ এই দেহে বিরাজিত, তাই এ দেহ শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র।' এরূপ ভাবনা বা ধ্যানের মধ্য দিয়েও আমরা ভারতের অখণ্ডত্বের উপলব্ধি করি।

রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্রকেও অখণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠাতা বলতে পারা যায়। শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবকালে ভারতবর্ষে একই সময়ে দৈব ও আসুরী সভ্যতা প্রচলিত ছিল। অযোধ্যা ও মিথিলায় ছিল দৈবী সভ্যতা, কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কায় ছিল আসুরী সভ্যতা। এই উভয় সভ্যতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য ছিল। শ্রীরামচন্দ্র সীতা-উদ্ধারকে উপলক্ষ্য করে এই উভয় রাজ্যেই আপন অলৌকিক চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কারণ, এইভাবে সদ্ ধর্ম-সংস্থাপনই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। আচার্য শঙ্করও যে একদিন তাঁর অসামান্য প্রতিভার বলে ভারতবর্ষ থেকে ধর্মের গ্লানি দূর করে, 'খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত' ভারতকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন, তাও জাতীয়তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের পুরাণে বার বার বলা হয়েছে—'ভারতভূমি দেবভূমি, ভারতভূমি পুণ্যভূমি। এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।' মহান্ ভারত সম্বন্ধে এই গৌরববোধ প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে।

অনেক সময় দেখা যায় পরবশ্যতাই জাতীয়তা উন্মেষণার দ্যোতক। বহিরাগতদের আক্রমণে ও অত্যাচারে অভ্যন্তরস্থ মানব সমাজের মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠে। ভারতবর্ষ যতদিন না অন্যকোনো দেশ বা জাতির সংস্পর্শে আসে নি, ততদিন এদেশে স্বার্থমূলক জাতীয়তা বা দেশাত্মবোধের ভাব উন্মেষিত হবার কোনো অবকাশ ঘটে নি। অপরকে না বুঝলে যেমন আপনার স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান জন্মে না, তেমনি অন্য দেশের সংশ্রবে না এলে স্বদেশ-সত্তার বা স্বাদেশিকতার বা জাতীয়তার কোনো স্ফূর্তি লাভ ঘটে না। এইজন্য আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, ভারতে যখন বিদেশীয়দের যাতায়াত আরম্ভ হ'ল—আমরা যখন অন্য জাতির সংস্পর্শে আসতে সুরু করলাম, তখন থেকেই আমাদের অন্তরে স্বদেশের বিশেষত্ব, স্বদেশবাসীর প্রতি প্রীতিবোধ আস্তে আস্তে বিকশিত হয়ে উঠল। ফলে পরবর্তীকালে প্রায় দু'হাজার বা ততোধিক বছর আগে গ্রীক, শক, হুন প্রভৃতি সুদূর বিদেশীয়দের আক্রমণে ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্যের বা জাতীয়তার আংশিক উন্মেষ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তা ছিল জাতীয় চেতনার আভাষ মাত্র—অখণ্ড ভারতের ঐক্যমূলক দেশাত্মবোধ তখনো ভারতবাসীর মনে গড়ে উঠে নি।

খৃস্টপূর্ব প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে ভারতে এক প্রবলতম বহিরাক্রমণ হয়। ঐ আক্রমণ ছিল গ্রীকবীর ম্যাসিডন-রাজ আলেকজাণ্ডারের। সেই সময় ভারতে স্বদেশ

বন্দনায়, দেশকে মাতৃরূপে ভাবনার এক মহত্তম জাতীয় মন্ত্র বিরচিত হয়। রচয়িতা ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ্ মহাপণ্ডিত চাণক্য। আলেকজাণ্ডার তাঁর অভিযাত্রী বাহিনী নিয়ে যখন পূর্বদিকে এগিয়ে আসছিলেন, তখন তক্ষশীলা চতুষ্পাঠীতে বসে চাণক্য সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। যুদ্ধের গতি দেখে তাঁর বুঝতে বাকী রইল না যে মুমূর্ষু পারস্য সাম্রাজ্যের পক্ষে গ্রীকদের প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না, ভারত সীমান্তের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিও তাদের চাপ সইতে পারবে না। কিন্তু যেমন করেই হোক জন্মভূমিকে বাঁচাতে হবে। এই মহান ব্রত পালন করার জন্য তৃতীয় দারায়ুসের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের কোনও এক সময়ে চাণক্য তক্ষশীলা ছেড়ে চলে আসেন মগধে। বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ভারতবাসীকে সচেতন করার জন্য মাতৃমন্ত্রে তাদের মনকে উদ্‌বুদ্ধ করতে তিনি মগধে বসে রচনা করলেন তাঁর মহামন্ত্র "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—এ মন্ত্র বিশ্বে চিরন্তন—যে কোনো যুগের যে কোনো দেশের পক্ষে ইহা প্রযোজ্য। দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করার এমন অমোঘ মন্ত্র সমগ্র বিশ্বে অভূতপূর্ব।

তারপর বহিরাগত মুসলমান আক্রমণে ভারতের বহুধা বিভক্ত খণ্ড বিচ্ছিন্ন বিক্ষুব্ধ রাজ্যসমূহ একে একে বিদেশী আক্রমণকারীদের করতলগত হল। অবশ্য বারবার এই আক্রমণ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু তাও এককভাবে। সমগ্র ভারতবাসী অথবা সমগ্র ভারতের স্বাধীন রাজারা সম্মিলিতভাবে সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে কখনো প্রয়াস পায় নি। এর প্রধান কারণ, তখনো এদেশে রাজনৈতিক কোনো ঐক্য দেখা দেয় নি, বরং হিন্দু রাজারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিহিংসা এবং বিদ্বেষভাব পোষণ করত। তবে পরবর্তীকালে মুসলমানদের ধর্মীয় অত্যাচার ও কুশাসনে দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করে। এরই ফলে ভারতের কোনো কোনো অংশে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং বিদেশী-বিজাতির নাগপাশ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা চলে। কিন্তু তার মধ্যেও সমগ্র ভারতবাসীর সম্মিলিত সর্বাত্মক কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। তাই মারাঠা বীর শিবাজী এবং রাজপুত বীর রাণা প্রতাপ ও রাণা রাজসিংহ প্রভৃতির স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হয় নি। তা'বলে এঁদের প্রচেষ্টা বৃথাও যায় নি। এঁদের নানা দুঃসাহসিক কার্যকলাপ ও অভূতপূর্ব বীরত্ব সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের ভারতবাসীদের স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করেছে।

অতীতে ভারতবর্ষ দু'বার মাত্র এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল; একবার রাজর্ষি অশোকের রাজত্বকালে, খৃস্টপূর্ব আড়াই শতাব্দী পূর্বে, আর একবার আকবরের রাজত্বকালে ষোড়শ শতাব্দীতে। প্রথমটির মূলে ছিল এক উদার ও সুমহান ধর্মীয় বন্ধন,

আর দ্বিতীয়টির কারণ ছিল মোগল সম্রাট আকবরের অমিত শক্তি ও নানা চাতুর্যপূর্ণ রাজনৈতিক কৌশল। কিন্তু সেসব সময়েও একালের ন্যায় স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তার উদ্ভব হয় নি। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র ভারতবাসীর মনে একাত্মবোধ জন্মে নি। এদেশে আধুনিক স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তার উন্মেষ হয়েছে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই। পূর্বেই বলা হয়েছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই ইউরোপে জাতীয়তার প্রথম প্রকাশ। তখন ভারতে সবেমাত্র ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তন স্থরু হয়েছে। এর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের দিকে একচ্ছত্র বিশাল বৃটিশ ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে এই সর্বাত্মক জাতীয়তামূলক দেশাত্মবোধ এদেশবাসীর মধ্যে উদ্ভাসিত ও বিকশিত হতে থাকে। নবযুগস্রষ্টা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ই এদেশে জাতীয়তার জনক—স্বদেশ মন্ত্রের সর্বপ্রথম উদ্গাতা। রামমোহন লক্ষ্য করেছিলেন যে শত শতাব্দীর পরাধীনতা সমগ্র ভারতীয় মহাজাতিকে অসাড় ও অভিশপ্ত করে তুলেছে—ধর্মীয় কুসংস্কার, অনাচার, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ও পরশাসনে জাতির আত্মসম্বিৎ ও স্বাজাত্যবোধ বিলুপ্তপ্রায়। তখন তিনি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার, আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন, মাতৃভাষার উন্নতিসাধন, রাজনৈতিক অধিকার আদায় এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মবিস্মৃত মৃতকল্প জাতির জীবনে নতুন প্রাণের, নতুন আশার ও উদ্দীপনার তরঙ্গ সঞ্চার করলেন। রাজা রামমোহনই ভারতে জাতীয়তার আদি মন্ত্রগুরু। ভারতবর্ষীয় জাতীয় গগনে রামমোহন এক অতি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। পরবর্তীকালে তাঁরই প্রদর্শিত পথে সমগ্র জাতি পরিচালিত হয়েছে—উত্তরসূরীরা তাঁর আরব্ধ কর্ম সম্পন্ন করেছেন। রামমোহনই জাতির মুক্তি পথের নির্দেশক। শুধু ভারতীয় জাতীয়তারই নয়, রাজা রামমোহন আন্তর্জাতিকতারও প্রথম পুরোহিত। ভারতের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৃথিবীর অপরাপর পরাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতাও কামনা করতেন। তাঁর জীবদ্দশায় ফ্রান্স ও স্পেন স্বাধীনতা লাভ করায় তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, নিজ গৃহে আলোকসজ্জা ও আনন্দভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই বোধ হয় এদেশে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কোনো ইংরেজ বলেছিলেন, "রামমোহন ভারতে জন্মালেও তিনি সমগ্র পৃথিবীর।"

রামমোহনের জীবিতকালেই উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আবির্ভূত হলেন কিশোর ডিরোজিও—নব বঙ্গকে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন, পুঞ্জীভূত কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তিনিই ভারতবর্ষকে প্রথম 'Mother Land' বা 'মাতৃভূমি' বলে সম্বোধন করলেন।

রামমোহনের তিরোধানের পর এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাজার প্রজ্বলিত জাতীয় আলোকবর্তিকা সমুজ্জ্বল করে তুললেন। ১৮৪০ খৃস্টাব্দে তৎকর্তৃক 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তিনি নবধর্ম প্রচার ও জাতীয়তাবোধ দেশবাসীর মনে জাগ্রত করার বাসনায় "তত্ত্ববোধিনী" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। তত্ত্ববোধিনীর পাতায় পাতায় দেশানুরাগ প্রদীপ্ত হয়ে থাকত। দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থনার মধ্যেও দেশের স্বাধীনতার সুর ধ্বনিত হ'ত।

মহর্ষির প্রভাবে মনস্বী রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে "জাতীয় পত্র" (ন্যাশন্যাল পেপার) নামে একখানি নতুন সংবাদপত্রের প্রকাশ সুরু হ'ল। এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন নবগোপাল মিত্র। রাজনারায়ণ দেশবাসীকে অন্ধ পরানুকরণের মোহ থেকে মুক্ত করার মানসে ধর্ম, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও কথাবার্তায় সর্ববিষয়ে জাতীয় ভাব পরিগ্রহণের অনুকূলে প্রচার চালাতে লাগলেন আর "পরানুকরণের লজ্জাকর হীন লালসা এবং মর্যাদাবুদ্ধি বিবর্জিত, জঘন্য ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দেশবাসীকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য নবগোপাল অক্লান্ত ও প্রাণপণ পরিশ্রমে লেখনী চালনা করেন। জাতীয়তার নামে নবগোপাল পাগলপ্রায় হয়ে গেলেন। 'ন্যাশন্যাল পেপারে'র মাধ্যমে তিনি জাতিকে আত্মশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হওয়ার জন্য 'চেতনার বেদনা' জাগালেন। শেষে তাঁর নামই হয়ে গেল 'ন্যাশন্যাল নবগোপাল'।

এদিকে পুরুষসিংহ পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার ও বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধনে আত্মোৎসর্গ করলেন। শ্রমের মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করলেন তিনি দেশবাসীর মনে। যে অসামান্য পৌরুষ ও নির্ভীকতার সঙ্গে তিনি ক্ষমতাগর্বী বিদেশী শাসক উর্ধ্বতন ইংরেজ রাজপুরুষ কৃত অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন একজোড়া তালতলার চটি জুতোর সাহায্যে তা জাতির অন্তরে অপূর্ব সাহস সঞ্চার করল। সেই থেকে বিদ্যাসাগর সমগ্র জাতির আদর্শ পুরুষ।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার', গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট', দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি কয়েকটি পত্রপত্রিকা জাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে', 'মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা', 'জাননা কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি' প্রভৃতি কবিতার মধ্য দিয়ে জাতীয়ভাব প্রচার করলেন।

তারপর একে একে আবির্ভূত হলেন মাইকেল মধুসূদন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি। এঁদের অমর কবিতাবলী আত্মবিস্মৃত জাতির অবসন্ন জাতীয় জীবনের শিরায় উপশিরায় দেশপ্রেমের উত্তপ্ত রক্তপ্রবাহ সঞ্চালন করল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর উদ্যোগে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে বেলগাছিয়ায় 'হিন্দুমেলা' বা 'জাতীয় মেলা'র প্রবর্তন হয়। জাতীয়তা প্রচারে এর অবদান অসামান্য। এই মেলা উপলক্ষ্যে মনোমোহন বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেন। এই 'হিন্দুমেলা' থেকেই স্বদেশী ভাবনার সূত্রপাত।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সন্দর্ভসমূহ এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকাবলী দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করল। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্র, আনন্দমঠ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহ জাতীয়তার দ্যোতক। কেশবচন্দ্র সেন ও মানবপ্রেমিক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সর্বধর্মসমন্বয় এবং বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' মহামন্ত্রে জাতি এক সুমহান আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হ'ল। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের বাণী দেশদেশান্তরে বহন করে নিয়ে গিয়ে বিবেকানন্দ ভারতকে বিশ্বের দরবারে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন করলেন। মহাভারতীয় জাতীয় জ।বনে স্বামী বিবেকানন্দ প্রেণার এক অফুরন্ত উৎস। বহু চারণকবি ও সাহিত্যিক বলিষ্ঠ হস্তে লেখনী ধারণ করে দেশের মধ্যে জাতীয়তার প্রবল বন্যা বইয়ে দিলেন। সারাদেশ জাতীয়তার মন্ত্রে উন্মাদ হয়ে উঠল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' হয়ে উঠে বীজমন্ত্র। এই সময় রবীন্দ্রনাথ অজস্র জাতীয়তামূলক কবিতা উপহার দিলেন জাতিকে। শুধু কবিতা নয়, গল্পে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, নাটকে, সঙ্গীতে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ ভরে দিলেন। এক কথায় রামমোহনে ভারতে জাতীয়তার উন্মেষের যে সূচনা দেখা দেয়, রবীন্দ্রনাথে তা নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি মহান্ দেশনায়কদের আবির্ভাবে সমগ্র দেশ মুক্তিপাগল হয়ে উঠল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আর এক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম্ তাঁর 'অগ্নিবীণা'য় জাতির অন্তরে পরাধীনতার মর্মজ্বালা অনুভব করালেন। তিনি অসংখ্য জাতীয়তামূলক কবিতা লিখে জাতীয় চিত্ত উত্তপ্ত করে তুললেন। তাছাড়া, গোবিন্দচন্দ্র রায়, স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, কান্তকবি রজনীকান্ত, চারণকবি মুকুন্দ দাস, অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতি জাতীয় কবিরা বহু স্বদেশপ্রেমের কবিতা লিখে জাতিকে আত্মসচেতন করেছেন। আশুতোষের ন্যায় শিক্ষাব্রতী,

বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের আবির্ভাবে জাতীয় গৌরব, আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। দেশের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আত্মোৎসর্গ ইতিহাসে অভূতপূর্ব। পরিশেষে সমগ্র মহাভারতীয় জাতির হৃদয়-মন মথিত করে আবির্ভূত হলেন সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র। বীর্যে, বীরত্বে জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করল। ত্বরান্বিত হ'ল ভারতের স্বাধীনতা।

বিশ্বের জাতীয়তার ইতিহাসে ভারতীয় জাতীয়তা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পাশ্চাত্ত্যের প্রগতিশীল দেশগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের উগ্র জাতীয়তাবোধ বিশ্ব-শান্তি ও সমৃদ্ধির পরিপন্থী। তাদের জাতীয়তা জাতিবৈর থেকেই সঞ্জাত। অশান্তি, হিংসা, লালসা, পরস্বাপহরণ ও শোষণের উপরই তাদের জাতীয়তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তার উৎসমূলে আছে ত্যাগ, শান্তি, অহিংসা ও সর্ব-মানব-কল্যাণ-কামনা। এদেশের জাতীয়তা জাতি-বৈর থেকে নয়, জাতি-মৈত্রী অর্থাৎ বিশ্বমৈত্রী থেকেই সঞ্জাত। বর্তমান সভ্য দেশগুলি যখন অরণ্য সমাকীর্ণ শাখাশ্রয়ী অসভ্য আদিম মানবে পরিপূর্ণ ছিল, তখনই অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে বিশ্বমৈত্রীর পথেই সুরু হয়েছিল ভারতের অভিযান। তারপর আধুনিক জাতীয়তার উন্মেষ যখন হ'ল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে, তখনো তার অভিযান সুরু হ'ল আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বশান্তির পথে। বিশ্বে সর্বাধিক বিস্ময়কর বিষয় এই যে ভারত পরবশ্যতা থেকে রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে নয়, শান্তি ও অহিংসার পথে ; শত্রুর শোণিতে নয়, আত্মরক্তপাতে তার জাতীয় মুক্তিপথ প্রস্তুত করেছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতেও ভারতের জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার নামান্তর। প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি মৈত্রী অক্ষরে অক্ষরে বজায় রাখার জন্য তার নিজ স্বার্থও বহুস্থানে ক্ষুণ্ণ করতে দ্বিধা করে নি। স্বার্থমূলক জাতীয়তা এদেশে অচিন্তনীয়।

জাতীয়তার আদি মন্ত্রগুরু

মুক্তিদাতা রামমোহন রায়

ইংরেজ অধিকারের পর ভারতবর্ষে যে নবযুগের সূত্রপাত, রামমোহন সেই যুগের যুগ-প্রবর্তক আদি পুরুষ। রামমোহনই সর্বপ্রথম মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন জাতিকে। জাতীয়তাবোধ-বিবর্জিত জাতির এক চরম অধঃপতিত অবস্থায় বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজের করতলগত হয়। তখন সে-যুগ ছিল সর্বদিক থেকে ঘনান্ধকারে পরিপূর্ণ। ধর্ম ও শাস্ত্রের নামে অধর্ম ও অশাস্ত্রীয় আচরণ, দরিদ্রের প্রতি ধনীর পীড়ন, নারী-নিপীড়ন, বিদেশীয় দুঃশাসন, অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও যুগযুগান্তের দৃঢ়মূল কুসংস্কারে যখন সমগ্র মহাভারতীয় জাতীয় জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ঐ সমাজব্যবস্থাকে সবাই যখন বিধিলিপি বলে নির্বিবাদে স্বীকার করে নিয়ে শোচনীয় অভিশপ্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তখনই রামমোহন আবির্ভূত হলেন চেতনার চাবুক হাতে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"বহুযুগব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চলতাকেই পবিত্রতা বলে স্থির করে নিস্তব্ধ ছিল এমন সময়েই ভারতবর্ষে রামমোহনের আবির্ভাব।" রামমোহনই সে-যুগের প্রথম ভারতপুরুষ যিনি শত শত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত পচা-ধ্বসা বিকৃত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর জ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা এবং মুক্তির বার্তা।

হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ (মতান্তরে ১৭৭৪) সালের ২২শে মে এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে রাজা রামমোহনের জন্ম হয়। বাল্যে তিনি ছিলেন অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন ছাত্র। জ্ঞানানুশীলনে ছিল তাঁর অপরিসীম অনুরাগ। অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি আরবী, ফারসী ও সংস্কৃতে অগাধ জ্ঞান লাভ করেন। বিভিন্ন ভাষায় বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে ধর্ম-জিজ্ঞাসা তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠল। আর দেশের সর্বত্র প্রত্যক্ষ করলেন ধর্মের নামে নানা অধর্মীয় আচরণ, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণশ্রেণীর নানা অন্যায় অবিচার। তিনি তৎকালে প্রচলিত তামসিক হিন্দুধর্ম ও পৌত্তলিক উপাসনার

প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। অন্তরে অনুভব করলেন এক ঈশ্বর এক শক্তির অস্তিত্ব। এই অতি অল্প বয়সেই 'তুহফাৎ-উল-মুহাহিদিন' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন পারস্য ভাষায়। এই পুস্তকে প্রচারিত ধর্ম প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী ছিল। তাই বাড়ীতে পিতামাতা ও বাইরে সমাজপতিরা বিক্ষুব্ধ হলেন। পিতা তাঁকে বিতাড়িত করলেন বাড়ী থেকে। এই সময় ভারত পথিক রামমোহন সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে নানা ধর্মের পরিচয় লাভ করলেন। আর প্রত্যক্ষ করলেন যে বাংলাদেশের ন্যায় ভারতের সর্বত্রই বিভিন্ন ধর্ম গ্লানিপূর্ণ। কেবল ধর্মাচরণই তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় ছিল না; বিদেশী বিজাতি শাসনে সারা ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির শোচনীয় দুরবস্থার ম্লান ছবিও তিনি বেদনাহত চিত্তে প্রত্যক্ষ করলেন। ফলে বিদেশী শাসকের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হল। প্রতিবেশী কোনো স্বাধীন রাজ্যের সহায়তায় মাতৃভূমিকে পরশাসন থেকে মুক্ত করবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগল তাঁর মনে। এই উদ্দেশ্যে এবং বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য তিনি তিব্বত পাড়ি দিলেন। মাত্র ষোল বছর বয়সের বালক রামমোহন একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্য ও সুদুর্গম তুষারাবৃত তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে গমন করলেন। ইহা সে সময়ের এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। এক ইংরেজ বলেছিলেন যদি রামমোহন জীবনে আর কিছু কাজ না করতেন, শুধু এই দুঃসাহসিক অভিযানের জন্যই খ্যাত হতেন।

তিব্বতে পৌঁছে বৌদ্ধধর্মের নানা গ্লানি ও অনাচার দেখে রামমোহন সেখানকার বৌদ্ধদের সঙ্গে ধর্মবিচারে প্রবৃত্ত হলেন। প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় তিব্বতীরা তাঁর প্রাণনাশের প্রয়াস পায়। অবশেষে তিব্বতী রমণীদের সহায়তায় তাঁর জীবন রক্ষা হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "দেশের বৃদ্ধেরা যখন প্রাণহীন ক্রিয়াকর্ম ও প্রথার মধ্যে জড়ত্বের শান্তিসুখ অনুভব করিতেছিল তখন বালক রামমোহন মরীচিকাভীরু তৃষাতুর মৃগশাবকের ন্যায় সত্যের অন্বেষণে দুর্গম প্রবাসে দেশদেশান্তরে ব্যাকুলভাবে পর্যটন করিতেছিলেন।"

জন্মভূমিকে বিদেশী শাসকের হাত থেকে মুক্ত করার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এবং তার জন্য যে বিপ্লবী কর্মপন্থার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিছুদিন পরে সে সবের অনুপযোগিতার বিষয় সম্যক উপলব্ধি করেন। তিনি দেখলেন যে-দেশে মানুষ নিজের ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছে, উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার অভাবে মানুষ যেখানে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এবং অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমগ্ন, তাদের কাছে দেশের মুক্তির সংগ্রামের কথা বলা বিড়ম্বনামাত্র। তিনি বিরাট মহাভারতীয় জাতিকে সর্বাগ্রে অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের

হাত থেকে উদ্ধার করে স্বধর্মে ও স্বাজাত্যাভিমানে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে জাতীয় আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে পারলে, দেশবাসী নিজেরাই একদিন দেশকে মুক্ত করার উপায় খুঁজে পাবে।

রামমোহন সর্বাগ্রে মনোনিবেশ করলেন ধর্মসংস্কারের কাজে। আবাল্য তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। গভীর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়সহকারে তিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। দেখলেন—বহু দেবতার উপাসনা ও পৌত্তলিকতার নামে লোকে নানা উপদেবতা ও তামসিক পুজোয় ব্যাপৃত। মিথ্যার আরাধনায় জাতির সুপ্রাচীনকালের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সত্যসকল আবৃত। ফলে জাতীয় সত্তা বিলুপ্ত। ধর্মসংস্কারের কাজে 'বেদান্ত' হল তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র। বেদান্তের চর্চা তখন দেশে প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। তখন বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদাদির সত্যসমূহ বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজীতে অনুবাদ করে সাধারণের মধ্যে প্রচার করলেন।

রামমোহন পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি ধর্মের শাস্ত্রসমূহ গভীর অভিনিবেশসহকারে অধ্যয়ন করলেন। এবং হিন্দুধর্মের ন্যায় বৌদ্ধ, খৃস্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্মের প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করলেন। সমস্ত ধর্মের অলৌকিকতা ও অতিলৌকিকতার মতাদর্শ নস্যাৎ করে দিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা নেই। বিখ্যাত জার্মান মনীষী ম্যাক্সমূলার পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, এ-যুগে রামমোহনই সর্বপ্রথম তুলনামূলক ধর্মালোচনা প্রবর্তন করেন। বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, "মানবসভ্যতায় রাজা রামমোহন রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হইল ধর্মের তুলনামূলক অনুশীলন। এই বিজ্ঞানের কথা তাঁহার পূর্বে কেহ জানিত না, কিম্বা কোনো ধর্মসংস্কারকই উহা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। বুদ্ধ হইতে চৈতন্য, কোনো ঐতিহাসিক ধর্মসংস্কারকের মুখে আমরা তুলনামূলক ধর্মালোচনার কথা শুনি নাই।" মানবসভ্যতার ইতিহাসে রামমোহনের এই চিন্তা এক বিরাট পদক্ষেপ। রামমোহন জগতের বিভিন্ন ধর্মের পরস্পরের বৈরিতা বিনষ্ট করে একটা উদার মৈত্রীভাব স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে তাদের মধ্যে যেখানে যতটুকু মিল ছিল তারই উপর সর্বধর্ম সমন্বয়ে ব্রাহ্মসমাজ গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। আধুনিক ভারতের খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভাবধারাকে নির্মূল করে ভারতের জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে রামমোহন ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করলেন। এই নব ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে খৃস্টধর্মে দীক্ষাভিলাষী বহু যুবক ব্রাহ্ম হল এবং স্বধর্ম, স্বদেশ ও স্বজাতিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে আরম্ভ করল। রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার না হলে ভারতবর্ষকে খৃস্টধর্মের প্রবল প্লাবন থেকে রক্ষা করা দুরূহ হত। রামমোহনের পূর্বে মোক্ষলাভই

ছিল ধর্মপ্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থান ছিল গৌণ। রামমোহনের প্রচারিত ধর্মাদর্শ ছিল জাতীয় মুক্তির উপায়স্বরূপ। সেজন্য তিনি কোথাও নিজেকে ধর্মগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। একেশ্বর ব্রহ্মোপাসনারই নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরিবার, সমাজ ও জাতীয় জীবনে মানুষের পূর্ণ মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এজন্য কৃচ্ছসাধনের প্রয়োজন ছিল না। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিবেশে এ ধর্মের অনুশীলন সহজসাধ্য। প্রসঙ্গক্রমে স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য—"ধার্মিক হইতে হইলে 'যোগী' বা 'সতী' হইবার কোনো প্রয়োজন নাই, এবং বনে যাইবারও দরকার করে না, পরন্তু গৃহ ও সমাজই ধর্মের প্রশস্ত ও সর্বোত্তম ক্ষেত্র। জ্ঞানাঞ্জন শলাকাদ্বারা শিক্ষিত হিন্দুর চক্ষু প্রকৃষ্টরূপে উন্মীলিত করিবার কৃতিত্বগৌরব রামমোহন রায়েরই প্রাপ্য।"

বিশ্বমানবতাবোধে উদ্‌বুদ্ধ এই নতুন ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রামমোহনকে বিরাট এক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পণ্ডিত, পাদরী, ভট্টাচার্য, গোস্বামী, মোল্লা—এঁরাই ছিলেন তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ। কিন্তু রামমোহন তাঁর অসাধারণ মনীষা, প্রখর জ্ঞান ও যুক্তি বলে এঁদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "তাঁর সকল চিন্তা, সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ···ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখাবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।"

এরপর রামমোহন মন দিলেন সমাজ-সংস্কারে। তখন ভারতের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন, "তিনি (রামমোহন) যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে, হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন অন্ধকারের কাল।···বঙ্গভূমি তিমিরাবৃত অরণ্যভূমি রাক্ষসভূমি ছিল, ভ্রষ্টাচারের পিশাচসকল তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি একা অজ্ঞাত শতসহস্র শত্রুদ্বারা আবৃত হইয়া, কুঠার হস্তে সেই ঘোর অবিদ্যাঅরণ্য সমভূমি করিয়া দেশোদ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এদেশে রামমোহন রায়ের যখন আবির্ভাব, তখন তো রীতিমতো দুর্গতির দিন, মানুষের দৃষ্টিশক্তি ছিল মোহাবৃত, আর সৃষ্টিশক্তি ছিল আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতো বাণী তখন আমাদের ছিল না।"

রামমোহনের প্রথমেই দৃষ্টি পড়ল ভারতের নারীজাতির অসহায় অবস্থার প্রতি। সমাজে নারীর তখন কোনো স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না। সব চেয়ে অমানুষিক ও জঘন্য প্রথা ছিল সদ্য বিধবা পত্নীকে মৃত স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা। রামমোহন এই বর্বর প্রথা দূর করার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করেছিলেন। এজন্য হিন্দুসমাজের বহু স্বার্থসংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁকে প্রচণ্ড বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়। নানা শাস্ত্র মন্থন করে রামমোহন প্রমাণ করেছিলেন যে সহমরণ একটি লোকাচার মাত্র—উহা মোটেই শাস্ত্র-সম্মত নয়। অবশেষে এ-দেশের বৃটিশ শাসকদের সহায়তায় তিনি এই অতি নিষ্ঠুর সর্বনাশা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন পাস করান। ১৯২৯ খৃস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর এই আইন পাস হয়। এই তারিখটি দেশের নবজাগরণের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সতীদাহ নিবারণ আইন পাসের মধ্য দিয়েই ভারতের পুরুষপ্রধান সমাজে সর্বপ্রথম নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত হল। কিন্তু হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল নেতারা তাঁর চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছিলেন। এমন কি তাঁর প্রাণনাশেরও প্রচেষ্টা হয়েছিল। বিদ্রোহী রামমোহন নিজ সংকল্পে হিমালয়ের ন্যায় অচল ও অটল ছিলেন।

সতীদাহ নিবারণ আইন পাস করিয়েই রামমোহন নিশ্চিন্ত হন নি। বহুদর্শী বিপ্লবী রামমোহন সমাজে বিধবা নারীদের আর্থিক দুর্গতির বিষয়ও চিন্তা করেছিলেন। এক মনীষীর ভাষায়, "রামমোহন রায় যে কেবলমাত্র বিধবাদের জলন্ত চিতা হইতেই বাঁচাইয়াছিলেন তাহাই নহে, আইন পাস হইলে রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট শ্বশুর পরিবারে তাহাদের কী অবস্থা হইতে পারে তাহা কল্পনা করিয়া আইন পাস হইবার বহু পূর্বেই তাহাদের কবল হইতে বাঁচাইবার জন্য তিনি একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।" রামমোহন বিধবাদের জন্য জীবনবীমা প্রবর্তনের আভাষ দেন।

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাপণ ও কৌলীন্যপ্রথা, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা এবং গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপ প্রভৃতি তৎকালে প্রচলিত আরও বহু অমানুষিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। বহু বিবাহের বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর চরমপত্রে (উইলে) এই ব্যবস্থা করে যান যে তাঁর কোনো পুত্র বা উত্তরাধিকারী একই সময়ে একাধিক পত্নীর স্বামী হলে তাঁর সম্পত্তির কোনো অংশ পাবে না। বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য তিনি তৎকালীন সরকারকে একটি আইন প্রণয়ন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। হিন্দুনারীর দায়াধিকার অর্থাৎ স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা পত্নীর এবং পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকারত্ব বিষয়ে বহুদর্শী রামমোহন বহু আলোচনা করেছিলেন। তাঁরই সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফল বর্তমান হিন্দুকোড আইনে পরিণত হয়েছে। নানা শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করে রামমোহন

কন্যাপণ ও কন্যা বিক্রয়ের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি এ বিষয়ে আন্দোলন করবেন স্থির করেছিলেন। এইভাবে রামমোহন যুগযুগান্তরের প্রচলিত কুপ্রথার মিথ্যা ভিত্তিমূলে বজ্রকঠোর আঘাত করে ভারতে নারীজাতির মুক্তির ও কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে গিয়েছেন। মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায়, "রাজা কেবল স্বদেশবাসিগণের চিত্ত ও চিন্তাকে অন্ধ শাস্ত্রানুগত্যের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যেখানে বন্ধন সেখানেই তাঁহার শাণিত খড়্গ গিয়া পড়িয়াছে।"

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহনের দৃষ্টি পড়ল শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রতি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষার অভাবেই দেশের যত দুর্গতি। জাতীয় মুক্তির পক্ষে ধর্মের আলোক যথেষ্ট নয়। জ্ঞানের আলোক ছাড়া অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। জাতীয় উন্নতিও সুদূরপরাহত। তাই তিনি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীরই শিক্ষার বিষয় চিন্তা করতেন এবং প্রয়োজনীয় উপায়াদিও অবলম্বন করেছিলেন। শিক্ষায় ভারতবাসীর অনগ্রসরতার জন্য রামমোহন ব্রিটিশ শাসনকেই দায়ী মনে করতেন।

সংস্কৃত অথবা ইংরেজী কোন্ ভাষার মাধ্যমে এদেশে শিক্ষা বিস্তার হওয়া উচিত এই নিয়ে যখন নানা বাদানুবাদ উঠল, তখন রামমোহন ইংরেজী ভাষাকেই শিক্ষা প্রসারের উপযুক্ত মাধ্যম বলে দ্বিধাহীন চিত্তে ব্যক্ত করলেন। দূরদর্শী রামমোহন তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করলেন যে নতুন যুগের আবির্ভাব হয়েছে। এখন আর টোল, চতুষ্পাঠী, পাঠশালা ও মক্তব দিয়ে জাতীয় উন্নতির সম্পাদন সম্ভব নয়। যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে ইংরেজ জাতি পৃথিবীতে এত উন্নত হয়েছে, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে বাঙালী তথা ভারতবাসীর পরিচয় প্রয়োজন। তাই তিনি এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তিনিই প্রথম ভারতবাসী যিনি এ-চিন্তা করেছিলেন। দেশবাসীকে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতায় বিশ্ববরণীয় করে তোলাই ছিল তাঁর সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। "রামমোহনের নিকট শিক্ষা বিলাসের বস্তু ছিল না। রামমোহন জানিতেন যে অধঃপতিত জাতিকে পুনরায় আপন মর্যাদায় স্থাপন করিতে গেলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ইংরেজদের সহিত জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে হইলে তাহাদের ন্যায় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকে আয়ত্তে আনিতে হইবে। শিক্ষাবিস্তারে রামমোহনের যে অনুরাগ তাহার মূলে ছিল জাতির জীবন রক্ষা—এই তাগিদ।"

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে নিজেকে সুসজ্জিত করার জন্য রামমোহন পরিণত

বয়সেই অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁর দখল দেখে ইংরেজ মনীষীরা পর্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করতেন। বেন্থাম পর্যন্ত বলতেন, তাঁর ইচ্ছা হয় যে তিনি রামমোহনের মতো ইংরেজী লেখেন। বাস্তবিকই রামমোহন না থাকলে এদেশে এত দ্রুত ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হত না। এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের মূলে রামমোহনের আর একটি বৈপ্লবিক চিন্তা ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হলে এদেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব অবসম্ভাবী। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের অনুকূলে রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লিখেছিলেন তার কিয়দংশ এইরূপ: "এদেশে সংস্কৃত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া গভর্নমেণ্ট উপযুক্ত পণ্ডিতদিগের দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষাপ্রদানে মনস্থ করিয়াছেন; এরূপ বিদ্যালয় এদেশে নূতন নহে। ব্রিটেনে এক সময় যেমন পুরাতন জীবন-দর্শন প্রবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল, ঠিক তেমনি ভারতেও বর্তমান অবস্থায় মধ্যযুগের পিছুটান অতিক্রম করিয়া নূতনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে যে ভাষা এদেশে প্রচলিত রহিয়াছে, সে ভাষা অধিকতর অনুশীলনে, লোকের মনকে আবার ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নাদির মীমাংসায় ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিবে ভিন্ন, আর কিছুই অধিক ফলদায়ক হইবে না। এ-শিক্ষা ভারতকে অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিবে।...যাহাতে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা এবং অন্যান্য হিতকর বিদ্যা দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত হয় তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগী হওয়া উচিত।" এই পত্রের ভাব ও ভাষা ছিল অপূর্ব সুন্দর। অকাট্য যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ এই ঐতিহাসিক পত্রটি পড়ে বহু সুবিজ্ঞ ইংরেজ বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। বিশপ হিবর এই পত্রটিকে আশ্চর্য সুচিন্তা বলে উল্লেখ করেছেন। যে-যুগে লোকে আদবেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি, সেই যুগেই রামমোহন বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অনুকূলে জোর মত প্রচার করেন। ইহা তাঁর সুগভীর দেশপ্রেম ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

এদেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজে রামমোহনের প্রয়াসের অন্ত ছিল না। মনীষী ডেভিড হেয়ার ও ডাফ্ সাহেব প্রভৃতিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালন ব্যাপারে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে পাদ্রীদের সঙ্গে তাঁর বহু তর্কবিতর্ক হয়েছে। কিন্তু স্কুল প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তিনি তাঁদের অকুণ্ঠ সহায়তা করেছেন। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে যে-কেউ শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী হতেন, তাঁকেই রামমোহন সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে অকাতরে সাহায্য করতেন। যেভাবেই হোক দেশে দ্রুত শিক্ষাবিস্তারই ছিল তাঁর কাম্য। হেদুয়ার কাছে সীমলা স্ট্রীটে রামমোহন সম্পূর্ণ নিজ

ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। যাদের পাত্রী স্কুলে ছেলে পাঠাতে আপত্তি হত তাদের জন্যই তাঁর এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারে রাজার অভূতপূর্ব দৃঢ়তার বিবরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "রামমোহন রায়ের বজ্রমুষ্ঠি বুলডগের কামড়ের ন্যায় ছিল।" "যাঁহারা শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন, শিক্ষাদানই কেবল তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল—কিন্তু রামমোহন ইংরেজী শিক্ষার প্রসার চাহিয়াছিলেন, তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টির ফলে। তিনি জানিতেন যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় বলিয়ান জাতির সহিত জীবন-সংগ্রামে আঁটিয়া থাকিতে হইলে আমাদেরও সেই বিদ্যা আয়ত্তে আনিতে হইবে—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। সেইজন্য শিক্ষা প্রবর্তনে রামমোহনের দান অতুলনীয়।"

রামমোহন রায় বর্তমান যুগে ভারতীয় রাজনীতিরও জনক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এদেশে রাষ্ট্রবুদ্ধির তিনিই প্রথম পরিচয় দিয়েছেন।" ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্যে তিনি যেমন নতুন যুগের প্রবর্তন করেছেন, এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের পথও তিনি প্রথম প্রদর্শন করেছেন। বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক দীক্ষা দিয়েছেন। তিনিই পথ না দেখালে এদেশে রাজনৈতিক চেতনা কবে আসত বলা দুরূহ। মাত্র ষোল বছর বয়সেই রামমোহনের মনে রাজনৈতিক চেতনা জেগেছিল। তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন, "ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বাহিরে কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম।" বাল্যাবস্থাতেই পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার কথা রামমোহনই এককভাবে সর্বপ্রথম ভেবেছিলেন। কিন্তু দেশভ্রমণের পর যখন দেখলেন সমগ্র দেশ গভীর অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, স্বাধীনতা তো দূরের কথা সামান্য রাজনৈতিক চেতনাও মানুষের মধ্যে নেই, তখন তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে দেশের লোকের মনে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার প্রয়াস পেলেন। রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে তুললেন। স্বজাতিপ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমান রামমোহনের মধ্যেই প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "নবযুগের উদ্বোধনের বাণী দেশের মধ্যে তিনিই তো প্রথম এনেছিলেন।"

রামমোহন জানতেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার সংবাদপত্র। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই দেশকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায়। তাই তিনি বাংলা ও ফার্সি ভাষায় যথাক্রমে 'সংবাদকৌমুদী' ও 'মিরাৎ-উল-আখবার' নামে দুখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 'সম্বাদকৌমুদী'ই বাঙ্গালী পরিচালিত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম জাতীয় সংবাদপত্র। এই পত্রিকা মারফতই তিনি বিদেশী

সরকারের কাছে জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনাদি উপস্থাপিত করে দেশবাসীকে সজাগ করতেন। রাজনীতি ছাড়া ধর্ম, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং দেশী বিদেশী খবরাখবরও এতে প্রকাশিত হত। সমসাময়িককালে পরিচালিত বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে ঘটনা ও তথ্য সংগ্রহ করে রামমোহন দেশের লোকের মনে স্বাধীনতাস্পৃহা জাগাবার চেষ্টা করতেন। পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সম্বাদকৌমুদীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। সুতরাং সংবাদপত্র জগতেও রামমোহন অগ্রদূত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহনই প্রথম এদেশে অমিত তেজে সংগ্রাম করেন। ১৮২৩ সালের ৩১শে মার্চ সংবাদপত্রের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হলে রামমোহন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি পাঁচজন খ্যাতনামা বন্ধুর সহযোগে সুপ্রিমকোর্টে একখানি আবেদনপত্র দাখিল করেন। কিন্তু এতে কোনো ফল না হওয়ায় রামমোহন বিলেতে সকৌউন্সিল রাজার নিকট একখানি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। এই অবস্থাকেই এদেশে জাতীয় আন্দোলনের সূচনা বলা যায়। কিন্তু সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ আইনের কোনো প্রতিকার না হওয়ায় প্রতিবাদে রামমোহন নিজস্ব সম্পাদিত 'মিরাৎ-উল-আখবার' প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে এদেশে অসহযোগ আন্দোলনেরও আদি গুরু বলতে পারা যায়। শেষ সংখ্যায় পত্রিকা বন্ধের কারণ প্রদর্শন প্রসঙ্গে রামমোহন যে মন্তব্য লেখেন তাতেই তাঁর স্বাধীনতা-স্পৃহার তেজোদীপ্ত ভাব প্রকাশ পায়। বয়ানের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ :

"যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোনো অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।" মন্তব্যটি শেষ করেন স্বাধীনতা-মন্ত্রে অনুরঞ্জিত একটি ফার্সি কবিতার উধৃতি দিয়ে যার বঙ্গানুবাদ এইরূপ : "তোমার পায়ের তলায় পিপীলিকার অবস্থা যে কি রকম তাহা যদি তুমি জানিতে পারিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হাতীর পায়ের তলায় তোমার অবস্থা কি হইতে পারে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতে।" এইভাবে রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণের এক অভূতপূর্ব ও গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

ব্রিটিশের কুশাসনে এদেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিচার বিষয়ে যথেষ্ট হীনাবস্থা দেখা দিয়েছিল। এইসব বিষয়ে দেশবাসীর ন্যূনতম কোনো অধিকারও স্বীকৃত হয় নি। রামমোহন দেশবাসীর দাবী আদায়ের জন্য বহু অভিযোগ করেছিলেন। তখন ইংরেজ শাসনবিভাগে ভারতীয়দের কোনো অধিকার ছিল না। রামমোহন ভারতীয়দিগকে সরকারী চাকরিতে উচ্চপদে নিয়োগ করার জন্য বার বার দাবী জানান। 'ইংলণ্ডের নিকট

আবেদনপত্রে' তিনি বলেন, "মুসলমান সম্রাটদিগের আমলে হিন্দুগণ মুসলমানদের সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিত ; রাষ্ট্র-শাসনযন্ত্রের দায়িত্বশীল পদে তাহারা অধিষ্ঠিত হইত এবং অনেকে নবাবের পরামর্শদাতারূপেও নিযুক্ত হইত। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতীয়গণের রাজনৈতিক অধিকারাদি বিলুপ্ত হইয়াছে।...ব্রিটিশ সরকার যদি ভারতীয়গণের ঐ সব অধিকার মঞ্জুর ও সংরক্ষণ না করেন, তাহা হইলে সুখ শান্তির যে আশায় ভারতীয়গণ ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভর করিয়াছে, তাহার ভিত্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।"

১৮২৭ খৃস্টাব্দে জুরী আইন পাস হয়। রামমোহন গভীর মনোনিবেশসহকারে উহা পাঠ ক'রে দেখলেন যে বিচার কার্যে ভারতীয়দের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে। তিনি এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁর এই প্রতিবাদপত্র ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রেরিত হয়েছিল। পত্রের কিয়দংশ এইরূপ : "যে সুসভ্য ইংরেজ জাতি স্বাধীনতার পক্ষপাতী ও জ্ঞান-প্রচারের এত উৎসাহদাতা, ভারতবাসী অর্ধ শতাব্দী তাঁহাদের দ্বারা শাসিত হইতেছে ; কিন্তু তাহাদের মনোভাবের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া এবং তাহাদের কোনো মতামত জিজ্ঞাসা না করিয়া গভর্নমেণ্ট আইন ও বিধান প্রণয়ন করেন। সেইজন্য ইংরেজ শাসনে ভারতের কল্যাণ হইবে ভাবিয়া যাঁহারা ইংরেজ গভর্নমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত তাঁহাদের সহিত আমিও গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি।" ইংরেজ শাসকের কাছ থেকে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য তিনি কখনও নতজানু হন নাই। আপন ব্যক্তিত্ব ও স্বাজাত্যবোধ সমুন্নত রেখে দাবী পেশ করতেন। স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থার প্রতি তিনি কখনও আনুগত্য প্রদর্শন করেন নি। দেশ সামান্য মাত্র প্রস্তুত থাকলে তিনি একক বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন, স্বেচ্ছাতন্ত্রকে নির্মূল করার জন্য। তবুও এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে তিনি যে সাহস, যে দৃঢ়তা দেখিয়ে গেছেন তা আজও ভারতের জাতীয় ইতিহাসে অতুলনীয়। রামমোহনকে কেউ কেউ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জনক বললেও "রামমোহন প্রকৃত-পক্ষে স্বাধীনতার একজন শ্রেষ্ঠ পূজারী ছিলেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই রামমোহন চরিত্রের ভিত্তি। এতোবড় বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন মনীষা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে বাদ দিয়া সম্ভব হইতে পারে না।" একবার রামমোহনের নিজের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, "স্বাধীনতার শত্রু ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের মিত্ররা কোনোদিন জয়ী হয় নাই এবং শেষ পর্যন্ত কোনো দিন জয়ী হইবেও না।" অ্যাডাম সাহেব বলেছিলেন, "রামমোহন হয় স্বাধীন থাকিবেন, নহিলে তাঁহার অস্তিত্বই থাকিবে না। স্বাধীনতাই ছিল তাঁহার অন্তরের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আবেগ বা প্রবৃত্তি।"

ভারতে রামমোহনের সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং। তিনি তখন পাঞ্জাবের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত। রাজা তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং দূর থেকে তাঁর কাজকর্ম সাগ্রহে লক্ষ্য করতেন। তিনি একবার রণজিৎ সিংহের সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সে পত্র বিনষ্ট করে। এই দুই বীরের সম্মিলনে ভারতের অবস্থা হয়ত অন্য রকম হতে পারত। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, "রাজা স্বাধীনতার অকৃত্রিম উপাসক ছিলেন। স্বাধীনতাই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল। স্বাধীনতাই তাঁহার অভিধানে পরম পরমার্থ ছিল।" যে স্বাধীনতা আজ আমরা অর্জন ও উপভোগ করছি তা রামমোহনেরই আরব্ধ কার্যের ফল।

রামমোহন যখন বিলেতে ছিলেন, তখন ১৮৩১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে রিফর্ম বিল আসে। তিনি ঐ সময়ে পার্লামেণ্টে আহুত হয়ে দাবী পেশ করেন এবং এক ভাষণ দেন। ভারতের উন্নতি কামনায় তিনি বহু পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভারতীয় কৃষকদের শোচনীয় দুর্দশার কথা বর্ণনা করেন এবং ব্রিটিশ-সৃষ্ট জমিদারী প্রথাকে এর জন্য দায়ী করেন। তিনি প্রজাদের কর বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করেন। ভারতে নিযুক্ত সিভিলিয়ানদের দুর্নীতির কথা এবং তার প্রতিকারের পরামর্শ দেন। তাছাড়া, দেশীয় পঞ্চায়তি প্রথার মতো জুরার বিচার প্রবর্তন; জজ ও রেভিনিউ কমিশনারদের পদ পৃথক করা; জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পৃথক করা; আইন প্রণয়ন করার পূর্বে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদের মত গ্রহণ এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনগুলি সংহতিবদ্ধ করার দাবী তাঁর অভিভাষণে প্রকাশ করেন। রামমোহন সেদিন দৃপ্তকণ্ঠে আরও ঘোষণা করেছিলেন, "এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে আমি ইংলণ্ডের অধিকারে আর থাকিব না, আমার পৈত্রিক ও স্বোপার্জিত সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বাধীনতার ক্রীড়া-ভূমি আমেরিকাতে গিয়া বাস করিব।" ভারতবর্ষে সকল প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের দীক্ষাগুরু তিনিই। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "ইহা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হয় যে, আমরা এখন যে সব রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছি, একশত বৎসর পূর্বেই রামমোহন সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা করিয়া আন্দোলন করিয়াছিলেন।" বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র বলেছেন, "...রাজা রামমোহনকে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেরও প্রবর্তকরূপে প্রত্যক্ষ করি। ফলতঃ যে সকল শাসন সংস্কারের কথা বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমরা কহিয়া আসিতেছি তাহার প্রায় সকলগুলির আলোচনাই রাজা রামমোহন প্রায় শতবর্ষ পূর্বে করিয়া গিয়াছেন।"

রামমোহন ব্রিটিশ সরকারকে ভারতে ব্যয়বহুল স্থায়ী সৈন্যদল না রেখে প্রজাদের মধ্য

থেকে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠনপূর্বক দেশরক্ষার ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। যুক্তিস্বরূপ তিনি কবি সেক সাদীর এই কবিতাটির উধৃতি করেন: "প্রজাদের সহিত বন্ধুভাবে বাস কর, শত্রুদল হইতে যুদ্ধের কোনো ভয় থাকিবে না। ন্যায়বান রাজার পক্ষে প্রজারাই তাঁহার সৈন্য।"

রামমোহন এদেশে জাতীয়তার যেমন আদি মন্ত্রগুরু, আন্তর্জাতিকতারও তেমনি প্রধান পুরোহিত। নিজের দেশ পরাধীন ভারতবর্ষকে যেমন স্বাধীন দেখবার জন্য তাঁর উদগ্র কামনা ছিল, তেমনি পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশও স্বাধীনতা লাভ করুক ইহা তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন। তিনি তাঁর কলকাতার বাড়ীতে বসে সংবাদপত্র মারফত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় অবগত হতেন। কোনো দেশে ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে শুনতে পেলে তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠত। তাঁর এই আন্তর্জাতিকতার মূলে ছিল তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বমানবতাবোধ। এই বোধ সেদিন বিশ্বে একমাত্র রামমোহনের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায়' স্পেনের বিরাট উপনিবেশ ছিল; এবং ঐ সব দেশের অধিবাসীরা স্পেনের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। ১৮২১ সালে ঐ উপনিবেশগুলি মুক্তি পেলে রামমোহন আনন্দে আত্মহারা হন এবং নিজ ব্যয়ে টাউন হলে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। গ্রীসবাসীরা তুরস্কের অত্যাচার ও অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ করুক ইহা তিনি একান্তভাবে কামনা করতেন। নেপল্‌স্‌বাসীরা তাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে পরাজিত হচ্ছে খবর পেয়ে রামমোহন ক্ষোভে, দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর সম্পাদক ও তাঁর বন্ধু সিল্ক বাকিংহামকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "নেপল্‌স্‌বাসীদের দাবী আমার নিজের দাবী বলিয়া মনে করি, তাহাদের শত্রুদের নিজের শত্রু বলিয়া গণ্য করি। ...তাহাদের সাধনা আমারও সাধনা। ...বাধ্য হইয়াই আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইতেছে যে, ইউরোপ এবং এশিয়ার দেশগুলিতে, বিশেষ করিয়া যেগুলি ইউরোপের উপনিবেশ, সেগুলি তাহাদের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে, ইহা আমি আর দেখিয়া যাইতে পারিব না।"

পরাধীনতার জ্বালায় জর্জরিত, নিপীড়িত আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবের প্রতি রামমোহনের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। একবার সেখানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রামমোহন তাঁর প্রকাশিত 'মিরাৎ-উল-আখবার' পত্রিকা মারফত সাহায্যের আবেদন জানান। ফলে বহু ইংরেজ ও এদেশবাসী আয়ার্ল্যাণ্ডে অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। ১৮২২ সালের ১১ই অক্টোবর 'মিরাৎ' পত্রিকায় রামমোহন 'আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপত্তি ও অসন্তোষ'

নামে একটি কঠোর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহা ইংরেজ রাজপুরুষদের সুনজরে পড়ে নি। তাই 'মিরাৎ' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এইভাবে স্বাধীনতার উপাসক ও বিপ্লবের চির সুহৃদ রামমোহনের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব সফল হলে রামমোহন আনন্দে অধীর হয়ে সর্বপ্রথম তিনিই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। যখন তিনি বিপ্লবের সফলতার সংবাদ পান, তখন একখানি জাহাজে বিলেত যাত্রা করছিলেন। আফ্রিকার নাটাল বন্দরে জাহাজ থামলে একখানি ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে শুনতে পেয়ে তিনি অভিবাদন জানাবার জন্য ডেকের দিকে দৌড়ে যান। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যাওয়ায় একখানি পা ভেঙ্গে যায়। তবুও তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। অপরের সহায়তায় ডেকে নীত হয়ে সর্বাগ্রে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত মুক্তির পতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে ক্ষান্ত হন। স্বাধীনতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ এমন মুক্তিপাগল আদর্শ পুরুষ তৎকালে এদেশে তো ছিলই না, পৃথিবীতেও খুব কম ছিল। আজ স্বাধীন ভারত সারা বিশ্বে শান্তির কামনায় পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতার যে দাবী করছে, সোয়া শতাধিক বৎসর পূর্বে পরাধীন ভারতে রামমোহন একক সে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। অত্যাশ্চর্য তাঁর মানবপ্রীতি, মনীষা ও দূরদৃষ্টি।

তাঁর এক চরিতকারের ভাষায়, "রামমোহন চিরজীবন স্বাধীনতা-প্রাণ, বিপ্লবীর বন্ধু এবং সমগ্র এশিয়ার সর্বপ্রথম জাতীয় ও আন্তর্জাতিকবোধসম্পন্ন নবযুগের পথদ্রষ্টা ও পথস্রষ্টা।"

ভাষাই যে কোনো জাতির আত্মপ্রকাশ ও জাতীয় জাগরণের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। যে বাঙালী জাতির উন্নতি ও জাতীয়তার বিকাশ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা তার ভাষার মধ্যে সেই বাঙ্গালা ভাষায় রামমোহনের অবদান অসামান্য। তাঁকে বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা বলা হয়ে থাকে। তাঁর পূর্বে যদিও বাংলা গদ্যে সামান্য কিছু লেখা হয়েছিল, সে সবের ভাষা ছিল অত্যন্ত দুর্বল, ভাব ছিল খুব হাল্কা। উহা সাধারণের নিকট সমাদৃত হয় নি। রাজাই প্রথম সাধারণের পাঠ্য বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। গদ্যের তখন যা শোচনীয় দৈন্যদশা তাতে কোনো জটিল দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা স্বপ্নাতীত ছিল। রামমোহন তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতির দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বসকল সাধারণের বোধগম্য করে বাংলায় প্রকাশ করেন। পূর্বে লোকে বাংলা গদ্য পড়তে জানত না। রামমোহন গদ্যপাঠের প্রণালী শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর আগে বাংলা ভাষায় কোনো বাংলা ব্যাকরণ ছিল না। রামমোহনই সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। বাংলায় তিনিই সর্বপ্রথম কমা, সেমিকোলন, জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন ও কোটেশন

প্রভৃতি যতি চিহ্ন প্রবর্তন করেন। তিনি বাংলায় ভূগোল, খগোল ও জ্যামিতির গ্রন্থও লিখেছিলেন। রামমোহন বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু দেশভাষা বাংলার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলেছিলেন যে মাতৃভাষায় তাঁর মতামত ব্যক্ত না করলে দেশকে জাগান সম্ভব নয়। ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হবে না। ইহা তাঁর প্রগাঢ় জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক। এইভাবে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রামমোহন জাতীয়তার সুদৃঢ় পথের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তাহাদের আশা ছিল না, ভাষা ছিল না, সাহিত্য ছিল না, জাতিকে তাহারা বর্ণ বলিয়া জানিত, দেশ বলিতে তাহারা নিজের পল্লীকে বুঝিত, বিশ্ব তাহাদের গৃহকোণ কল্পিত মিথ্যা বিশ্ব, সত্য তাহাদের অন্ধ সংস্কার, ধর্ম তাহাদের লোকাচার প্রচলিত ক্রিয়াকর্ম, মনুষ্যত্ব কেবলমাত্র অনুগত প্রতিপালন এবং পৌরুষ রাজদ্বারে সৎ ও অসৎ উপায়ে উচ্চ বেতন লাভ। রামমোহন রায় যদি কেবল ইহাদের মধ্যে আপনার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিতেন, যদি সেই সংকীর্ণ বর্তমান মধ্যেই আপনার সমস্ত আশাকে প্রতিহত হইতে দিতেন, তাহা হইলে কদাচ কাজ করিতে পারিতেন না—তাহা হইলে তাঁহার মাতৃভূমিকে আপন আদর্শ লোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত।"

রামমোহনই প্রথম ভারতবাসী যিনি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিলেতে পৌঁছান, এবং প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাসের মূলে কঠোর আঘাত করেন। তাঁর বিলেত গমনে বিদেশে ভারতের গৌরব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আগে ওদেশের লোকের ধারণা ছিল ভারতবাসীরা অসভ্য ও বর্বর জাতি। রাজার বলিষ্ঠ সুন্দর দেহ এবং সর্ববিষয়ে তাঁর অসাধারণ মনীষা দেখে ইংলণ্ডবাসীরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। রামমোহন ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার নানা ঐতিহ্যের বিশদ ব্যাখা করে ওদেশবাসীকে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তুলেন। ইংলণ্ডের মাটিতে দাঁড়িয়েই তিনি নির্ভীকচিত্তে ভারতীয় চিন্তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেন নি। একবার তিনি ওখানকার এক বিদ্বৎসভায় সগৌরবে বলেছিলেন, "য়ুরোপীয় সাহিত্যে আমি এমন কিছু দেখিলাম না, যাহা হিন্দুদিগের দার্শনিক তত্ত্বসমূহের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।" সর্বত্র তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি যেখানেই যেতেন, তাঁকে দেখবার জন্য দলে দলে লোক ভীড় জমাত। এ সম্পর্কে সাদারল্যাণ্ড সাহেব লিখেছেন, "ম্যাঞ্চেস্টারে পুরুষ, নারী ও বালক শ্রমজীবীগণ সকলে কাজ ফেলিয়া দলে দলে 'ভারতীয় রাজা' দেখিতে ছুটিল। অনেকে তাহাদের মলিন কয়লা মাখান হাত লইয়া তাঁহার সহিত করমর্দন করিতে ব্যগ্র হইল। মেয়েরা তাহাদের অবিন্যস্ত বেশ লইয়াই তাঁহাকে

আলিঙ্গন করিতে তাঁহার দিকে ছুটিল। বাহিরের জনস্রোত প্রতিরোধ করিতে পুলিশের সাহায্য লইতে হইল। রাজা তাহাদের সকলের সঙ্গে করমর্দন করিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তিনি আশা করেন তাহারা সকলে রিফর্ম বিল সম্বন্ধে মন্ত্রীদলের পক্ষ সমর্থন করিবেন।"

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম রস্কো এবং খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ জেরিমি বেন্থাম প্রভৃতি মনীষীরা রামমোহন যে হোটেলে উঠেছিলেন, সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন। রস্কো বলেছিলেন, "ভগবানকে শত ধন্যবাদ, এই শুভদিন দেখিতে তিনি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।"

ইংলণ্ডের তৎকলীন রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের সঙ্গে বাকিংহাম প্রাসাদে রামমোহনের সাক্ষাৎ হয়। রাজ্যাভিষেকের সময়ও নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি প্রসিদ্ধ রাজন্যবর্গ, বিদেশীয় দূত ও খ্যাতনামা মনীষীদের সঙ্গে একত্র আসন প্রাপ্ত পন। এ সম্মান পরবর্তীকালেও কেউ পায় নি। রামমোহনকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য লণ্ডনে একটি বৃহৎ প্রকাশ্য সভা আহুত হয়েছিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু মনীষী ব্যক্তি ঐ সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় রামমোহনের পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচারশক্তি, নির্ভীকতা ও স্বাদেশীকতা প্রভৃতি গুণরাশির জন্য ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। ঐরূপ সম্মান কদাচিৎ কোনো বিদেশী পেয়েছেন। মহাড়ম্বরপূর্ণ সভা দেখে এক বক্তা বলেছিলেন যে সক্রেটিস, প্লেটো, নিউটন, বেকন, মিল্টন প্রভৃতি মহামনীষীরা এই সভায় উপস্থিত থাকলে যে সমাদর পেতেন অদ্বিতীয় ভারত-পুরুষ রাজা রামমোহন অনুরূপ সম্মান লাভ করলেন। সভার অন্তে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে রামমোহন বলেন যে দেশবাসী নরনারীর মঙ্গলার্থে নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরে তিনি আপনাকে যথেষ্ট কৃতার্থ মনে করছেন। সভাভঙ্গের পূর্বে সভাপতির আদেশ অনুসারে সকলে দণ্ডায়মান হয়ে রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। রামমোহন ইংরেজবাসীর হৃদয়ে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। তিনি ঐ সময় একবার ফ্রান্সে যান। ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপ তাঁকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা জানান এবং নিজ প্রাসাদে আমন্ত্রণ ক'রে একত্র আহার করেন। বাস্তবিক পক্ষে ইংলণ্ডে রামমোহনকেই ভারতের প্রথম সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দূত বলা যায়। ইংলণ্ডে রামমোহনের গৌরব ভারতেরই গৌরব ছিল। তাঁর এক ইংরেজ জীবনীকার লিখেছেন, "এদেশে রামমোহনের উপস্থিতি হইতে ইংরেজগণ প্রথমে বুঝিতে পারিলেন যে, প্রাচ্য দেশে তাঁহারা যে জাতিকে পরাজিত করিয়া অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছেন তাহাদের মর্যাদা, সভ্যতা ও ধর্মপরায়ণতা কত উচ্চ শ্রেণীর। ভারত যেন রামমোহনের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে বাস করিল এবং আমরা তাহার মহিমা দেখিলাম।

…স্বদেশে তিনি যেমন ইংলণ্ডের বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডেও সেইরূপ ভারতের বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন।"

জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সমস্ত সমস্যা নিয়ে রামমোহন কাজ আরম্ভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেশনেতারা তাঁরই আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ এই শতাধিক বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় জাতীয়তা পরিপূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এই শুষ্ক নির্জীব দেশে মুক্তির বাণী ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন এসেছেন।…তিনি কি না করিয়াছিলেন? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গ সাহিত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, বঙ্গ সমাজের যে কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র। বঙ্গ সমাজের সর্বত্রই তাঁহার স্মরণ স্তম্ভ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে; তিনি এই মরুস্থলে যে সকল বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহারা বৃক্ষ হইয়া শাখা প্রশাখায় প্রতিদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।"

রামমোহন ভারতবর্ষে সমস্ত ক্ষেত্রেরই ছিলেন পথিকৃৎ—প্রথম পথ-প্রদর্শক। বাস্তবিকই তাঁর রাজা উপাধির সার্থকতা এইখানে। জার্মান মনীষী অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বলেছেন, "প্রিন্স কথাটির জার্মান প্রতিশব্দ 'ভূরষ্ট'; ইংরেজী ফার্স্ট তিনি যিনি সর্বদাই অগ্রণী, যিনি বিপদের জায়গাটি বাছিয়া লন, যুদ্ধে প্রথম স্থান এবং পলায়নে শেষ জায়গা। রামমোহন রায় এইরূপ ভুরষ্ট ছিলেন, একজন সত্যকার প্রিন্স, বাস্তবিক রাজা, যদিও ল্যাটিন রেক্স শব্দটির মত রাজার অর্থ আদিতে ছিল কর্ণধার।"

আজও আমাদের জাতীয় জীবনে বিপ্লবী রামমোহনের মতো জাতীয় বীরের প্রয়োজন সদাই অনুভূত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদেব এখনকার কালে তাঁহার মতো আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা কাতরস্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি, "রামমোহন রায়, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে। তোমাকে বঙ্গদেশের বড়োই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বাকপটু, আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও। আমরা আত্মম্ভরী, আমাদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে শিখাও, আমরা লঘুপ্রকৃতি, বিপ্লবের স্রোতে চরিত্র গৌরবের প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরের প্রখর আলোকে অন্ধ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ভালোমন্দ নির্বাচন করিতে ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও।"

অন্যত্র কাব্যেও আহ্বান জানিয়েছেন কবিগুরু রামমোহনের অমর আত্মাকে :

"মৃত্যু অন্তরাল ভেদি দাও
তব অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে
জাগাও নব প্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের
পরশমণি তব
এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক
শক্তি অভিনব।"

নববঙ্গের দীক্ষাগুরু

বিদ্রোহী ডিরোজিও

জাতীয়তার আদি মন্ত্রগুরু বিদ্রোহী রাজা রামমোহন যখন সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক চেতনা উদ্বোধনের নানাবিধ পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যাপৃত, তখন বাংলাদেশে আর এক তরুণ বিদ্রোহীর আবির্ভাব হলো। তিনি হলেন নববঙ্গের দীক্ষাগুরু হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি বাংলার তরুণদের মনে সমাজ সংস্কারের বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করছিলেন। তিনি জন্মেছিলেন ১৮০৯ খৃস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল এবং ইহলোক ত্যাগ করেন ১৮৩১ খৃস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর। এই অতি স্বল্পস্থায়ী জীবনকালের মধ্যে বাঙালী সমাজে ডিরোজিও এক বিরাট ভাব-বিপ্লবের তুফান তুলে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

ডিরোজিও ছিলেন পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি। তাঁর কোনো পর্তুগীজ পূর্বপুরুষ এক বাঙালী মহিলাকে বিয়ে ক'রে এদেশে বসবাস করছিলেন। ডিরোজিও ছিলেন 'ধর্মতলা অ্যাকাডেমি'র ছাত্র। তাঁর উপর স্কটল্যাণ্ডবাসী ডেভিড ড্রামণ্ড নামক ঐ স্কুলের এক শিক্ষকের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ডেভিড ড্রামণ্ড ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও প্রগতিপন্থী মানুষ। তিনি ছিলেন ইউরোপে আধুনিক দার্শনিক যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রধান গুরু ডেভিড হিউমের গোঁড়া ভক্ত। নির্মম যুক্তি ও বিচার বুদ্ধির অগ্নিপরীক্ষায় যাচাই না ক'রে ড্রামণ্ড কোনো মতামত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রায় সব বিষয়েই তঁরে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর:মতে মানুষই ঈশ্বর, মানুষই তার সর্বময় প্রভু এবং মানবচিন্তাই ঈশ্বর চিন্তার নামান্তর।

কঠোর যুক্তিবাদী, মানবপ্রেমিক আদর্শ শিক্ষক ডেভিড ড্রামণ্ডের উজ্জ্বল প্রতিভার সংস্পর্শে ডিরোজিওর প্রতিভা বিকশিত হয়। যোগ্য শিক্ষকের প্রভাবে তিনিও কবি ও দার্শনিক হ'য়ে উঠলেন। এবং অত্যল্প বয়সেই তাঁর কবি ও সাহিত্য-খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ড্রামণ্ডের প্রভাবে ডিরোজিও হিউমের দার্শনিক চিন্তা

সম্পূর্ণ আয়ত্ত করলেন। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার চিন্তাও ডিরোজিওকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে তাঁর শিক্ষাকাল শেষ হয়। ১৮২৬ খৃস্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হলেন।

ডিরোজিও হিন্দুস্কুলে কেবল অধ্যাপনা করেই ছাত্রদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক শেষ করতেন না। কলেজের বাইরে ছাত্রদের নিয়ে সাহিত্য ও দর্শনাদি গভীরভাবে আলোচনা করতেন। বন্ধুর ন্যায় অত্যন্ত সহজ সরলভাবে মিশতেন শিষ্যদের সঙ্গে এবং সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতেন। আলোচনা স্থায়ীভাবে চালিয়ে যাবার জন্য তিনি 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' নামে একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন ঐ সভার সভাপতি। ডিরোজিওর তরুণ ছাত্রদল এই সভায় যোগদান করতেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক। এঁরাই 'ইয়ং বেঙ্গলে'র সুযোগ্য প্রতিনিধি। অল্পদিনের মধ্যেই 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সভার নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রগতিমূলক আলোচনায় তৎকালীন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যথেষ্ট বিস্ময় প্রকাশ করতেন।

ডিরোজিওর শিক্ষকতাকালে হিন্দুস্কুলে ছাত্রসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছিল। শিক্ষার মানও ক্রমাগত উন্নতিলাভ করছিল। ইংরেজী, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষার মান এমন উন্নত হচ্ছিল যে কলেজ পরিদর্শক উইলসন্ সাহেব বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। ডিরোজিও সত্যই একজন সার্থক শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রকে আকৃষ্ট করবার এক অভূতপূর্ব যাদুকরী শক্তি ছিল তাঁর। তাঁর সমুজ্জ্বল প্রতিভা ও অকৃত্রিম মানবতা ছাত্রদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখত। তাঁর অন্যতম ছাত্র রাধানাথ শিকদার বলেছেন যে ডিরোজিওর ন্যায় স্নেহপ্রবণ শিক্ষক তৎকালে বাস্তবিকই দুর্লভ ছিল। শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই তিনি শিক্ষা দিতেন না, সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা স্থাপনে এবং অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতেও শিক্ষা দিতেন ছাত্রদের। বেকন, লক, বার্কলে, হিউম, রীড, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে তিনি তরুণ ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিতেন। এই পরিচয়ের ফলে তাঁদের গতানুগতিক চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক আলোড়নের সূত্রপাত দেখা যায়। ডিরোজিওর ক্লাসে ছাত্ররা শিক্ষার এক নতুন আস্বাদ পেতেন। ছাত্রদের মনে তীব্র জ্ঞানানুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলাই ছিল ডিরোজিওর প্রধান উদ্দেশ্য। কতকগুলি বাঁধাবুলি মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষায়

পাস করানোই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। এক এক সময় পাঠ্যপুস্তকের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার আলোচনা করতেন। প্রত্যেকটি বিষয় তিনি এমনভাবে আলোচনা করতেন যাতে ছাত্রদের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হত। এবং সব প্রশ্নের তিনি উত্তর দিতেন। তিনি লক্ষ্য রাখতেন ছাত্ররা যাতে কোনো বিষয় বিনা যুক্তি তর্কে গ্রহণ না করে।

এই যুক্তিতর্কযুক্ত স্বাধীন মতামত প্রকাশের আলোচনা সভা ক্লাসের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ রইল না। পরে উহা ডিরোজিওর বাড়ীর বৈঠকখানায় ও তৎপরে মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগান বাড়ীতে বসত। ঐ সভায় নানা তর্ক বিতর্ক ও বক্তৃতাদি হ'ত। সবাই প্রাণ খুলে মনের সুখে আলোচনা করতেন। তৎকালে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় নানা অন্যায়, অবিচার, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের চিত্র ডিরোজিওর চোখের সামনে ভাসত। তিনি সর্বপ্রকার অমানুষিক প্রথার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানবতায় উদ্‌বুদ্ধ মহাপ্রাণ ডিরোজিও বিরাট বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তাঁর এই বিপ্লবী ভাবধারা সঞ্চারিত হ'ল তাঁর তরুণ ও প্রতিভাধর ছাত্রদের মধ্যে। এই তরুণ বিদ্যার্থীরাই পরবর্তীকালে নবযুগের বাংলা প্রতিষ্ঠা করেছেন—সমাজ ও ধর্ম সংস্কার এবং জাতীয়তাবোধ উন্মেষের দ্বারা। ডিরোজিওর শিষ্যমণ্ডলী—যাঁরা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত—তাঁরা শত শতাব্দীর পচাধসা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এই বিদ্রোহ ছিল সর্বপ্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, নৈতিক ভণ্ডামি ও নোংরামির বিরুদ্ধে, কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, বিচার বুদ্ধিহীন অবৈজ্ঞানিক শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধে, প্রাণহীন চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও মানসিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে, অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে—এমন কি কখনো কখনো ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধেও।

ডিরোজিওই নয়াবাংলার স্বাধীন ও প্রগতিমূলক চিন্তাধারার আদিগুরু। তাঁর অভিনব চিন্তাধারা হিন্দুস্কুলের সীমা ছাড়িয়ে ক্রমে সমাজের অন্যান্য তরুণদের মধ্যেও সঞ্চারিত হ'ল। দিনে দিনে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। এদিকে ঝড় উঠল হিন্দু সমাজে। বাংলার হিন্দুরা আতঙ্কিত হ'ল ডিরোজিও প্রভাবিত হিন্দুস্কুলের ছাত্রদের বিপ্লবী আচরণ দেখে। তরুণদের স্বাধীন ও উদার চিন্তা সমাজের সনাতন অনুদার ভাবধারার প্রতিকূল দেখে হিন্দুনায়করা সমাজের ঘোরতর অমঙ্গলের আশঙ্কা করলেন। তাঁরা ভাবলেন ডিরোজিওকে হিন্দু স্কুল থেকে বিতাড়িত করতে না পারলে দেশের সমূহ বিপদ—তরুণরা স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠবে, সমাজ রসাতলে যাবে। হিন্দুদের সমস্ত আক্রোশ পুঞ্জীভূত হ'ল ডিরোজিওকে কেন্দ্র ক'রে। ডিরোজিওই

সমাজের সমস্ত অনর্থের মূল বলে প্রতিপন্ন হলেন। অপরাধ, তিনি গতানুগতিক প্রথায় না পড়িয়ে অবাধ আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের স্বাধীন ও প্রগতিবাদী বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণের সহায়তা করেছেন। তাঁর আরও অপরাধ তাঁর চিন্তা-ভাবনা প্রচলিত বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার বিপরীত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেকেই হিন্দুস্কুলে ছাত্র পাঠান বন্ধ করে দিলেন। অথচ সমাজনায়কদের এই সমস্ত ধারণা ছিল ভ্রান্তিমূলক। তৎকালীন দু'একজন বিশিষ্ট বাঙালীর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে ডিরোজিওর অনুগামী হিন্দুস্কুলের ছাত্রদের ব্যবহার সকলের নিকট প্রশংসনীয় ছিল। ছাত্ররা সত্যবাদী ও আদর্শনিষ্ঠ বলেই খ্যাতি ছিল। সেই থেকে স্কুলের ছাত্র বলতেই সত্যবাদী যুবক বুঝাত। স্কুলের ছাত্র যে মিথ্যা বলতে পারে না, এ ধারণা একেবারে প্রবাদ বাক্যের মত হয়ে উঠেছিল। নববাংলার তরুণদল প্রচলিত রীতিনীতি আচারবিধির বিরোধী হলেও এঁরা চরিত্রবান বলে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ডিরোজিওর নিজের চরিত্রও ছিল অত্যন্ত নিষ্কলঙ্ক। তবুও হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাড়াবার প্রয়াস পেলেন। ডিরোজিও যে অযোগ্য শিক্ষক বা তিনি যে হিন্দুসমাজের সর্বপ্রকার অশান্তির মূল কারণ তা প্রমাণিত হ'ল না। কিন্তু যেহেতু কলকাতা শহরের সমগ্র হিন্দুসমাজের বদ্ধমূল ধারণা যে ডিরোজিওই সমস্ত অনর্থের মূল কারণ এবং ছাত্রসমাজের যাবতীয় অনাচার-ব্যাভিচারের প্রধান উৎসাহদাতা, তখন অধিকাংশের ভোটেই তাঁকে পদচ্যুত করা স্থির হ'ল।

কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের উত্তরে ডিরোজিও বলেছিলেন, "এদেশের একদল তরুণের শিক্ষার খানিকটা দায়িত্ব কিছুদিনের জন্য বহন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তাদের একদল গোঁড়া আপ্তবাক্যবাদী অন্ধবিশ্বাসী তৈরী না ক'রে সত্যিকার সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ তৈরী করব। তাই সকল বিষয়ে সর্বপ্রকারের মতামত নিয়ে অবাধে আলোচনা করতে আমি তাদের উৎসাহ দিতাম। আমার বিশ্বাস, তা না করলে কোনো মানুষেরই অব্যক্ত প্রাতভা ও সুপ্ত মানসিক শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হয় না।··· তরুণদের মনে কোনো নির্দিষ্ট বিশ্বাস সৃষ্টি করা কোনোদিন আমার উদ্দেশ্য ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও মতের পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে আমি নিজে এত বেশী সজাগ যে অত্যন্ত ছোটখাট বিষয়েও আমি কখনও একটি নির্দিষ্ট মত প্রকাশ করি না। অনুসন্ধিৎসার অনন্ত সমুদ্রে দুর্জ্ঞেয় সত্যের দ্বীপে যাত্রা করাই জ্ঞানান্বেষণের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে আমার ধারণা।"

হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতার পদে ইস্তফা দিয়ে ডিরোজিও সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। সংবাদপত্র জনমত গঠনের শক্তিশালী হাতিয়ার ভেবে ডিরোজিও

"দি ইস্ট ইণ্ডিয়ান" (The East Indian) নামে একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সমস্ত সামাজিক কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হ'ল এই পত্রিকায়। এই সময় ডিরোজিও প্রভাবিত তাঁর কয়েকজন প্রতিভাধর তরুণ শিষ্যও কয়েকটি পত্রপত্রিকা প্রকাশ করলেন। যেমন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত "The Enquirer" (১৮৩১), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত "জ্ঞানান্বেষণ", রামগোপাল ঘোষ সম্পাদিত "বেঙ্গল স্পেক্টেটর।" ডিরোজিওর উপদেশ-পরামর্শেই এ-সব পত্রিকা চলত।

নববঙ্গের বিদ্রোহী তরুণদের নেতা ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় সমাজ ও সমাজপতিদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তরুণদের উৎসাহিত করতেন। ধর্মোন্মাদদের কটূক্তি ও বিষোদ্গারের সামনে তরুণদের উদার-হৃদয়ে ধৈর্য ধরে থাকতে উপদেশ দিতেন। তিনি শীঘ্রই বাড়ী থেকে বিতাড়িত হলেন। সমাজের অন্যায় ও অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল তখন ডিরোজিও-শিষ্য কৃষ্ণমোহন তাঁর 'এনকোয়ারার' পত্রিকায় বললেন, "কুসংস্কার আমরা বর্জন করেছি বলে অতি ধার্মিকরা আমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়েছেন। আমরা যা করছি তা ন্যায়-সঙ্গত এবং যুক্তিযুক্ত। এর জন্য আমরা মৃত্যুও বরণ করতে রাজী আছি।...সর্বপ্রকারের অত্যাচার আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত। একটা জাতিকে সংস্কারমুক্ত ও উন্নতচিত্ত করতে হ'লে বাইরে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবেই। বিশেষত: হিন্দুসমাজের যে অবিশ্বাস্য কুসংস্কার আছে তা উচ্ছেদ করতে হ'লে সংগ্রামীদের প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হবে।...আমরা আমাদের ধন্য মনে করি, যেহেতু হিন্দুজাতির নৈতিক উন্নতি সাধনের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি। সামনে এগিয়ে চলার যে ভেরী বাজিয়েছি আমরা, তা বাজিয়ে যাব, থামব না। হিন্দু ধর্মের যে-সব বিষয় নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য মনে ক'রে আমরা সংগ্রাম করছি, তা আমাদের সম্পূর্ণ জয় না হওয়া পর্যন্ত ক'রে যাব।"

ডিরোজিও একদিন তাঁর প্রতিভাধর শিষ্যদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে কাব্য রচনা করেছিলেন। তাতে তিনি কল্পনায় ভর ক'রে বলেছেন, "আমি দেখছি, সদ্য ফোটা ফুলের মতোন পাঁপড়ি মেলে তোমাদের প্রতিভার মুকুল ফুটে উঠছে, মনের কপাট খুলে যাচ্ছে একে একে, এবং যে মোহের বন্ধনে তোমাদের প্রচণ্ড ধীশক্তি আজ শৃংখলিত তাও ক্রমে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। পাখির ছানার মতোন তোমাদের ডানা-ঝাপটানি শুনছি আমি, আর কান পেতে আছি কবে নীড়ের বন্ধন ছেড়ে, মুক্ত ডানায় ভর দিয়ে, উধাও হবে তোমরা অনন্ত আকাশের সীমানা সন্ধানে।" শেষে শিষ্যদের কর্মসাধনার সফলতার মধ্যে নিজের ভাব-সাধনার সার্থকতার সন্ধান পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছেন:

"অনুভবে বুঝি তবে, ব্যর্থ নয় আমার জীবন" [Then I feel I have not lived in vain]

১৮৩১ সালে ডিরোজিওর জীবনাবসানের পরেও তরুণ ডিরোজিয়ানদের সংস্কারসাধনের কাজ থেমে যায় নি। তাঁর নিজ হাতে প্রজ্বলিত বিদ্রোহের অগ্নিশিখা অনির্বাণ ছিল। তাঁর স্বল্পস্থায়ী শিক্ষকতাকালে তিনি যে বলিষ্ঠ একদল দেশপ্রেমিক গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের নানাক্ষেত্রে এক একজন দিকপাল হয়েছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রাধানাথ সিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি পরবর্তীকালে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে পুরোধার কাজ করে গেছেন। সমাজসংস্কার করতে গিয়ে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের যেমন জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, সেইরূপ স্বাধীন চিন্তার প্রবর্তক ডিরোজিওকেও হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল।

ডিরোজিওই এদেশে সর্বপ্রথম নবযুগের কল্পনা ও চিন্তা কাব্যে প্রকাশ করেছেন। রামমোহনের পরে তিনিই প্রথম ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তা নিয়ে একাধিক কবিতা রচনা করেছিলেন। ডিরোজিওই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষকে 'মাতৃভূমি' বলে সম্বোধন করেন। দেশকে মাতৃরূপে বন্দনার তিনিই আদিগুরু। তিনিই এদেশে সর্বপ্রথম সাহিত্যে স্বদেশবন্দনার সূত্রপাত করেন। তাঁর 'To India—My Native Land' (হে ভারত, স্বদেশ আমার) এবং 'The Harp of India' (ভারতের বীণা) এই দুটি কবিতার মধ্যে স্বদেশপ্রেম মূর্ত হয়ে উঠেছে। উভয় কবিতায় সুপ্রাচীন নানা গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যবাহী ভারতে পরাধীনতার বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। এবং শেষ চরণে কবি স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছেন। কবিতাদ্বয় এদেশের প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের যথার্থ মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। উভয় কবিতার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হল :

হে ভারত, স্বদেশ আমার

[To India, My Native Land]

অনু : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী !
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার ; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে !

কোথায় সে বন্দ্যপদ ! মহিমা কোথায় !
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায় ।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ ।
এ শ্রমের এইমাত্র পুরস্কার গণি
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননী ।

ভারতের বীণা

[The Harp of India]

অনু : পল্লব সেনগুপ্ত

শুকনো ফুলের কুঞ্জে তুমি কেন একা দোলায়িত—
তারগুলো সব ছেঁড়া ? রইবে কি তুমি ওখানেই ?
তোমার সাতটি স্বর মধুক্ষরা ছিল কবে সেই—
সে সুর অশ্রুত আ'জ, হয়ে আছে বিষাদে বিস্মৃত।
তোমাকে রেখেছে বেঁধে, সুনির্মম স্তব্ধতা কঠিন
একা হয়ে পড়ে আছ উপেক্ষায় রুদ্ধ বাণী তুমি
ভাঙা মহলের মতো, পড়ে আছ ধূ-ধূ মরুভূমি,
তোমার সুরেলা স্বরে মধু ঝরে যেত একদিন,
এবং তুলতো মালা চারণের গলায় যশের ;
যোগ্যতর সে কবিরা সমাহিত ফুলের বাহারে,
প্রাণেরা অবশ্য স্তব্ধ ; তবু যদি ছন্দ বাজে তারে
নন্দনের সুরে জেগে জীবনেরা ফিরবেই ফের !
আমাকে বাজাতে দাও স্বদেশের মধুমন্তী বীণা,
আমাকে বাজাতে দাও, দেখি ফের প্রাণ বাজে কি-না !

ডিরোজিও ফিরিঙ্গি হলেও ভারতবর্ষকে আপন দেশ; স্বীয় মাতৃভূমি হিসাবেই দেখতেন। তিনি মনেপ্রাণে ভারতীয় ছিলেন। আর ছিলেন মানব প্রেমিক। তাঁর ঐ মানবমন্ত্রে নবযুগের বাংলা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

একে তো বয়সে অত্যন্ত তরুণ, তারপর একটি পর্তুগীজ ফিরিঙ্গির পক্ষে ভারতবর্ষের জন্য এমন গভীরভাবে বেদনাবোধ করা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। তখন এক রামমোহন রায় ছাড়া সে সময়ে অন্য কোনো ভারতবাসীকে ভারতবর্ষের জন্য এমনভাবে ভাবতে দেখা যায় নি।

ডিরোজিও বিরচিত স্বাধীনতা বিষয়ক একাধিক কবিতা আজও অতুলনীয়। "Oh Freedom !" [ও: স্বাধীনতা] কবিতায় 'স্বাধীনতা' নাম হৃদয়ের বেদীমূলে অনির্বাণ শিখা জ্বেলেছে :

"Oh freedom ! There is something dear
E'en in thy very name,
That lights the alter of the soul
With everlasting flame".

"Thermopylae" [থার্মোপলি] কবিতায় স্বাধীনতা ও মুক্তির সুর শোনা যায় :

"Why They fought, and why they fell ?
'Twas to be free !
How liberty in death is won,
What deeds with Freedom's swords are done
In freemen's hands !
They fought for free and hallowed graves
They scorned to breath the breath of slaves".

"Freedom to the Slave" [ক্রীতদাসের মুক্তি] কবিতায় স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদিত :

How felt he when he first was told
A slave he ceased to be ;
He Knelt no more ; his thoughts were raised,
He felt himself a man."

ডিরোজিও তাঁর তরুণ ছাত্রদের মনেও স্বাধীনতা এবং স্বাদেশিকতার বীজ উপ্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে উহা জাতীয় জীবনে ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর 'অ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসনে'র আলোচনা সভায়ও মধ্যে মধ্যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা

সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হত। ঐ সভায় বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধেও ঘন ঘন গর্জনধ্বনি শুনতে পাওয়া যেত। ডিরোজিও কেবল অ্যাকাডেমিক সভাতেই বক্তৃতা দিতেন না। অন্যান্য বিদ্যালয় হতে নিমন্ত্রিত হয়েও বক্তৃতা দিতেন। বাংলার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে ডিরোজিওর দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরই স্বাধীনতামন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের সভ্যরা পরবর্তীকালে জাতীয় জাগরণের সক্রিয় পন্থায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

বিনয় সরকারের ভাষায়, "অ্যাকাডেমিকের আলোচনার ভিতর দিয়ে সত্যের দুর্গম দ্বীপে তরুণ বাংলার দুঃসাহসিক অভিযান চলতে থাকল অনিরুদ্ধ গতিতে। বাংলার এই তরুণ অভিযাত্রিকদের নাবিক হলেন ডিরোজিও।"

জাতীয়তার উন্মেষণায়

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। বাংলার বিরাট বিশৃঙ্খল সমাজজীবনে তখন চলেছে ভাঙা-গড়ার সংঘাত। শতাব্দীর প্রথম ত্রিদশকের মধ্যে রামমোহন ও ডিরোজিও অভিশপ্ত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুক্তির পথ-নির্দেশ করে গেলেন। বলিষ্ঠ সংগঠনের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। এই সময় বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত। একদিকে বিদেশী বিজাতি ইংরেজ শাসনের রুদ্রমূর্তি। অন্যদিকে সাধারণের রুচিবিকার, পরানুকরণ ও পরমুখাপেক্ষিতায় বঙ্গীয় সমাজজীবন আচ্ছন্ন। স্বধর্ম-স্বজাতি প্রীতির ভিত্তিমূল অত্যন্ত শিথিল। স্বদেশপ্রেম সুদুর্লভ। জাতীয় জীবনের এই অন্ধকারের যুগে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ-ভাবনার প্রবর্তন করলেন ঈশ্বর গুপ্ত। তিনিই বাংলা সাহিত্যে জাতীয় ভাব প্রকাশের প্রথম পথিকৃৎ। স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তার উন্মেষণায় ঈশ্বর গুপ্তের দান অসামান্য। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ পূর্বগামী। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' নামে একখানি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। ইহাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। এই পত্রিকার মাধ্যমেই কবি তাঁর স্বদেশপ্রীতিমূলক ও জাতীয় ভাবোদ্দীপক রচনাসমূহ প্রকাশ করে গেছেন।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও ইংরেজী শিক্ষার মোহে যখন সমগ্র দেশ আচ্ছন্ন; মাতৃভূমির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন; দেশের রীতিনীতি, বেশভূষা, আচার-আচরণ, ধর্ম ও সমাজের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রবল, তখন গুপ্ত-কবি ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাতে অথবা উপদেশের ছলে বিপথগামী স্বদেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধের বীজ বপন করার প্রয়াস পেলেন। যে-দেশে

আমরা জন্মেছি, সেই জন্মভূমিকে কখনো আমাদের ভোলা উচিত নয়। তাই তিনি বললেন,

"জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে॥"

মানুষের জন্মভূমি তার জনক-জননী প্রভৃতি পূর্বপুরুষদেরও জন্মভূমি। তাই প্রত্যেক মানুষ তার জন্মভূমির মোহে মুগ্ধ হয়। আমাদেরও উচিত আমাদের স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া; প্রীতি প্রকাশ করা:

"প্রসূতি তোমার যেই, তাহার প্রসূতি এই,
বসুমতী মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষতঃ নিজদেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধজীব যার মোহমদে॥"

অপর দেশ যতই সুন্দর ও সম্পদশালী হোক না কেন, তবুও মানুষের নিকট তার জন্মভূমি স্বদেশই সর্বাধিক সুন্দর ও প্রিয়তম। বহুমূল্য স্বর্ণ, মণি, মুক্তা, এমনকি স্বর্গসুখও স্বদেশপ্রেমের কাছে অতি তুচ্ছ। তাই গুপ্ত-কবি বলেছেন:

"ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গ-ভোগ উপসর্গসার।
শিবের কৈলাস ধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার॥"

প্রকৃত দেশপ্রেমিকের নিকট দেশের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুও অতীব আদরণীয়। বিশেষ করে

বিদেশে বসবাসকারী ব্যক্তির নিকট স্বদেশের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। কবি তাঁর স্বদেশবাসীকে স্বজনপ্রীতি প্রদর্শনের আহ্বান জানালেন:

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥
স্বদেশের প্রেম যত, সেইমাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্রপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার॥

পরাধীন ভারতের দুর্দশাদর্শনে কবি অত্যন্ত মর্মাহত। তিনি ভারত সন্তানদের আলস্য ত্যাগ করে জননী জন্মভূমির অশ্রুমোচন করতে এবং সাধ্যমত স্বদেশের সেবা করতে আহ্বান জানিয়েছেন:

"জাগ জাগ জাগ সব ভারত-কুমার।
আলস্যের বশে হয়ে ঘুমাও না আর॥
তোল তোল তোল মুখ খোলরে লোচন।
জননীর অশ্রুপাত কর রে মোচন॥
... ...
এখন আলস্য নহে বিধান-বিহিত।
সাধ্যমতে সিদ্ধ কর স্বদেশের হিত॥

কবির আশা ভারত আবার স্বাধীন হবে এবং গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই "ভারতের ভাগ্যবিপ্লব" কবিতায় লিখলেন:

"স্বাধীনতা মাতৃস্নেহে, ভারতের জরা-দেহে
করিবেন শোভার সঞ্চার।"

এইভাবে ঈশ্বরগুপ্ত দেশবাসীর অন্তরে পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার মর্মবাণী জাগিয়ে তুললেন। তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে জন্মভূমিকে জননী আখ্যায় অভিহিত করলেন।

ঈশ্বর গুপ্তের সর্বপ্রধান কীর্তি মাতৃভাষার সেবা। তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন বাংলাভাষা ছিল অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও ব্যঙ্গের বস্তু। একদিকে গোঁড়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের দল, আর একদিকে ইংরেজী শিক্ষিতের দল। উভয় দলই বাংলা

ভাষাকে শিক্ষণীয় ভাষা বলে তার গুরুত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত। দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে মাতৃভাষার প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে দেখে গুপ্ত-কবি সখেদে লিখলেন :

"হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ,
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ।
... ...
অপমান আপনার প্রতি ঘরে ঘরে,
কোন মতে কেহ নাহি সমাদর করে।"

আশাবাদী কবি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান জানালেন মাতৃভাষার উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করতে। বললেন,

"মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে।"

গুপ্ত-কবির স্বদেশভাবনামূলক রচনাগুলি পদ্যেই অধিক প্রকাশিত ; কিন্তু তাঁর কিছু কিছু গদ্য রচনাও আছে। তন্মধ্যে "দেশভাষা" অন্যতম। এই প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর গদ্যরীতি, ভাষা ও দেশপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্তমান। মাতৃভাষার উন্নতিসাধনকল্পে তিনি বলেছেন, "সংপ্রতি স্বদেশীয় ভাষার উন্নতিকল্পে সর্বতোভাবে সংপূর্ণ যত্ন করা অতি কর্তব্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেশের উচ্চগৌরব কোন মতেই রক্ষা হইতে পারে না।"

প্রাচীন ভারতে সুমহান্ সভ্যতার অভ্যুদয় ও বর্তমানে তার অধোগতির বিষয় লক্ষ্য করে কবি সখেদে বলেছিলেন, "কি আক্ষেপ! কিছুদিন পূর্বে যে জাতির ন্যায় অসভ্যজাতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই, গহন যাহারদের গৃহ ছিল, বৃক্ষের ত্বক্ যাহারদের বস্ত্র ছিল, পর্ব্বতাদি যাহারদের দেবতা ছিল, পশুহত্যা যাহারদের ধর্ম ছিল, মূর্খতাই যাহারদের বিদ্যা ছিল, অধুনা সেই আধুনিক সভ্যতাভিমানী পুরাতন অসভ্যদিগের দ্বারাই আমরা অসভ্য বলিয়া উপহাস্য এবং অনাদৃত হইতেছি, ইহা অপেক্ষা আর কি দুর্ভাগ্য হইতে পারে?···
বহুকাল অবধি আমরা পরাধীন হইয়াছি।···যদি একাল পর্যন্ত এই দেশ স্বাধীন থাকিত তবে আমরা অন্য দেশীয় লোক কর্তৃক এতদিনে দেবশব্দে বাচ্য হইতাম।"

মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাভিমানী ব্যক্তিদের ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "স্বজাতীয় ভাষায় সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ থাকিয়া পরজাতীয় ভাষার সমাদর করিতে কি লজ্জাবোধ করেন না? তাঁহারদিগের এরূপ ব্যবহারে আমারদিগের অনেক আশা ও অনেক ভরসা বিফলা হইতেছে।"

ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য-সেবা তাঁর স্বদেশপ্রীতির একটা বিশেষ দিক। তিনিই সাহিত্যের

মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম প্রচারের প্রথম উদ্বোধক। এতদিন বাংলা সাহিত্য ছিল ধর্মভিত্তিক। তিনিই প্রথম একে করলেন বাস্তবমুখী—দেশপ্রেমভিত্তিক। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "বাঙ্গালাভাষার উন্নতিসাধন সম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তির গুণকীর্তন করা আমাদের অভ্যাস হইয়াছে তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে কীর্তিত হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

ঈশ্বরগুপ্ত কেবল নিজেই সাহিত্যের সাধনা করে ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষিত নব্যযুবকদের মাতৃভাষার অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, মনোমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি উদীয়মান শিক্ষিত তরুণ ছাত্রদের বাংলা রচনা বিষয়ে উপদেশ দিতেন, সংবাদপত্রে (সংবাদ প্রভাকরে) তাঁদের রচনা প্রকাশ করে ভূয়সী প্রশংসা করতেন। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ দিক্‌পালগণ ঈশ্বরগুপ্তের মন্ত্রশিষ্য। জাতীয়তা ও স্বাধীনতার বাণীপ্রচারে এঁরা ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের সক্ষম ও বলিষ্ঠ উত্তরাধিকারী। মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতিও গুপ্ত-কবির দ্বারা প্রভাবিত। তাই অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেছেন, "তখন বঙ্গ সাহিত্যের সম্রাট ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত।" অপর এক সমালোচকের ভাষায়, "সেই দিনের বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তই ছিলেন যুগন্ধর মানব—বাংলা ভাষা যেন তাঁকে আশ্রয় করে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর দৈবী প্রতিভা, দুর্লভ মনীষা সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে শুনিয়েছিল উজ্জীবনের মন্ত্র। বর্তমানের বাঙ্গালীর আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, আনন্দে, জাতীয় জাগরণে আমরা যেন গুপ্ত-কবির হৃদয়স্পন্দনটুকু শুনতে পাচ্ছি। বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে, বাঙ্গালীর বাংলা সাহিত্যের বিবিধক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর অধ্যাত্মচেতনায় এবং বিস্মৃত মানসলোকে গুপ্ত-কবির ভাবসাধনা ও রূপসাধনার প্রভাব অপরিসীম। বাংলাদেশ সেদিন যেন অনুভব করেছিল দরিদ্র মাতৃভাষাকে মণিদীপ্ত রত্নাসনে রাজেন্দ্রাণীর গৌরবে অধিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর এমন এক প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে।"

স্বাধীনতাকামী মানুষকেই ঈশ্বরগুপ্ত একমাত্র মানুষ বলে অভিহিত করেছেন: "স্বজাতীয় ধর্মরক্ষার এবং বিদ্যার আলোচনার জন্য যে মনুষ্য যত্নশীল না হইল, সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে; যে স্বদেশের স্বাধীনতা স্থাপনের প্রতি অনুরাগী ও উৎসাহী না হইল, সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে…মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যিনি স্বদেশীয় লোকের কল্যাণার্থ অত্যন্ত অনুরাগী; অপিচ মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যিনি স্বজাতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রের উন্নতির জন্য প্রযত্ন করেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।"

দেশের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের ছিল এক মহান মমত্ববোধ, দেশের মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন; কিন্তু যেখানে দুর্বলতা, অন্যায়-অবিচার দেখেছেন, সেখানে তিনি তার

কঠোর সমালোচনা করেছেন। তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়েও চেতনার চাবুক হেনে তিনি দেশবাসীর মনে স্বাজাত্যবোধ জাগাবার চেষ্টা করেছেন। অথচ তাঁর বিদ্রূপের মধ্যে বিদ্বেষের বা বৈরিতার চিহ্নমাত্র ছিল না। ছিল শুধু গভীর জ্বলন্ত দেশপ্রেম। সেকালে নীলকরদের অত্যাচারে বাঙ্গালীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাই সেই অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উদ্দেশ্য করে যে মিনতি জানিয়েছিলেন, তাতে তিনি প্রকারান্তরে বাঙ্গালীজাতির দুর্বলতার বিষয়েই কটাক্ষ হেনেছিলেন :

(১) "হলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা, ঘটে সর্বনাশ
বাঙ্গালী তোমার কেনা, এ কথা জানে না কে না ?
হয়েছি তো চিরকেলে দাস।"

(২) "তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি সিং বাঁকানো,
যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙ্গে না।
আমরা ভূষি পেলেই খুসী হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না॥"

সত্যিকথা বলতে কি সেদিন ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবে [১৮১২] বাংলার মহত্নপকার সাধিত হয়েছে। শতাধিক বছর পূর্বে দেশবাসীকে স্বদেশ-ভাবনার যে মন্ত্র তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তার উপযোগিতা আজও যথেষ্ট অনুভূত হয়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, "নোতুন যুগ-ধর্মের পরিবেশ তাঁর মনকে স্পর্শ করেছিল। আর আধুনিকভাবে দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, স্বাদেশিকতা এবং দেশের ও জাতির উন্নতির জন্য একান্ত কামনা করে, তাঁর লেখনী তিনি চালনা করেছিলেন। ঈশ্বরগুপ্ত এত আগে থাকতেই স্বদেশীভাবের ভাবুকরূপে দেখা দিয়েছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবোধ এবং নাগরিক কর্তব্যবোধের কবিতাগুলির উপযোগিতা আমাদের জীবনে এখনো আছে।"

জাতীয়তার উদ্গাতা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এদেশে জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে রামমোহনের পরেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান। "বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে দ্বিতীয় সৃজনীশক্তি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলিতে গেলে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী তাঁহারই জীবনজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ [১৮১৭] করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন রামমোহনেরই মানসপুত্র, তাঁহার চিন্তা-ভাবনার উত্তরসাধক।" রামমোহন এদেশে জাতীয়তার যে উদ্বোধন করেছিলেন মহর্ষির সাধনায় তা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। যে ব্রাহ্মধর্ম এদেশে নবযুগের সূচনা করে, রামমোহন ছিলেন তার প্রবর্তক। আর মহর্ষি ছিলেন তার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার, সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও জাতীয়তার উন্মেষণায় দেবেন্দ্রনাথের দান অসামান্য, যা জাতির ইতিহাসে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রামমোহন ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন; কিন্তু প্রচার করে যেতে পারেন নি। দেবেন্দ্রনাথ এই ধর্মের সম্যক প্রচার ও প্রসার করে রাজার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ-পুরুষ হিসাবে কেবল ধর্মপ্রচারেই তাঁর কর্মপ্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষা, সাহিত্য এবং স্বদেশী প্রচারেও তাঁর প্রয়াস প্রশংসার্হ।

১৮৩৯ সালের ৬ই অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র জন্ম হয়। বাংলার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে এই তত্ত্ববোধিনী সভা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পাশ্চাত্ত্য ধর্ম ও বিলাসিতার স্রোতে যখন দেশ উৎসন্নে যেতে বসেছিল, জাতির নৈতিক জীবনে যখন ভাঙ্গন ধরেছে, চারিদিকে যখন উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত ভাব, তখনই তিনি এই সভার প্রতিষ্ঠা করলেন সমগ্র জাতিকে স্বদেশী ভাবধারায় অভিষিক্ত করে গভীর স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য।

১৮৪০ সালের জুন মাসে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের কিশোরদের মনে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং মাতৃভাষার প্রতি

অনুরাগ সঞ্চারিত করাই ছিল এই পাঠশালা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। কেবল বিদ্যালয় স্থাপন করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। সহকর্মীদের দ্বারা মাতৃভাষা বাংলায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকও রচনা করিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের বহু পূর্বে তিনি বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়ে পথিকৃতের সম্মান লাভ করেছেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার মাধ্যমেই সমস্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা ছিল। প্রথম পর্যায়ে কিশোরদের তিনি ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন যে মাতৃভাষায় যথেষ্ট দখল না থাকলে কোনো ভাষাই ভাল করে আয়ত্ত করা যায় না। দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়ের সম্মান লাভের যোগ্য।

আমাদের জাতীয় জীবনের নবজাগরণে দেবেন্দ্রনাথের আর এক অবিস্মরণীয় অবদান "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশ। ১৮৪৩ সালের আগষ্ট মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে এর যা দান, ততোধিক দান বাংলা গদ্য সাহিত্যে। যে-সব পত্রপত্রিকা বাংলা সাহিত্যের বনিয়াদ গড়ে তুলেছে, তত্ত্ববোধিনী তাদের অন্যতম। এই পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবময় সংযোজন। পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর অন্য কোনো পত্রিকার ভাগ্যে সে গৌরব জুটে নি। ধর্ম ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের আলোচনার জন্য সারা বাংলায় তত্ত্ববোধিনীর বিশেষ সমাদর হয়েছিল। খৃস্টান মিশনারীদের আক্রমণ করা, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ সঞ্চারিত করা, দেশে সুশিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করা, অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের হাত থেকে গরীব প্রজাদের উদ্ধারসাধন ইত্যাদি ছিল তত্ত্ববোধিনীর ধর্ম বহির্ভূত কাজ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সেই যুগের বহু মনীষীর সমাবেশ ঘটেছিল। লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি। এঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন জাতীয়তামূলক রচনারাজি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে বাঙ্গালীর অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছিল। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, "সারা বাংলার লোক ঐ পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত।"

১৮৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর বাংলা ৭ই মাঘ দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। রামমোহন উদ্ভাবিত ব্রাহ্মধর্মকে দেবেন্দ্রনাথই পুনরুজ্জীবিত ও পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করেন।

যে ব্রাহ্মসমাজ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত রামমোহনের ভাবশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ তাংই স্রষ্টা।

তৎকালে খৃস্টান পাদরীরা ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নানা অপবাদ রটিয়ে এদেশীয়দের খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হতে প্রলুব্ধ করত। দেবেন্দ্রনাথ এদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। শুধু তাই নয় লোকে যাতে তাদের ছেলেমেয়েদের পাদরীদের বিদ্যালয়ে না পাঠায় সেজন্যও প্রচার চালালেন এবং বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাঁদা তুলে "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। এই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক হলেন মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়। সেই থেকে এদেশে খৃস্টান হবার স্রোত মন্দীভূত হল। মিশনারীদের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়ল।

রামমোহনের পর দেবেন্দ্রনাথই এদেশে বেদানুশীলনের পথিকৃৎ। উপনিষদ ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় শাস্ত্র। তাঁর জীবনে উপনিষদের প্রভাব অপরিসীম। তাঁর নিজের কথায়, "যখন উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রাপ্ত হইলাম এবং জানিলাম যে সেই উপনিষদ এই সমুদায় ভারতবর্ষের প্রামাণ্য শাস্ত্র, তখন এই উপনিষদের প্রচার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা আমার সঙ্কল্প হইল।...যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে,—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।"

দেবেন্দ্রনাথের আর এক বিশেষ কৃতিত্ব অমিত শক্তিশালী কেশবচন্দ্র সেনকে ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষিত করা। তৎকর্তৃক দীক্ষিত কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্মধর্মকে পূর্ণ পরিণতির পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র কেবল ব্রাহ্মধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন নি, সমগ্র দেশে মুক্তি ও স্বাধীনতার উজ্জ্বল দীপশিখা তুলে ধরেছিলেন।

স্বদেশের কল্যাণের জন্য দেবেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক আন্দোলনেরও সামিল হয়েছিলেন। ১৮৫১ সালে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। রামমোহনের অনুসরণে তিনিও ভারতবাসীর সুখসুবিধার কতকগুলি দাবী এসোসিয়েসনের পক্ষ থেকে ১৮৫২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রেরণ করেন। এই দাবী সর্বভারতীয় করার জন্য তিনি বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে এসোসিয়েসনের কয়েকটি শাখা গড়ে তুলেছিলেন। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ইহাই প্রথম রাজনৈতিক দাবী। স্বদেশের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের ছিল অপরিসীম অনুরাগ। গভীর স্বদেশপ্রীতি এবং স্বদেশের কল্যাণকামনাই ছিল তাঁর সর্বকর্মের মূল প্রেরণা। বাংলা তথা সমগ্র

ভারতে দেশপ্রীতির যে বন্যা বয়ে গিয়েছিল, তা উৎসারিত হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী থেকে। এবং দেবেন্দ্রনাথই ছিলেন তার নেপথ্য প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।"

ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং স্বাদেশিকতা প্রচারের জন্য মহর্ষি নবগোপাল মিত্রকে দিয়ে ইংরেজীতে "ন্যাশন্যাল পেপার" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। নবগোপালও ছিলেন মুক্তিপাগল মানুষ। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় পত্রিকাটি জাতীয়তার মন্ত্র প্রচারের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে তার :গঠমান যুগে দেবেন্দ্রনাথের দান বিশেষ স্মরণযোগ্য। তাঁর গদ্যের ভাষা অতি সহজ, সরল। তাঁর "আত্মজীবনী" ও "ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান" বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ইংরেজী ভাল জানা সত্ত্বেও তিনি বাঙালীকে কখনো ইংরেজীতে চিঠিপত্র লিখতেন না। তাঁর রচনার উৎকর্ষতা সম্বন্ধে তাঁর জীবনী-লেখক অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, "দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় একটা অভিনব স্টাইল দাঁড় করাইয়া গিয়াছিলেন। ঈশ্বরপ্রীতি এবং দেশপ্রীতি এই দুই প্রীতি ছিল তাঁর সমস্ত রচনার উৎস, তাহাই তাঁহার স্টাইলকে উৎপন্ন করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান যে সর্বোচ্চে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নেই।" দেবেন্দ্রনাথের এই সাহিত্যরীতির প্রভাব সমগ্র ঠাকুর পরিবারে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের উপর অপরিসীম।

মহর্ষির জীবনে ধর্মের সঙ্গে দেশপ্রীতি এক হয়ে গিয়েছিল। প্রার্থনার শেষে তিনি দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও মুক্তি কামনা করতেন। মহর্ষির নিজের ভাষায়, "হে পরমাত্মন! আমাদের এই বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল কর। তোমার এই সকল দুর্বল সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। এই হীন পরাধীন দেশের আর কেহই সহায় নাই। ইহা নানা ক্লেশ, নানা বিপত্তিতে দিন দিন আবৃত হইতেছে—দিনরাত্রি ইহার ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুমি এদেশকে উদ্ধার কর।"

বীরসিংহের সিংহপুরুষ

বিদ্রোহী বিদ্যাসাগর

এদেশের জাতীয় জীবনের নবজাগরণের ইতিহাসে রাজা রামমোহনের পরেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্থান। রামমোহন জাতি পুনর্গঠনের যে নতুন বনিয়াদ স্থাপন করেছিলেন বিদ্যাসাগর তাকে করে তুলেছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণ যুগ। বিদ্যাসাগর সেই যুগের মধ্যভাগে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে কর্মে ও চিন্তায় এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক নবজাগরণের বাস্তব ভিত্তি রচনা করেছিলেন। প্রায় হাজার বছরের পরাধীনতাজনিত পাপে যে বিরাট মহাভারতীয় জাতি অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কু-আচার ও ব্যাভিচারাদিতে নিমগ্ন ছিল, পুরুষ-সিংহ বিদ্রোহী বিদ্যাসাগরই সেই জাতিকে আত্মবিশ্বাসে, আত্মমর্যাদায় এবং চরিত্রের দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার সঞ্জীবনী মন্ত্রে সর্বপ্রথম দীক্ষিত করলেন।

রামমোহন যখন কলিকাতায় নানা সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে ব্যাপৃত, তখনই আবির্ভূত হলেন এই প্রাতঃস্মরণীয় ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ মেদিনীপুরের এক গণ্ডগ্রামে বীরসিংহে, ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত জেদী ও একগুঁয়ে প্রকৃতির। তাঁর জন্মের পর তাঁর পিতামহ তাঁকে এঁড়ে বাছুর আখ্যা দিয়েছিলেন। পিতামহের এই আখ্যা বর্ণে বর্ণে সত্যি হয়েছিল। এ ড়ে বাছুরের মতো গোঁ এবং পৌরুষ ছিল বলেই তিনি পর্বতপ্রমাণ বাধাকে উপেক্ষা করে জাতিগঠনের নানাবিধ কল্যাণকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেদিনের সেই অধঃপতিত বাঙালী জাতির নিকট পুরুষ-প্রবর পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের অমিত পৌরুষ ও অসামান্য বীর্যবত্তা এক মহিমময় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল ও তার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালি জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে।"

অসাধারণ মেধাবীসম্পন্ন বালক ঈশ্বরচন্দ্র। ১৮২৯ সালে ন' বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে যখন তাঁর বিস্ময়কর ছাত্রজীবন শুরু হয়, তখন একদিকে রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের নানা আন্দোলনে ব্রতী; আর অন্যদিকে হিন্দু কলেজের প্রতিভাধর তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামী ছাত্রদল ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং সমাজের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। চারিদিকের এই নবজাগরণের পরিবেশের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভাদীপ্ত গৌরবময় ছাত্রজীবন অতিবাহিত হচ্ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন ছিল দুঃসহ দুঃখ কষ্টের জীবন। কিন্তু প্রতিভার একটি প্রধান লক্ষণ দুঃখকে জয় করা, দুঃখের নিকট পরাভব স্বীকার করা নয়। অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র সমস্ত দুঃখকে হাসিমুখে জয় করে গড়ে তুললেন তাঁর ইস্পাত-দৃঢ় চরিত্র আর অর্জন করলেন অগাধ পাণ্ডিত্য। এই দুই শাণিত তরবারির সাহায্যে তিনি পরবর্তীকালে শত শত শতাব্দীর পরাধীনতার অবসম্ভাবী পরিণতি জাতির পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের ভিত্তিমূলে বজ্রকঠোর আঘাত হেনেছিলেন। একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার অচলায়তন। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সর্বোপরি মানবতার উজ্জ্বল আলোকে উদ্বোধিত করেছিলেন জাতির চিত্ত।

দ্বাদশ বছরের অভূতপূর্ব কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তিতে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র। শুরু হল তাঁর কালজয়ী কর্মজীবন। আবাল্য বিদ্যাসাগর নিজ পরিবারের এবং সারা দেশের অপরিসীম দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। আর উপলব্ধি করেছিলেন যে পরাধীনতাই জাতির অবনতির মূল কারণ। কিন্তু তাই বলে তিনি পথে বেরিয়ে স্বাধীনতার শ্লোগান দেন নি। জাতীয় জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন জাতিকে সংগঠন করতে। রামমোহনের মতো তিনিও ভেবেছিলেন যে জাতিকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রথমে তাকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, বিদূরিত করতে হবে সমাজ থেকে যত কুসংস্কার, কুআচার, ব্যভিচার।

শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের ছিল উদগ্র কামনা। জাতির সৌভাগ্যক্রমে সে সুযোগও তাঁর সত্বর জুটে গেল। ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে বৃত হয়ে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-সংস্কার ও শিক্ষা-বিস্তারের কাজে আত্মোৎসর্গ করলেন। সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্য কোনো জাতির অধ্যয়নের অধিকার ছিল না। বিদ্যাসাগর অচিরে এই বৈষম্য বিদূরিত করে সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে

দিলেন। শিক্ষালাভে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের এই সমান ও অবাধ অধিকার দেশের সর্বত্র স্বীকৃতি লাভের সুযোগ পেল।

এরপর দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপক শিক্ষাপ্রসারের অশ্রান্ত অভিযান সুরু করলেন শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর। ফলে বিভিন্ন জেলায়, মহকুমায়, গ্রামে, গঞ্জে অসংখ্য বিদ্যালয় গড়ে উঠল। কেবল পুরুষদের জন্য নয়, নারীসমাজের শিক্ষার জন্যও তিনি বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন যে মাতৃজাতি শিক্ষালাভ না করলে জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়। এদেশে নারীপ্রগতির বিদেশী সুহৃদ জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন নারী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হলে বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক।

মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশন্ (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর জীবনের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। এতদিন দেশী-বিদেশী ব্যক্তিদের ধারণা ছিল যে এদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা কলেজ পরিচালনা বা অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তারা বিদ্যাসাগরকে বলেছিল ইংরেজী কলেজ পরিচালনার যোগ্যতা কোনো ভারতবাসীর নেই। বেলি সাহেব বললেন, "ইংরাজ-সাহায্য ব্যতীত ইংরাজী কলেজ কিছুতেই চলিতে পারে না।" "এ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর-অনুজ শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, "অগ্রজ তাঁহাদের এই সাহঙ্কার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, তর্ক-বিতর্ক দ্বারা নানাপ্রকার বাধা অতিক্রমপূর্বক, নিজ কলেজে সমস্ত দেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত করতঃ ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম কলেজ-ক্লাস খুলিলেন।" একরোখা বিদ্যাসাগরের পরিশ্রম ও প্রতিভায় মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন্ অচিরে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হল। কলেজ পরপর কয়েকবার বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করল। এদেশীয় লোক কলেজ পরিচালনায় সক্ষম কিনা তার যোগ্য জবাব দিলেন বিদ্যাসাগর। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেজিষ্ট্রার সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব বলেছিলেন, "পণ্ডিত বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন" (Pandit has done wonder). জাতিগঠনে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের অবদান অসামান্য। বহু মনীষী ও দেশপ্রেমিক এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাঙালীর নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনিই ইংরাজী বিদ্যাকে প্রকৃত-প্রস্তাবে স্বদেশেরক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।" এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ জাতির অদ্বিতীয় শিক্ষাগুরু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "শিক্ষাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। কেমন করিয়া আমাদের দেশের

সর্বত্র জ্ঞান বিস্তার হয়, ইহাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা। সেই সাধনার উত্তরাধিকার আমরা লাভ করিয়াছি।...শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যেটুকু করিয়াছি, তাহা তাঁহারই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া।"

জাতিগঠনে শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের বিপ্লবাত্মক কাজেও হাত দিলেন বিদ্যাসাগর। এ-কাজ করতে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি পড়ল দেশের নির্যাতীত নারীসমাজের উপর। শক্তিস্বরূপিনী মাতৃজাতির মঙ্গল ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি যে সম্ভব নয় বিদ্যাসাগর ইহা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই মাতৃজাতির মুক্তি ও প্রগতির আন্দোলনে তিনি আত্মোৎসর্গ করেন। সংস্কারের প্রধান কাজ হল বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ-নিবর্তন।

বাল্যকাল থেকেই বিদ্যাসাগর তাঁর বাড়ীর আশেপাশে বালবিধবাদের অবর্ণনীয় দুরবস্থা লক্ষ্য করেছিলেন। অবশেষে প্রেরণা পেলেন তাঁর পরম দয়াময়ী জননী ভগবতী দেবীর কাছ থেকে—যিনি তাঁর সকল মহৎ কর্মের প্রেরণাদায়িনী। জীবনপণ করে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রথা পুনঃ প্রবর্তনে ব্রতী হয়েছিলেন। বিধবা-বিবাহ যে সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সম্মত ইহা প্রাণপাত পরিশ্রমে সপ্রমাণ করা সত্ত্বেও তাঁকে বিরাট বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমন কি তাঁর জীবন সংশয়ও ঘটেছিল। লোকাচার-প্রধান সমাজকে লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর দুঃখে ক্ষোভে লিখেছিলেন, "ধন্য রে দেশাচার! হা ধর্ম! তোমার মর্ম বুঝা ভার। কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান। হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে।"

পরিশেষে মাতৃভূমিকে লক্ষ্য করে বললেন,

"হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্বতন সন্তানগণের আচারগুণে, পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কতকালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়া স্থির করা যায় না।"

বিধবাবিবাহে সমর্থনলাভের জন্য দেশবাসীর সদ্‌বুদ্ধি, সদ্‌বিবেচনা ও বিবেকের নিকট করুণ আবেদন জানিয়ে বিগলিত হৃদয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন,

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত

হইয়া যাইতেছে।...অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তিসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদেব ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু কি আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক, তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরু কি বিষময় ফলভোগ করিতেছে। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।"

কেবল শাস্ত্রীয় বিচার বিতর্ক বা মানবিক আবেদনে কাজ হওয়া কঠিন বুঝে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত করালেন। এখানেই ক্ষান্ত হলেন না। আইন পাস হওয়ার পর নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বীয় তত্ত্বাবধানে ও অর্থব্যয়ে একাধিক বিধবাবিবাহ দিলেন। এতে তাঁর এত অর্থব্যয় হয়েছিল যে শেষে তাঁকে গুরুভার ঋণে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও বিধবাবিবাহ দিয়ে তিনি লোকসমাজে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি লিখেছিলেন, "বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।...আমি

দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব।"

এযুগে বিধবাবিবাহ একটা সাধারণ ঘটনা; কিন্তু প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে বিদ্যাসাগর যখন উহার প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হন, তখন উহার বিষয় চিন্তা করাও পাপকর্ম ছিল! সেই পৈশাচিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূলে যে বীর্যবত্তা, তেজ ও নির্ভীকতার সঙ্গে বিদ্যাসাগর বজ্রকঠোর আঘাত হেনেছিলেন—তা বিদ্রোহেরই নামান্তর। তাই বিদ্যাসাগর বিদ্রোহী। তৎকালে প্রকাশিত 'নব্যভারত' পত্রিকার ভাষায়, "আমাদিগের নির্জীব বঙ্গসমাজে এরূপ ব্যাপার বড় অধিক দেখা যায় নাই,—পবিত্রনামা রামমোহনের সময়ের পর, এরূপ তীব্র যুদ্ধ, এরূপ সামাজিক দ্বন্দ্ব, এরূপ সঙ্কল্প, এরূপ অনুষ্ঠান, এরূপ সিংহবীর্য বড় দেখা যায় নাই। পুরুষসিংহের সম্মুখে সমাজের মূর্খতা ও স্বার্থপরতা হটিয়া গেল, সামাজিক যোদ্ধা অসিহস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আইন জারি করাইলেন; বিদ্যাসাগরের গৌরবে দেশ পূর্ণ হইল, বিদ্যাসাগরের বিজয়লাভে প্রকৃত হিন্দুসমাজ উপকৃত হইলেন।"

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন।... আচারের যে হৃদয়হীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে মেরেছে, রক্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে দেবতা বলে মানেন নি, তাকে আঘাত করেছেন।"

জাতিগঠনে বিদ্যাসাগরের আর এক অনন্যসাধারণ অবদান বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন। যে বাংলা সাহিত্য বাংলার জাতীয় জাগরণের মূল প্রেরণা, সেই বাংলা ভাষার গদ্য সাহিত্যের সার্থক রূপকার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। ইচ্ছা করলে তিনি সংস্কৃত ভাষাতেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করে পণ্ডিতসমাজে যথেষ্ট খ্যাতিমান হতে পারতেন। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক বিদ্যাসাগর বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে অধঃপতিত এই বাঙালী জাতির উন্নতি করতে হলে প্রচলিত দেশভাষা বাংলার উন্নতি একান্ত অপরিহার্য। জাতিকে নবযুগের সঙ্গে তাল ফেলে চলতে হলে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যকে যুগের বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে হবে। তাই অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তন করলেন। তাঁরই গড়া বাংলা গদ্যের ভিতের উপর বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীরা সাহিত্যের সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। যার ফলে বাংলাভাষা আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী।...বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে

থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।" সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও ঋণ স্বীকার করেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ও গঠিত বাঙ্গালা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁহারই উপার্জিত সম্পত্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি।"

জাতির শিশুসাহিত্যেরও তিনি জনক। তাঁরই রচিত 'বর্ণপরিচয়' দিয়ে আজ শতাধিক বছর ধরে শিশুশিক্ষার উদ্বোধন হয়ে আসছে। আজও 'বর্ণপরিচয়' বলতে বিদ্যাসাগর এবং বিদ্যাসাগর বলতে 'বর্ণপরিচয়' বুঝায়। বিদ্যাসাগর সত্যই জাতির সার্থক শিক্ষাগুরু। এই বর্ণপরিচয়ের জন্য সমগ্র বাঙালী জাতিই পুরুষানুক্রমে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণী হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলাভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়।"

মাতৃভাষা বাংলার জননীস্বরূপা সুসমৃদ্ধ সর্বভারতীয় সংস্কৃতভাষা। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন মাতৃভাষার সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া, সংস্কৃতভাষা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্যও সংস্কৃতভাষা জানা দরকার। কিন্তু এই সংস্কৃত ভাষা জনসাধারণের নিকট ছিল একান্ত দুর্বোধ্য। ইহা তাহাদের নিকট বিভীষিকার বিষয় ছিল। বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' অভূতপূর্ব সহজ পন্থায় প্রণয়ন করে সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করে দিলেন। বিদ্যাসাগর-জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "দেবভাষা সংস্কৃতের প্রবেশদ্বার, ব্যাকরণরূপ সুদৃঢ় লৌহময় কবাট দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।...পূর্ব পূর্ব সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণেতারা সংস্কৃত চর্চার যে দুরূহত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার স্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সুকৌশলসম্পন্ন সহজ দ্বার উপক্রমণিকা রচনা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষাদান সরল ও সুগম করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই পরম বন্ধু হইয়াছেন। ...সংস্কৃত শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার যে প্রবল স্রোত এদেশে প্রবাহিত হইয়াছে তাহার মূলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ও পরবর্তী ব্যাকরণগুলি বহুল পরিমাণে কার্য করিয়াছে।"

বিদ্যাসাগর একদিকে যেমন ছিলেন কুসুমের মতো কোমল, অন্যদিকে ছিলেন তেমনি বজ্রের মতো কঠোর। তাঁর ছিল প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ। তেজস্বী, নির্ভীক বিদ্যাসাগর কোনোদিন কোনো অন্যায় সহ্য করেন নি। কেউ তাঁকে অপমান করলে, তা

সে যত বড় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হউক না কেন, তাকে প্রত্যাঘাত করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কার সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলে কার সাহেব টেবিলের উপর দু'পা তুলে দিয়ে পাইপ খেতে খেতে তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে যে অপমান করেছিলেন, তিনি তা ভুলতে পারেন নি। অচিরেই কার সাহেব একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনিও চটিসুদ্ধ পা টেবিলের উপর তুলে দিয়ে হুকায় তামাক খেতে খেতে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। কর্তৃপক্ষ কৈফিয়ৎ চাইলে, তিনি বলেছিলেন "তাঁরই কাছ থেকে শেখা রীতি অনুযায়ী তাঁকে অভ্যর্থনা করেছি। এতে যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে, তার জন্য আমি দায়ী নই, দায়ী আমার শিক্ষাদাতা কার সাহেব।" এই ঘটনার দ্বারা সমগ্র জাতিকে তিনি আত্মমর্যাদা রক্ষার যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা বাস্তবিকই অতুলনীয়।

বিদ্যাসাগরের জীবন ছিল অত্যন্ত সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। ধুতি, চাদর ও চটি ছিল তাঁর অঙ্গের ভূষণ। এই জাতীয় পোশাকে ভূষিত হয়ে তিনি গরীবের পর্ণকুটির থেকে লাট দরবার পর্যন্ত সর্বত্র অবাধে বিচরণ করতেন। জাতীয় পোশাকে তিনি দিগ্বিজয় করেছিলেন। একবার বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন ধুতি, চাদর ছেড়ে কোট, প্যাণ্ট পরতে। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন যে ধুতি চাদর তাঁর স্বদেশী পোশাক। এতে যদি সাহেবের আপত্তি হয়, তবে তিনি আর কখনো তাঁর কাছে যাবেন না। তখন লাট সাহেব তাঁকে তাঁর জাতীয় পোশাকে যেতেই অনুরোধ জানান। এইভাবে বিদ্যাসাগর জাতীয় পোশাকের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। পরবর্তীকালে বহু মনীষী তাঁরই অনুকরণে জাতীয় পোশাকের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, "বিদ্যাসাগর,—এই কথাটির উচ্চারণেও পুণ্য। ...তিনিই দেশীয় পোশাকের গৌরব শিক্ষিতসমাজে প্রথম বাড়াইয়াছিলেন। তিনি যদি ধুতি, চাদর ও চটিজুতা পরিহিত হইয়া সর্বসমক্ষে যাতায়াত না করিতেন, তাহাহইলে অন্ততঃ আমি, আজ দেশী পোশাকের প্রতি অনুরক্ত হইতাম কিনা সন্দেহ।" প্রখ্যাত সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "এই যে প্রাচীন আচার-আচরণ পালন, তাহা ঠিক গতানুগতিক বলা যাইতে পারে না। ইহা ব্রাহ্মণ্য-বীর্যবত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা নিজের দৈন্যকুণ্ঠিত, চিরাগত একটা অভ্যাস নহে,—ইহা পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবের নিকট নতি স্বীকারে অসম্মত, অপরাজিত জাতীয়তার আদর্শ ঘোষণা। বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম সগৌরবে স্বজাতীয় আদর্শ শিক্ষিতসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।" কেবল শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কারমূলক কার্যকলাপ নয়, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তি-চরিত্র ও ব্যক্তিগত জীবন জাতির চিত্তে যথার্থ জাতীয়তাবোধের অফুরন্ত প্রেরণা জুগিয়েছে।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, "এইদেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দম প্রকৃতি যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে, সেই উন্নত মস্তক যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল; তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই।"

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না।... কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়িয়া যায়—মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।"

"দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয়জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"

বিদ্রোহী মহাকবি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার নবজাগরণের উষালগ্নেই বাংলা সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর জন্ম ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম বিদ্রোহী কবি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় ছিল শুধু কোমলতা, নমনীয়তা। তাই বাঙালী এতদিন সাহিত্যে কেবল সুমধুর বংশীধ্বনি এবং বীণা-নিক্বনই শুনে এসেছিল। মধুসূদনই প্রথম বাঙালীকে শুনালেন ভেরী-নিনাদ। তাঁর কাব্য পাঠককে অলস আবেশে সুখ-নিদ্রায় অভিভূত করে না, এর বীররস, এর ওজস্বিতা তার অন্তরে জাগায় প্রেরণা, সাহস, উদ্দীপনা। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনেই মাইকেলের বিদ্রোহ ঘোষিত হল। বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ চলতে পারে এ ধারণা কারুর ছিল না। তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পর্যন্ত যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করতেন। যতীন্দ্রমোহনের মতে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ফরাসীতেও যখন অমিত্রাক্ষর-রচনা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তখন বাংলায় উহা রচনা করা অসম্ভব। আরও অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি বললেন—অসম্ভব। কিন্তু পুরুষসিংহ মধুসূদন দমবার পাত্র নন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ফরাসী ভাষার ব্যর্থতা সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা বাংলা ভাষাতে অমিত্রাক্ষর রচনা অবশ্যই সম্ভব। তাঁর সুগভীর আত্ম-প্রত্যয়ের বলে অচিরেই অমিত্রছন্দে রচিত হল 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য'। এই বলিষ্ঠ নতুন ছন্দের তেজে বাঙালী বিস্ময়-বিমূঢ় হল। বিপ্লবী শ্রীমধুসূদন অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ জাতির হৃদয় স্পর্শ করল। এই ছন্দের সফল প্রবর্তনের মাধ্যমেই তাঁর স্বাদেশিকতা অভিব্যক্ত হল। তাঁর এই অভূতপূর্ব সাহিত্য-কৃতি বাংলার নবজাগরণকে দুর্বার গতিবেগসম্পন্ন করে তুলল। চিরপ্রচলিত ত্রিপদী ও ও পয়ারের শৃঙ্খল ভেঙে দিয়ে মধুসূদন সেদিন নবজাগ্রত বাংলার সামনে সহস্র বছরের

পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙবারই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাই অমিত্রাক্ষর ছন্দ জাতির জীবনে যৌবন মুক্তিরই সঙ্কেত। ছন্দের বৈচিত্র্য ও যথেচ্ছ-গতি বাঙালীর সামনে অনন্ত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্ঘরমন্দ্রিত রথে চড়িয়া সেই প্রথম অবিভূর্ত হইল আধুনিক কাব্যে 'রাজবদুন্নত ধ্বনি।' বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—মাইকেল একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যই বাংলা সাহিত্যে বিপ্লব এনেছে। আর তার পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও। এই কাব্যের ভাষা, ছন্দ, ভাব ও ঘটনাপ্রবাহ পরাধীন ভারতে প্রত্যেক পাঠকের চিত্তকে গভীরভাবে উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। আজও ইহা জাতির প্রেরণার উৎস, এবং চিরকালই এই কাব্য মানবচিত্তকে উদ্দীপিত করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমসাময়িককালে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি এবং পরবর্তীকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের যাদুমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অগ্নিমন্ত্রের উপাসক অরবিন্দ ঘোষ এবং বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের মতো যুগনায়কগণও 'মেঘনাদ বধে'র মেঘগর্জনে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বহু স্থানেই কবির স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বর্তমান। রাম-রাবণের যুদ্ধে মধুসূদন দেখিয়েছেন যে একজন পরদেশী সসৈন্যে এসে অপরের দেশ আক্রমণ করেছে। সেই আক্রান্ত দেশ—লঙ্কার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আক্রান্ত রাজা রাবণ মাতৃভূমি লঙ্কা ও আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি অসংখ্য আত্মীয়স্বজনকে হারিয়েও অমিততেজে জীবনপণ সংগ্রাম করছেন। মধুসূদন দেখিয়েছেন যে রাবণ স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনাকালে কবির নিজের দেশ ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই পরাধীনতার তীব্র জ্বালা তিনি অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। তাই তিনি রাবণ ও রাক্ষসদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছিলেন। অপর দেশের স্বাধীনতা অপহরণকারী রাম ও লক্ষ্মণকে তিনি অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি রাম ও তাঁর নীচ সঙ্গীদের ঘৃণা করি (I despise Ram and his rable)।" তাই তিনি তাঁদের চরিত্রকে ভীরু, কাপুরুষ করে চিত্রিত করেছেন। স্বদেশ রক্ষার জন্য রাবণ ও মেঘনাদ যে আত্মত্যাগ করেছিলেন এবং অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েছিলেন পরাধীন দেশের অধিবাসী কবি মধুসূদন তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। দূতমুখে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে:

"মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ,—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার

প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা ! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে !”

পুত্র শোকাতুরা জননী চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দিয়ে রাবণ বলছেন,

“এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে ;...”

মেঘনাদবধ কাব্যের সর্বত্র পরাধীনতার তথা দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাব পোষণ করা হয়েছে। মধুসূদন রাবণ চরিত্রে এক অদম্য পৌরুষ চিত্র প্রতিফলিত করেছেন। পরাজিত হয়েও রাবণ দুর্বলতা স্বীকার করেন নি। মাইকেল পরাধীন স্বদেশবাসীর অন্তরে এই পৌরুষ জাগাতে চেয়েছিলেন। জাতিকে করতে চেয়েছিলেন আত্মবিশ্বাসে বলিষ্ঠ। মাইকেলের রাবণ ও মেঘনাদ যথাক্রমে শক্তি ও নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের প্রতীক।

এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে বীর রসের কোনো নজির ছিল না। মধুসূদনের বীর ও করুণ সুরের অভূতপূর্ব সমন্বয়ে গাথা মেঘনাদবধ কাব্য ও অন্যান্য নানা খণ্ড কবিতায় বাংলা কাব্যাকাশ হল স্পন্দিত, শিহরিত। তাঁর কাব্য শুধু বাংলা সাহিত্যের যুগান্তরের শৃঙ্খলই ছিন্ন করে নি, বাঙালী মনে এনে দিল জাতীয় জাগরণের অপূর্ব উন্মাদনা। মধুসূদন তাঁর স্বদেশবাসীকে এমন কাব্য শোনাতে চেয়েছিলেন যাতে শতাব্দীর জড়তা থেকে তারা মুক্তি পায়—জাতীয় মানবতার মরা গাঙে আবার মনুষ্যত্বের বান ডাকে। তাই তাঁর সাহিত্য অপূর্ব প্রাণরসে অভিষিক্ত। মনীষী ঋষি রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, “স্বদেশে একটি মহাকবির উদয় জাতি সাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্তব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি।”

মেঘনাদবধের মূল ঘটনা ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত হয়েছে। ধার্মিকতা, নির্ভীকতা, দেশাত্মবোধ, সাজাত্যাভিমান প্রভৃতির প্রকাশে এই সর্গে মেঘনাদের চরিত্র অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে।

মাইকেলের রচনায় পাশ্চাত্যের প্রভাব আছে। কিন্তু তাঁর মহাকাব্যের মূল সুর প্রাচ্যের। তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের উপাদান ভারতের আদি কবি ঋষি বাল্মীকির অমর

গ্রন্থ রামায়ণ থেকেই গৃহীত। একদিকে ভারতের বাল্মীকি, কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, কীর্ত্তিবাস প্রভৃতির তিনি মন্ত্রশিষ্য। অন্যদিকে ইউরোপের হোমার, ভার্জ্জিল, দান্তে, মিল্টন, বায়রন প্রভৃতির কাব্যে অনুপ্রাণিত। তিনি বিশ্বের নানা কাব্যোদ্যান থেকে মনোরম উপকরণ সংগ্রহ করে আপন মাতৃভাষা বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে তিনি মানবতাকে—বিশ্বসত্যকে প্রকটিত করতে চেয়েছেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "তাঁহার কবিতার সমস্তই প্রায় দেশীয় উপাদানে রচিত, তাহাতে বিদেশীয় মসলা নাই। তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য জগতের ভালমন্দ সমস্তই দেখিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃপিতামহের প্রাচ্যের প্রতিমার স্থানে কদাচ পাশ্চাত্ত্য প্রতিমা বসান নাই, জাতীয়তার বিসর্জন দেন নাই। পশ্চিম গগনের সুচারু সান্ধ্য রাগের আভায় তিনি তদীয় কবিতারানীর ললাট মার্জনা করিয়া দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন প্রাচীর অরুণরাগে।"

স্বদেশ জননীর প্রতি ছিল মধুসূদনের অকৃত্রিম দরদ। মাতৃভূমির পরাধীনতার গ্লানি তাঁর মনকে পীড়া দিত। তাই তিনি প্রাচীন ভারতের গৌরবগাথা স্মরণ করে আনন্দ পেতেন। তাঁর একটি ইংরেজী কবিতার কয়েক পঙক্তিতে তা সুপরিস্ফুট :

> But where art thou, fair Freedom ! Thou—
> Once goddess of Ind's sunny clime ?
> When glory's halo' round her brow
> Shone radiant, and she rose sublime.

[হে সুন্দরী স্বাধীনতা, তুমি আজ কোথায় ? একদিন তুমি রৌদ্রস্নাত ভারতভূমির অধীশ্বরী দেবী ছিলে ; তখন তার ললাটে গৌরবমালা শোভা পেত ; সে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াত।]

প্রথম জীবনে বাংলাভাষার প্রতি মধুসূদনের যথেষ্ট অবজ্ঞার ভাব ছিল। বিদেশী ইংরেজী ভাষায় তিনি সাহিত্য রচনার প্রয়াস পান। কিন্তু পরে মাতৃভাষাকেই তাঁর সাহিত্য-কৃতির মাধ্যম করে তুলেন। মাতৃভাষার প্রতি অনাদর প্রদর্শনের জন্য তিনি যে পরবর্তী জীবনে বিশেষ অনুতপ্ত হয়েছিলেন তা তাঁর 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে :

> "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
> তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
> পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
> পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে মধুসূদনের অকৃত্রিম স্বদেশপ্রীতির বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। তিনি মাতৃভূমিকে কতখানি ভালবাসতেন তা এই সব কবিতার মধ্যে বিধৃত। বাংলার ধূলি-মাটি, জল-বায়ু, ফল, ফুল, নদনদী, সাহিত্য, সংস্কৃতি সব কিছুর রসে তাঁর চিত্ত পরিপূর্ণ হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের বাল্মীকি, কালিদাস থেকে নব্যবঙ্গের ঈশ্বরগুপ্ত, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির বন্দনা গান করেছেন। বঙ্গজননীকে ভারত গগনে সমুজ্জ্বল দেখতে চেয়েছেন কবি শ্রীমধুসূদন ; বলেছেন,

"জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারত রতনে।"

পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতভূমির উদ্দেশ্যে কবি লিখেছিলেন,

"শুনগো ভারতভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুমঘোর,
হইল হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।"

মাতৃভূমির গুণবর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি নিজের আত্মপরিচয় প্রকাশ করেছেন :

"যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে ... ...
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে !"

বিলেত যাত্রাকালে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি মাতৃভূমির স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বল থাকবার কাতর প্রার্থনা প্রকাশ করেছেন :

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।"

মোট কথা মধুসূদনের অভিনব কাব্যধারা বাঙালী জাতিকে আশায়-উদ্দীপনায় সেদিন অভিভূত করেছিল। জাতীয়তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্ত্রগুরু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের

কথা বিবাদের স্থল—নিশ্চয়স্থল হলেও শ্রীহর্ষ বাঙালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।

স্মরণীয় বাঙালীর অভাব নাই। কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্ন-প্রসবিনী। এইসব নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল।

সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।”
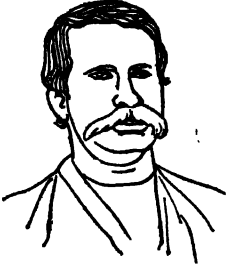
জাতীয়তার প্রবক্তা

মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণে মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব [১৮২৫] হয়েছিল বাংলাদেশে। নবযুগের বাংলায় যাঁরা দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ভাব জাগিয়ে তুলেছিলেন, ভূদেব তাঁদের অন্যতম।

আবাল্য ভূদেব জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ। তাঁর যখন ছাত্রজীবন, তখন দেশের তরুণ সম্প্রদায় পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণে উন্মত্ত। বিদেশী ধর্মগ্রহণ, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান, চালচলন, কথাবার্তা সব কিছুই যেন তখন তরুণদের যুগধর্ম হয়ে উঠেছিল। তাঁর সহপাঠীদের অনেকেই যখন পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারায় আত্মহারা, ভূদেব কিন্তু তখন স্বজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম ও আচার-পদ্ধতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। তাঁর সহপাঠী বন্ধুরা যখন পুরোদস্তুর সাহেব, তখন তাঁর দৈনন্দিন পোশাক ছিল মোটা লাল পেড়ে ধুতি, সাদা চাদর ও চটি জুতা। ভূদেবের ছিল সুগভীর স্বাজাত্যবোধ ও আত্মপ্রত্যয়। দেশীয় ভাবধারায় জীবন গঠন করতে তিনি অত্যন্ত গৌরববোধ করতেন।

ভূদেববাবু ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী। প্রথমে কিছুদিন তিনি শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন। পরে সরকারী শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে আসীন হন। তখন তিনি এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য নানা প্রচেষ্টা করেন। শিক্ষাপদ্ধতির তিনি আমূল পরিবর্তন করেছিলেন। শিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশবাসীর মনে জাতীয় ভাবধারা প্রচার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলতেন, "পরাধীন জাতির শিক্ষকের প্রধান কার্য আত্ম-গৌরবের রক্ষাসাধন।" স্বধর্ম-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "স্বধর্মের ব্যবস্থায়—ক্ষাত্রধর্মের এবং আপদ্ধর্মের 'অপালনেই' হিন্দুর পরাধীনতা হইয়াছিল ; স্বধর্মের কতকটা পালনগুণেই হিন্দু এখনও আছে এবং মাঝে মাঝে মাথা তোলে—অপর বিজিত জাতির ন্যায় মিটিয়া যায় নাই। এক্ষণে রক্ষা ধর্মপথেই হইতে পারে।" "তিনি ভারতের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান সকলকে প্রকৃতপক্ষে স্বধর্মনিষ্ঠ হইতে এবং ইহ ও পারলৌকিক সকল কর্ম-পূজাভাবে করিতে বলিয়াছেন।...জন্মভূমির সেবাক্ষেত্রে সকলকে

তুল্যমূল্যভাবে এক জোট হইতে তিনি বলিয়াছেন। সকল শ্রেণীর লোকে রজ্জু ধরিয়া এক মনে টান দিলেই রথ চলে—নচেৎ চলো না—ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।"

এদেশের শিক্ষা সংস্কারে ভূদেবের দান অপরিসীম। 'শিক্ষাদর্শন' ও 'সংবাদসার' তৎকর্তৃক পরিচালিত প্রথম শিক্ষা বিষয়ক সাময়িক পত্র। পরে তিনি দেশবিখ্যাত 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব বহন করেন। এটি প্রকাশিত হত সরকারের শিক্ষাবিভাগ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল যেমন 'বঙ্গদর্শন', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ভূদেবেরও ছিল সেইরূপ 'এডুকেশন গেজেট'।

"ভূদেব স্বধর্মপালন, স্বদেশপ্রীতি, সহৃদয়তা, সদাচার, সৎকর্মে সম্মিলন, স্বাবলম্বন এবং সাত্ত্বিক উদ্যমের প্রচারক।" ছোটবেলা থেকেই তিনি বলতেন, "বড় হইয়া যদি মাতৃভূমির গৌরব, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করিতে পারি এবং দেশের কোনো কার্যে লাগিতে পারি, তাহা হইলেই আমার জন্ম ও জীবন সার্থক ভাবিব।"

বাংলার জাতীয় সাহিত্যে ভূদেবের দান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। নানা প্রবন্ধ ও উপন্যাস গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি দেশবাসীর মনে জাতীয় ভাব সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। এদেশীয় আচার-আচরণ, হাবভাব, জাতীয়তাবোধ ও নানা বিধিব্যবস্থার কথা আত্ম-বিস্মৃত দেশবাসীর অন্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি লিখেছিলেন, (১) পারিবারিক প্রবন্ধ, (২) সামাজিক প্রবন্ধ, (৩) আচার প্রবন্ধ ও (৪) বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থসমূহ। এই সব প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'সামাজিক প্রবন্ধ' শ্রেষ্ঠ। এতে জাতীয় ভাব অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। তাই গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন। তৎকালে মনীষিগণ কর্তৃক ইহা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। গ্রন্থখানি সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন, "ইহা ভারতবর্ষের আধুনিক সকল লেখকের অবশ্য পাঠ্য। ইহাতে ভারতের সকল জটিল সমস্যার বিচার আছে। ইহা আস্তিক্য, দেশভক্তি এবং সম্মিলনের ও উদ্যমের মহামন্ত্রস্বরূপ।"

উপন্যাস সাহিত্যেও ভূদেব-প্রতিভার মৌলিকতার প্রমাণ মিলে। সত্যিকথা বলতে কি বাংলাভাষায় টেকচাঁদ নয়, ভূদেবই প্রথম যথার্থনামা ঔপন্যাসিক। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ভূদেবেরই উত্তরসূরী। তাঁর 'সফল স্বপ্ন', 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও 'পুষ্পাঞ্জলি' বাংলা ভাষায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই সব উপন্যাস সৃষ্টির মূলে ছিল তাঁর জাতীয় ভাব প্রচার।

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' ভূদেব মহারাষ্ট্র শক্তির নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় ঐক্য ও অভ্যুদয়ের বর্ণনা করেছেন। তাঁর সব কয়খানি উপন্যাসে এই একই উদ্দেশ্য অর্থাৎ ভারতীয় ঐক্যবুদ্ধি এবং জনগণের সংহতিবোধের জাগরণ।

'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে ভারতের যাবতীয়-তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে ভারতবোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ভারতের হিন্দু-সাধনার ইতিহাসও বিবৃত হয়েছে। পুষ্পাঞ্জলি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "হিন্দুবিশ্বাসের যে সকল উপাখ্যান আজ পর্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত মূর্খতার পরিচায়ক ও কেবল হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপযুক্ত ভাবিতেন, তাহা 'পুষ্পাঞ্জলি'র গ্রন্থকারের সভক্তিক আলোচনায় যে ফল দিয়াছে তাহা ভাবের উচ্চতা ও গৌরবে ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে হীন নহে।" এই গ্রন্থে ব্যাস-মার্কণ্ডেয় সংবাদচ্ছলে ভূদেব মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে দেবীরূপে কল্পনা ও বন্দনা করেছেন। "ব্যাসদেব প্রশ্ন করিলেন 'ইনি কোন্‌দেবী ?' মহামুনি মার্কণ্ডেয় এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর না দিয়া ব্যাসদেবকে সঙ্গে করিয়া 'তীর্থদর্শন' করাইতে কুরুক্ষেত্র হইতে দ্বারাবতী হইয়া কুমারিকা দিয়া কামাখ্যায় লইয়া গিয়া এই গ্রন্থের শেষে বলিলেন, 'এক্ষণে তোমার ধ্যানপ্রাপ্ত দেবীমূর্তির দর্শনপ্রাপ্ত হইলে'। অর্থাৎ ভারতবর্ষই অধিভারতী দেবীর ভৌতিক মূর্তি। তীর্থদর্শণে তাঁহার পরিক্রমণ করা হয়।" ভারতভূমিকে দেবীরূপে কল্পনা বাংলা সাহিত্যে এই বোধ হয় প্রথম। 'আনন্দমঠ' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র 'পুষ্পাঞ্জলি' কর্তৃক নিঃসন্দেহে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। আর আনন্দমঠ রচিত হয়েছিল ১৮৮৩ সালে। গ্রন্থ দু'খানি পাশাপাশি রেখে অধ্যয়ন করলে এ সত্যতা উপলব্ধি করা সহজ হবে। 'পুষ্পাঞ্জলি' পুস্তকখানি পাঠ করে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন যে, এরূপ মর্মস্পর্শী স্বদেশ ও স্বধর্ম-ভক্তির এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সামঞ্জস্যকারী অটল স্থৈর্য্যপ্রদায়ক জ্ঞানের কথা তিনি কোন ভাষাতেই পাঠ করেন নি।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র মধ্যেও দেশপ্রেমের নিদর্শন বিদ্যমান। নীচের দু'টি উদ্ধৃতি দেশপ্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে।

(১) "জানিস্ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্বদ্রব্য প্রসবা জন্মভূমি—এই তিনই সমান ; যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে।" এই উক্তি ধ্বনিত হয়েছে শিবাজীর আরাধ্যা ভবানীদেবীর কণ্ঠে।

(২) "এই দেশে সুবোধ লোকের কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। কিন্তু এভাবে চলিলে অল্পকাল মধ্যেই সুবর্ণমণিমাণিক্যাদি প্রসবা ভারতভূমি আর উৎকৃষ্ট নবরত্ন প্রসবে সমর্থা হইবেন না।" যখন 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' প্রকাশিত হয়, তখন দেশের কথা অপর কেউ ভাবতে আরম্ভই করে নি।

সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, প্রদেশে প্রদেশে, হিন্দু মুসলমানে যাতে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় সেদিকে ভূদেবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অখণ্ড ভারতের কল্পনাই ছিল তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান।

আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হলেও সর্বজাতির প্রতি তিনি ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। মুসলমানদের প্রতিও তাঁর প্রীতিভাব ছিল। তিনি বলতেন, "হিন্দু ও মুসলমান দুই ভাই; উভয়ে এখন একদেশবাসী। সুতরাং একই মাতৃস্তন্যে উভয়ে পুষ্ট, ফলতঃ এরা দুধ-ভাই।"

'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' ভূদেববাবু হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতিসাধনের ঐক্যসূত্রের সন্ধান করেছেন: "ভারতবর্ষ যদিও হিন্দু জাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইঁহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালিত করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইঁহার পালিত সন্তান।"

এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত। দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না?…আমরা কি চিরকালই জ্ঞাতিবিরোধে আপনাদিগকে সর্বস্বান্ত এবং অপরের উদর পূরণ করিব?…এক্ষণে সকলকে সম্মিলিত হইয়া মাতৃদেবীর সেবার ভার গ্রহণ হইতে হইবে।"

উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা যে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রত, এতে ভূদেব অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। তাঁর মতে 'স্বধর্মী বিদ্বেষ' ও 'স্বদেশী বিদ্বেষ' এদেশের উপর অভিশাপস্বরূপ। তিনি বলেছেন, "হিন্দু তাহার নিম্নশ্রেণীকে অন্ত্যজবর্ণ নাম দিয়া পশুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করিয়াছে। একজন ডোম বা মেথর উঠান দিয়া গেলে তথায় গোবরজল ছড়া দেওয়া হয়। একটি ছাগল আসিয়া তথায় মলত্যাগ করিলে শুধু ঝাড়ু দিলেই চলে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবাসীদিগের মধ্যে বাঙ্গালী, উড়িয়া, বিহারী, মহারাষ্ট্রীয়, পাঞ্জাবী, নেপালী, কাশ্মীরী, হিন্দু মুসলমান প্রতি পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ।"

সামাজিক প্রবন্ধের 'নেতৃপ্রতীক্ষা' অধ্যায়টি ভূদেবের জাতীয় ভাবনার এক অনবদ্য সৃষ্টি। দেশের দুর্দশা দূরীকরণে ও জাতীয় জীবনের সর্বাত্মক উন্নতি সাধনে ভূদেব সর্বভারতীয় নেতার আবির্ভাব অনুভব করতেন; তাঁর কথায়, "ভারতভূমি সত্য সত্যই রত্নপ্রসবা। এখানে প্রকৃত বড়লোকের অঙ্কুর নিয়তই উদ্গত হয়।…ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে এখন এমন একটি আশার সঞ্চার হওয়া উচিত যে, আমাদের অধঃপতনের নিবারণ, অবস্থার উৎকর্ষসাধন, মনের সংশয়চ্ছেদন, এবং হৃদয়ের ক্ষোভশান্তন করিবার জন্য স্বজাতিমধ্যে একজন নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাব অবশ্যই হইবে। সেই আশাও বিশ্বাসে পরিণত হওয়া আবশ্যক। ঐ বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইলে ভারতবাসীর কার্যকলাপ, ব্যবহারপ্রণালী, এবং মনের ভাব তদুপযোগী বিশিষ্টতা লাভ করিবে।

নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু কোথায় হইবে, কখন হইবে, তাহার কোন অনুমান করা যাইতে পারে না। অতএব সেই ঘটনা তাঁহার

নিজের ঘরেই হইতে পারে, প্রতি ব্যক্তিকে এরূপ মনে করিতে হয় এবং তাহা মনে করিয়া আপনার গৃহকে সর্বতোভাবে সেই আবির্ভাবোন্মুখ দেবতার পবিত্র মন্দিরের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে হয়। দ্বেষ, হিংসা, লোভ, মাৎসর্য প্রভৃতি কুৎসিত এবং নীচ প্রবৃত্তি হইতে নিজ নিজ মনকে শূন্য করিয়া রাখিতে হয়। আপনাপন সন্তানাদি সম্বন্ধে সকলকে ইহাও মনে করিতে হয় যে, আমাদের এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটিই সেই মহাপুরুষ হইতে পারেন। ইহা হইতেই আমাদের জন্মভূমি যশের মালা ধারণ করিতে পারেন, ইহা হইতেই পৃথিবীতে ধর্মধনের সম্বর্ধন হইয়া মানুষ বিমুক্ত-পাপাচার এবং অভূতপূর্ব পুণ্যধনে ধনী হইয়া উঠিতে পারে।·· মনোমধ্যে নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রত্যাশা এইরূপ স্থিরতর এবং ব্যাপকভাবে সঞ্চিত রাখিয়া আপনারা পবিত্র হইয়া থাকিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টাবান হইলে এবং শিশু ও যুবাদিগের সুশিক্ষার প্রতি নির্দিষ্টরূপে নিরন্তর যত্ন করিলে সকল লোকেরই মন উন্নত হইয়া উঠিবে। অনেকানেক সুবোধ লোকের হৃদয় তাদৃশ উন্নত, পবিত্র এবং একাগ্র হওয়াতে নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাবের অন্যতর হেতু উপস্থিত হইবে। একোদ্যমে কতকগুলি লোকের চিত্তোন্নতি না হইলে কোন দেশে মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ অধিত্যকা হইতেই উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ উত্থিত হয় সেইরূপ হৃদয়বান্ ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতেই উচ্চতম মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে যাহাতে আশা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সহানুভূতির বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করাই বর্তমানের কর্তব্য। শিক্ষাকার্য্য ও বুদ্ধিমত্তা, বহুজ্ঞতা, স্বাবলম্বন, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা, উদারতা এবং ওজস্বিতা বর্ধনচেষ্টার সহিত স্বজাতিবাৎসল্যের প্রতি একাগ্র হইয়া পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।"

ভূদেবের জাতীয় ভাবোদ্দীপক কয়েকটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

(১) "জননী যদি পীড়িতা না হয়েন তবে তাঁহার স্তন্যই শিশুর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবনোপায়। বাঙালীর পক্ষে বঙ্গভূমিও সেইরূপ।"

(২) "যেমন গ্রীকেরা কখন আপনাদের জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করে নাই—রোমীয়েরাও করে নাই এবং ইংরেজেরাও করিতে ইচ্ছুক নহেন, আমাদিগেরও সেইরূপ থাকা উচিত।"

(৩) "জাতীয়ভাবটি হৃদয়োন্নতি-সোপানের একটি প্রশস্ত ধাপ।"

(৪) "যাঁহারা বিশিষ্টরূপে স্বদেশানুরাগী এবং স্বজাতিবৎসল, তাঁহারাই নরকুলে দেবতা।"

ভারতীয় জাতীয়তার পিতামহ

ঋষি রাজনারায়ণ বসু

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দিকে বাঙালী তরুণসমাজ যখন পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণে উন্মত্ত—পাশ্চাত্ত্য ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ, পাশ্চাত্ত্য বেশভূষা পরিধান এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে বিদেশী বিজাতি ভাষা ব্যবহারে অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করছে, স্বদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করছে, তখন জাতির আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনার জন্য যে-সব মনীষী আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ঋষি রাজনারায়ণ বসু অন্যতম।

১৮২৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগণা জেলার বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণের জন্ম হয়। তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহন রায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মহৎ স্বভাবের মানুষ। স্বদেশের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। পিতা নন্দকিশোরই ছিলেন রাজনারায়ণের স্বদেশপ্রীতির প্রধান উৎস। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তাঁর এই স্বদেশপ্রীতি সমধিক বর্ধিত হয়।

রাজনারায়ণ ইংরেজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু বক্তৃতাদি তিনি বাংলাভাষাতেই দিতেন। তিনিই প্রথম বাংলায় বক্তৃতা দিতে সুরু করেন। দেশবাসীকে দেশভাষার প্রতি অনুরাগী করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মাতৃভূমির প্রতিও ছিল তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তিনি বলেছেন, "জন্মভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্বচনীয় স্নেহ পাত্রসকল মনেতে উদিত হয়—প্রেমামৃত রসসাগরে চিত্ত প্লাবিত হয়। যে স্থানে আমরা শৈশবকালে স্নেহ মিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্যক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভাবধি সহযোগী মিত্রদিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, যে স্থানে আমাদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত সুহৃদমণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পদ, যাহা কিছু সকলই আমাদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে? স্বদেশ এপ্রকার প্রিয় পদার্থ

যে তাহার নদী, পর্বত, মৃত্তিকা পর্যন্ত আমাদিগের প্রণয় অকর্ষণ ও আহ্লাদ সঞ্চার করে। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই—যে নাম চিন্তামাত্রে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্যা, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ, বান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন সকল মনেতে জাগ্রত হইয়া উঠে। যিনি প্রবাসী হইয়া দূর হইতে আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই স্বদেশের মর্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই জানেন যে জন্মভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে। তিনি বালুময় মরুভূমি-বাসী হইলেও সেই স্বদেশ সন্দর্শন পিপাসায় ব্যাকুল থাকেন। এমত সুখের আকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না থাকে সে কি মনুষ্য? জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া তাহার প্রতি অনাদর করা—জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা, ইহার উপর হৃদয়বিদীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে?" এই প্রবন্ধাংশের প্রতি ছত্রে রাজনারায়ণের স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন বিদ্যমান। ইহা তৎকালীন বাঙালীসমাজকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেদিন রাজনারায়ণই ছিলেন দেশপ্রীতির প্রধান প্রেরণা। তাঁর রচনা ও চিন্তাদর্শ আজও দেশপ্রীতি প্রচারে মূল্য হারায় নি।

১৮৫১ সালে রাজনারায়ণ মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এখানে তিনি আদর্শ ও একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী হিসাবে সকলের শ্রদ্ধা ও সুনাম অর্জন করেন। তিনি কেবল অধ্যাপনাই করতেন না। দেশোন্নয়ন ও জনহিতকর নানা কার্যেও তিনি লিপ্ত ছিলেন। মেদিনীপুরে তিনি বিরাট এক কর্মকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। জনশিক্ষার সুবিধার্থে তিনি ঐস্থানে একটি পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই ছিলেন তার সম্পাদক। সেই সময় শ্রমজীবীদের শিক্ষার জন্য তিনি একটি নৈশ বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। মেদিনীপুরে তিনি একটি ব্রাহ্মসমাজ ও একটি ব্রাহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 'মিউচুয়েল ইমপ্রুভমেণ্ট সোসাইটি', 'জ্ঞানদায়িনী সভা', 'সুরাপান নিবারণী সভা', 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' তাঁরই উৎসাহ ও চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাগুলি মেদিনীপুরে প্রতিষ্ঠিত হলেও এসবের সুফল কলকাতা এবং বাংলাদেশের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে।

রাজনারায়ণ কর্তৃক 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী' বা 'গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' স্থাপন এদেশে জাতীয়তা উন্মেষের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। লোকে যাতে এদেশীয় আচার-আচরণ পালন, বেশভূষা ধারণ, ধর্মচর্চা ও মাতৃভাষায় নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করতে উৎসাহ পায়, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এই সভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সভার সভ্যদের জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় মর্যাদা বজায় রাখার জন্য সভার নিয়ম

মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য ছিল। সভ্যদের ইংরেজীবর্জিত বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে হত। একটি ইংরেজী শব্দ বললে এক পয়সা জরিমানা হত। "Good night"-এর যায়গায় "সুরজনী" বলতে হত। ইংরেজী ১লা জানুয়ারি পরস্পরকে অভিনন্দন না জানিয়ে বাংলা ১লা বৈশাখ অভিনন্দন জানাবার রেওয়াজ প্রচলিত হয়। ঐ সভায় অবশ্য পালনীয় বিষয় হিসাবে একটি কার্যবিবরণী রচনাও লিপিবদ্ধ করা হয়: "Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal"

১৮৬৬ সালে নবগোপাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত 'National Paper' এ উহা মুদ্রিত হয়। অনুষ্ঠানপত্রে রাজনারায়ণ 'National Promotion Society' নামে একটি সংঘ বা সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। মাতৃভাষায় কথাবার্তা বলা ও চিঠিপত্র লেখা, বক্তৃতা দেওয়া, ইংরেজী শিক্ষার পূর্বে বালক বালিকাদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা, স্বদেশী ব্যায়াম করা, হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী সমাজসংস্কার করা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি স্বদেশী উৎসব পালন, নমস্কার-প্রণাম প্রভৃতি স্বদেশী প্রথায় অভিবাদন ও শিষ্টাচার পালন, দেশীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান, দেশীয় প্রথায় দেশীয় খাবার খাওয়া প্রভৃতি এই সভার সভ্যদের পালনীয় বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। দেশের মধ্যে স্বদেশী ভাব ও স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠান পত্রের দ্বারা নবগোপাল মিত্র অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানপত্রের আদর্শ প্রচার করার জন্য তিনি অত্যল্প কালের মধ্যে "চৈত্র মেলা" বা "হিন্দু মেলার" প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন, "শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করাতে হিন্দু মেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। এই হিন্দুমেলা সংস্থাপনে উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার আদর্শে গঠিত হয়।"

১৮৬৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রাজনারায়ণ মেদিনীপুরের প্রধান শিক্ষকের কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর অসামান্য কর্মনিপুণতা ও স্বদেশহিতৈষীতার জন্য মেদিনীপুরবাসীর নিকট থেকে আন্তরিক অভিনন্দন প্রাপ্ত হন। ১৮৬৯-৭৯ সাল পর্যন্ত রাজনারায়ণ কলিকাতায় বসবাস করেন। ১৮৬৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণকে আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভায় গ্রহণ করেন। এই সভায় তিনি সভাপতির কাজ করতেন। এরপর থেকে রাজনারায়ণ ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে

আসেন। ইতিপূর্বে ঠাকুর-পরিবারে স্বদেশীয়ানার যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল রাজনারায়ণের সংস্পর্শে এসে তা আরও অধিক উদ্দীপিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। নবগোপাল মিত্রের স্থাপিত হিন্দুমেলার বাৎসরিক উৎসবে রাজনারায়ণ প্রতিবছরই জাতীয় চেতনা সঞ্জীবিত করার জন্য বক্তৃতাদি দিতেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল : (১) বাংলাভাষা ও সাহিত্য, (২) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা, (৩) সেকাল ও একাল।

রাজনারায়ণ বয়সে প্রবীণ হলেও আমৃত্যু তাঁর মন ছিল চির নবীন। কিশোর যুবক সবাইর সঙ্গে তিনি বন্ধুর মতো মিশতে পারতেন। তাই তিনি তরুণদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "দেশের উন্নতি সাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কত রকম সাধ্য ও অসাধ্য প্লান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই।...ইংরেজী বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ। কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্ভক্ত চির বালকটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।"

রাজনারায়ণের সব কিছু কার্যপদ্ধতির মূলে ছিল দেশের মানুষের মনে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করা। পাশ্চাত্ত্য অনুকরণকে তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন। পরবর্তী কালের জাতীয় সভা ও নেতারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বহুলাংশে রাজনারায়ণের প্রচারিত জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আজও তাঁর বাণী জাতীয়তার ভিত্তিমূল দৃঢ়ীকরণে যথেষ্ট সহায়ক।

এই জাতীয়তা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ ১৮৮১ সালের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় লিখেছিলেন, "ঈশ্বরের প্রিয় কার্যের মধ্যে স্বদেশের উপকারসাধন সর্বাপেক্ষা প্রধান। 'জননী জন্মভূমিশ্চ

স্বর্গাদপি গরীয়সী।'...ভারতবর্ষ আমাদিগের জন্মভূমি, ভারতবর্ষের উপকার সাধনে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব।"

কলিকাতায় এমন কোনো দেশোন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল না যার সঙ্গে রাজনারায়ণ তাঁর কলিকাতায় অবস্থানকালে যোগদান করেন নি। ১৮৭৬ সালে ভারতবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'Indian Association' বা 'ভারত সভা' স্থাপিত হয়। রাজনারায়ণ এর অধ্যক্ষ-সভার সদস্য ছিলেন।

এরপর রাজনারায়ণ দেওঘরে যান এবং ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত ঐ স্থানে অবস্থান করেন। নব্যপন্থী যুবকরা কোনো সমস্যায় পড়লে যুক্তি-পরামর্শের জন্য দেওঘরে তাঁর নিকট যেতেন। তখনো যুবকদের নিকট তিনি ছিলেন দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক। দেওঘরেও তিনি নানা জনহিতকর কার্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দেওঘরে অবস্থানকালে তিনি 'Old man's hope' বা 'বৃদ্ধের আশা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি ভারতবর্ষে সমগ্র হিন্দুসমাজের মঙ্গল বিধানের জন্য একটি নিখিল ভারতীয় মহাহিন্দু সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ঐ সমিতির প্রতীক হিসাবে 'ঈশ্বর ও মাতৃভূমি' এই বাক্যলাঞ্ছিত একটি জাতীয় পতাকারও পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন।

রাজনারায়ণের দেশপ্রেমের কোনো তুলনা হয় না। দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারের জন্য তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর অমর লেখনী মুখেই ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দুজাতির কীর্তি, হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিতেছি।"

বাংলা সাহিত্যে রাজনারায়ণের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁর 'একাল ও সেকাল' বাংলা ভাষার একখানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আধুনিক বাংলায় তিনি প্রথম 'Science of Religion বা ধর্মবিজ্ঞানের আলোচনা করেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামে তিনি আরও একখানা উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাছাড়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায়ও তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর এই রচনাবলীর মধ্যে স্বদেশপ্রীতিরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষানবীশদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ অনুশীলনের যে অভিনব প্রচেষ্টা করেছিলেন, তার জন্যই তিনি বাংলার জাতীয়

জাগরণের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। রাজনারায়ণ তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন যে একজন তাঁকে 'Grandfather of Indian Nationalism' এই উপাধি দিয়েছিলেন। সত্যিই তাঁর শিক্ষাদীক্ষাই এদেশে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবোধ এনেছিল। তাছাড়া, তিনি ছিলেন এদেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষাগুরু অরবিন্দ ঘোষের মাতামহ। সে হিসাবেও তিনি 'Grandfather of Indian Nationalism' বা 'ভারতীয় জাতীয়তার মাতামহ'।

সমাজসংস্কারেও রাজনারায়ণ অগ্রণী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের তিনি ছিলেন একান্ত পক্ষপাতী। তিনি নিজ পরিবারে সহোদর ভাই মদনমোহন ও জ্যেঠতুত ভাই দুর্গামোহনের বিধবাবিবাহ দিয়েছিলেন। এই দুর্গামোহনের ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গী—আলিপুর বোমা মামলার অন্যতম আসামী।

যখন তিনি মেদিনীপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন, সেখানেও এই আন্দোলন চালান। এজন্য তাঁর জীবনসংশয়েরও আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। রাজনারায়ণ আমৃত্যু স্বদেশের কথা চিন্তা করেছেন, পরিকল্পনা দিয়েছেন। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর জীবন সায়াহ্নে একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তখন কোনো কথাপ্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বলেছিলেন, "আমি বেশী দিন বাঁচব এমন আশা তো করি না। কিন্তু মরিবার আগে আমার দেশের একটা শত্রুকেও যদি নিজের হাতে নিপাত করিয়া যাইতে পারি, তবে জন্মটা সার্থক হইল মনে করিব।" রাজনারায়ণের এই ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন তাঁর দুই দৌহিত্র—অরবিন্দ ও বারীন্দ্র ঘোষ।

রাজনারায়ণ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন যে তাঁর সমাধির উপর যেন তাঁর একটি বক্তৃতার কিয়দংশ উৎকীর্ণ করা হয়। ঐ অংশটি এইরূপ :

"স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যা দ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয়ভাব রক্ষাপূর্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্যজাতিসমূহের মধ্যে গণ্য জাতি হইবে।"

স্বাধীনতার চারণ কবি

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ই নবযুগ প্রবর্তক প্রথম কবি। সাহিত্যে আত্মপ্রত্যয়শীল সার্থক স্বদেশপ্রীতি প্রচারের তিনিই প্রথম উদ্বোধক। অবশ্য তাঁর পূর্বে ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় জাতি ও দেশপ্রীতি কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে পরাধীনতার জ্বালা ও ক্ষোভ এবং দেশাত্মবোধের এমন উদ্দীপনা দেখা যায় নি।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি রঙ্গলালের ছিল অকৃত্রিম ও প্রগাঢ় অনুরাগ। এই সাহিত্যের নিন্দাবাদ বা অপকর্ষের কথা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ইহা তাঁর দেশপ্রীতিরই নামান্তর।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি রঙ্গলালের কি অসাধারণ প্রীতি ছিল তা তাঁর 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে'র নিম্নোক্ত উদ্‌ধৃতি থেকে আভাষ পাওয়া যায়: "হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ, হে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা কবিতার বন্ধুবর্গ, আপনারা আর কালবিলম্ব করিবেন না, বাঙ্গালা কবিতা হার যাহাতে সভ্য কণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন, উর্বরা ভূমি আছে, বীজ আছে, উপায় আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক, অতএব গাত্রোত্থান করুন, উৎসাহ সলিল সেচন করুন, পরিশ্রমরূপ হল-চালনা করুন, দ্বেষ প্রভৃতি জঙ্গল কণ্টক বৃক্ষ উৎপাটন করুন, তবে ত্বরায় সুশস্য লাভ হইবেক, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! আপনাদিগের মধ্যে অনেকে অনায়াসে প্রাপ্য স্বদেশীয় শস্যকে ঘৃণা করিয়া বিলাতী ফসল ফলাইতে যান, অথচ বিবেচনা করেন না, যেরূপ বকুলবৃক্ষে আম্রমুকুল উদয় হয় না, সেইরূপ বাঙ্গালী কর্তৃক ইংরেজী কবিতা অথবা ইংরেজ কর্তৃক বাঙ্গালা কবিতা রচনা অসম্ভব হয়।" এই প্রবন্ধ সেদিন বহু সাহিত্যিকের মনে অপরিসীম প্রেরণার সঞ্চার করেছিল।

রঙ্গলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। ইহা টডের রাজস্থান কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই 'পদ্মিনী উপাখ্যান'ই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রথম স্বদেশপ্রীতি ও আখ্যায়িকামূলক কাব্য। এই কাব্যের মূল

ঘটনা ভীম সিংহের পত্নী পদ্মিনীর অসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের হাত থেকে চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষা করার কথাই এতে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটির সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেশাত্মবোধের উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত চিতোর হলেও কবির মনশ্চক্ষুর সামনে ছিল ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত পরাধীন ভারতবর্ষ। তাই চিতোর-বর্ণনায় ভারতের কথাই ফুটে উঠেছে :

"মানসে করেন চিন্তা কোথায় সেদিন।
যেদিনে ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন ॥
অসংখ্য বীরের যিনি জন্মপ্রদায়িনী।
কত শত দেশে রাজবিধি বিধায়িনী ॥
এখন দুর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধিনী।
যাতনায় দিন যায় হয়ে অনাথিনী ॥"

চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভীম সিংহ পুত্রগণসহ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হলেন। কবি তাঁর মুখ দিয়ে বলালেন :

"চল সবে সমর করিব প্রাণপণে।
রাখিব জাতীয় ধর্ম রুধির তর্পণে।
কুলধর্ম রাখিতে জীবন যদি যায়।
জীবনের সার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায় ?"

শেষ সময়ে রাজপুত সৈন্যগণকে ভীম সিংহ যে উৎসাহ বাক্য প্রদান করে উদ্দীপিত করেছিলেন, তা শুধু সে-যুগের কাব্য সাহিত্যে প্রথম নয়, ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে অতুলনীয়। স্বাধীনতার মাহাত্ম্য বর্ণনায় কবি রচনা করলেন :

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায় ॥

স্বার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ॥
... ...
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই।"

সেদিন জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এই পঙ্‌ক্তিগুলির প্রভাব ছিল অসামান্য। শুধু সে যুগের নয়, ইহা যে-কোনো যুগের, যে-কোনো দেশের মানুষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণার চিরন্তন উৎস। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হওয়ার অল্প দিন পরেই উহা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়। ফলে বইটি দেশের আপামর সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি প্রচারে পরম সহায়ক হয়ে উঠে। বাংলাদেশে এমন কোনো পাঠক নেই বা ছিল না যে এই কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নি। বাস্তবিকই কাব্যের বিশেষ বিশেষ পঙ্‌ক্তিগুলি জাতীয় জীবনে মহামন্ত্রের রূপ ধারণ করেছিল। কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের মতে, "যখন স্বদেশানুরাগের প্রাধান্য ছিল না, বীররস বঙ্গভাষায় অপরিচিত ছিল, তখন রঙ্গলাল লিখিয়া গিয়াছেন : 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে…'। রঙ্গলাল যখন তাঁর কাব্যমধ্যে 'স্বাধীনতা হীনতা'র অন্তর্জ্বালার বর্ণনা দিচ্ছেন, তখনো এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য কোনো সংস্থা গড়ে ওঠে নি। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বদেশের ইতিহাস-সচেতন গভীর আত্মপ্রত্যয়শীল দূরদর্শী মানুষ। পরাধীনতার মর্মজ্বালা তিনি সহজেই অনুভব করেছিলেন। পরাধীনতার সেই জ্বালা এবং স্বাধীনতার সুখ স্বদেশবাসীর মধ্যে প্রচার করার জন্যই তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। আর সেই স্বদেশপ্রীতি প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বীরত্বসূচক ঐতিহাসিক ঘটনা। তাই রঙ্গলালই বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক কাব্যকার। তাঁর চারখানি কাব্য যথা, 'পদ্মিনী উপাখ্যান,' 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী', এবং 'কাঞ্চী কাবেরী' ঐতিহাসিক আখ্যান অবলম্বনেই লিখিত। আর প্রতিটির মধ্যেই কমবেশী শৌর্য, বীর্য ও স্বদেশপ্রীতির আদর্শের বর্ণনা আছে।

রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কর্মদেবী'ও রাজপুত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই কাব্যের এক স্থানে কবি ভারতের পরাধীনতার জন্য খেদ প্রকাশ করেছেন :

হায় কবে দুঃখ যাবে, এদশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন প্রসূন।

কবে পুনঃ বীররসে, জগৎ ভরিবে যশে,

ভারত ভাস্বর হবে পুনঃ ?

রঙ্গলালের তৃতীয় কাব্য 'শুর সুন্দরী'ও রাজপুত নারীর সতীত্ব ও শৌর্য-বীর্যের গাথা কাব্য। কাব্যের একস্থানে কবি ভারতে জাতীয় ঐক্যের আশা প্রকাশ করেছেন :

"কবে সবে এক জাতি করিবে স্বীকার।
একভাবে জাতিশ্বরে দিবে নমস্কার॥
এই জাতি বহুতর অনর্থের মূল।
ইতিহাসে আছে তার প্রমাণ বহুল॥"

রঙ্গলালের চতুর্থ কাব্য 'কাঞ্চী-কাবেরী' উড়িষ্যার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ইহাও বীররস পূর্ণ। তাছাড়া, অন্যান্য যেসব কাব্য অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে, তার মধ্যে 'উমা' নামক মারবার দেশীয় উপাখ্যানটি অন্যতম। এ-সব কাব্যে দেশপ্রেমের কথা প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও ভারতের পুরুষ রমণীর বীরত্ব সতীত্ব ও সংগ্রাম নিপুণতা প্রভৃতি নানা মহৎগুণের বর্ণনা আছে, যা জাতীয় চরিত্র গঠনের পক্ষে আদর্শস্বরূপ।

দেশ ও জাতির গৌরব বৃদ্ধির জন্য রঙ্গলাল লেখনী ধারণ করেছিলেন। কাব্য-সাহিত্যে তিনি যে দেশপ্রেমের সূচনা করেছিলেন, তাহাই মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বিশেষ বিস্তারলাভ করেছিল। রঙ্গলালের এক জীবনীকারের ভাষায়, "রঙ্গলাল সর্বপ্রথম ইংলণ্ডীয় কাব্যের সুরুচিপূর্ণ রসধারা আনিয়া মুমূর্ষু বাঙ্গালা কাব্যকে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে আর কেহ এরূপ সাফল্য সহকারে এই কার্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বরেণ্য কবিগণ তৎপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করেন। তিনি বহু কবির গুরুস্থানীয়—তিনি কবির কবি।" পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "এখন যেমন অনেকে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেন, তখন সেইরূপ উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলালের অনুকরণের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কবিতা এক সময় বঙ্গদেশের পাঠকবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছিল।... বঙ্গদেশে এমন কোনো পাঠক আছেন কি যাঁহার উপর তাঁহার দেশপ্রেমোদ্দীপনা বাণীর প্রভাব সঞ্চারিত হয় নাই ?"

বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায়, "পদ্মিনী উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাঙ্গালায় সর্বপ্রথম জাতীয় স্বাধীনতার বাণী উদ্গিরিত করিয়াছিলেন।...গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে নব্য বাঙ্গালা রঙ্গলালের উদ্দীপনাময় কাব্য হইতে জাতীয় স্বাধীনতার নূতন মন্ত্র গ্রহণ করিল।"

জাতীয়তার চারণকবি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার নবজাগ্রত জাতীয়তার দিনে যাঁরা দেশবাসীর মনে দেশপ্রেমের অগ্নিগর্ভ মন্ত্র দিয়েছিলেন, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। ঐ শতাব্দীতে অন্য কোনো লেখকই স্বদেশপ্রীতিমূলক এত লেখা লেখেন নি। এক কথায় বলতে গেলে হেমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত কাব্য ও কবিতা জাতীয়ভাবে সমৃদ্ধ। তিনি ছিলেন ঐ শতাব্দীতে নবজাগরণের চারণ কবি।

ছাত্রজীবন থেকেই হেমচন্দ্র বিদেশীর বর্বর শাসন ও পরাধীনতার নিদারুণ জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। পরবর্তীকালে অজস্র স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতা লিখে দেশবাসীকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "বীরবাহু" ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় কবি বলেছেন, "উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক। পুরাকালে হিন্দু-কুল-তিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হয়েছে। কাব্যটি স্বদেশপ্রেমে ভরপুর। কাব্যের নায়কের মুখে কবি ব্যক্ত করেছেন :

"এবে সেই দেশমান্যা ভারতবক্ষেতে, ম্লেচ্ছকুল পদে দলে"
লক্ষ তরি ভাসাইব, ম্লেচ্ছদেশ মজাইব,
বাণিজ্য করিব ছারখার।
তোর সিংহাসন পাত, ম্লেচ্ছকুল ভস্মসাৎ,
প্রেয়সীরে করিব উদ্ধার॥

জন্মভূমি ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ পরাধীনতার জ্বালায় কবি অন্তরে নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। তাই তিনি স্বদেশজননীকে সম্বোধন করে সখেদে বলেছেন,

"মাগো ও মা জন্মভূমি আরো কত কাল তুমি
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।
পাষণ্ড যবন দল, বল আর কত কাল
নিদয়, নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে।"

হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের মূল সুর জাতি-বৈর। তাঁর রচিত অধিকাংশ কবিতায় বিদেশী শাসকের প্রতি বিদ্বেষভাব ফুটে উঠেছে। অবশ্য এ বিদ্বেষভাব সমগ্র ব্রিটিশ জাতির প্রতি নয়, কেবলমাত্র ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি, যারা অতীতের নানা ঐতিহ্যবিমণ্ডিত এই মহান্ দেশকে পরাধীন করে রেখে তার উপর নানা নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজদের সঙ্গে আমাদিগের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে। এই যে জাতি-বৈর ঘটিয়াছে, ইহার প্রধান ঘটক—হেমবাবু। হেমবাবুই কখন ডুক্‌রে, কখন ফুক্‌রে, ক্রমাগত বলিয়াছেন যে, আমরা তোমাদের চোক্ষে যতই কেন নিকৃষ্ট হই না, আমরা আমাদের পূর্ব গৌরব ভুলি নাই, ভুলিতে পারি না।" তাই তিনি লিখলেন "ভারত বিলাপ।" কবি যেন ব্রিটনকে বলছেন,

"দেখ্, চেয়ে দেখ্ প্রাচীন বয়সে,
তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে,
কাঁদিছে সে ভূমি, পূজিত যে দেশে
কত জনপদ গাহি মহিমা।
আগে ছিল রানী—ধরা রাজধানী,
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী,
বলিয়ে দম্ভ করো না গরিমা।
তোমারো ত বুকে কত শত বার—
রিপু-পদাঘাত করেছে প্রহার,
কালেতে না জানি কি হবে আবার
এই কথা সদা করিও ধ্যান।"

বিদ্যাসাগর মশাই যখন বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেন, তখন হেমচন্দ্র তার সমর্থনে লেখনী ধারণ করেন। "ভারত কামিনী" কবিতায় নির্যাতিতা নারীজাতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। এই কবিতা তৎকালে বহু সমাজ-সংস্কারকের মনে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল :

"অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া, সদাচার ?
হয়ে আর্যবংশ—অবনীর সার,
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে !

...   .

চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে?"

"ভারত সঙ্গীত" হেমচন্দ্রের সবচেয়ে সমাদৃত কবিতা। দেশপ্রেম সঞ্চারে এর প্রভাব অপরিসীম। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়, "ভারত সঙ্গীতের দ্বারা জাতীয় আন্দোলনের পরিপুষ্টি সাধন হইয়াছিল। 'বীর বাহুতে' যে-সুরের সূত্রপাত 'ভারত সঙ্গীতে' তাহারই পরিণতি। দেশপ্রেমের এমন উচ্ছ্বাসপূর্ণ ও উত্তেজনাময় প্রকাশ খুব কম বাঙ্গালা কবিতায় আছে।"

"আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি,
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,
বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে।
... ...
আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
... ...
হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি!
কারে উচ্চৈঃ স্বরে ডাকিতেছি আমি,
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি!—
আর কি ভারত সজীব আছে?
... ...
জপ, তপ, আর যোগ আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে করূরে পূজা।

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত কি শুধু ঘুমায়ে রবে ?”

এই ‘ভারত সঙ্গীত’ প্রকাশিত হবার পর হেমচন্দ্রকে রাজরোষে পড়তে হয়েছিল। উল্লেখ্য যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মাতৃ-স্তোত্র “বন্দেমাতরম্‌” রচনায় ‘ভারত সঙ্গীতে’র ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

স্বদেশের দুর্দশায় কবি হেমচন্দ্র কেবল খেদই করেন নি, কেবল হতাশার কথাই শোনান নি; তিনি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছেন। আশার কথা শুনিয়ে বলেছেন যে ভারত চিরকাল পরাধীন থাকতে পারে না; আবার সে স্বাধীন হবেই; আবার তার হৃত-গৌরব ফিরে আসবে।

“কে বলেছে এই ভাবে
ভারতের দিন যাবে ?—
“নিশির প্রভাত নাই”
যে বলে সে জানে নাই,
ভারতের ভাবী বেদ পড়ে নি কখন,—
জানে না সে জগতের
কিবা গতি, কিবা ফের;
ফের্‌ এ ভারতবাসী
জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসি,
হাসিবে অপূর্ব হাসি, লভিয়া জীবন—”

১৮৮৬ সালে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলকাতায় ‘ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে’র দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ভারতের সমস্ত প্রদেশের বহু প্রতিনিধি যোগদান করে সর্বভারতীয় ঐক্যের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সর্বভারতীয় জাতীয় ঐক্যের এই সূচনা দেখে স্বদেশপ্রেমিক কবি হেমচন্দ্র আশায় উদ্দীপনায় অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। তিনি সানন্দে লিখলেন,

“ভারত জননী জাগিল !
পূরব, বাংলা, মগধ, বিহার,
দেরাইস্‌মাইল, হিমাদ্রির ধার,

করাচি মাদ্রাজ, শহর বোম্বাই,
সুরাট, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই,
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল।

আনন্দ উচ্ছ্বাস ফুটেছে বদনে
মায়েরে বসায়ে হৃদি সিংহাসনে,
চরণযুগল ধরি জনে জনে
একতার হার পরিল।"

হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার', 'আশাকানন' এমন কি 'ছায়াময়ী' ও 'দশমহাবিদ্যা'র মধ্যেও দেশপ্রেমের সুর ঝঙ্কৃত। বৃত্রসংহার পৌরাণিক কাব্য হলেও তার মধ্যে বহুস্থলে আমাদের জাতীয় পরাধীনতার গ্লানিসূচক আক্ষেপ শুনতে পাই। বৃত্র দৈত্য ভারতে শক্তিমদমত্ত ও ভোগপ্রমত্ত ইংরেজ শাসকের প্রতীক। পরপদানত, হৃতগৌরব ভারত স্বর্গরাজ্যের ও পরাজিত ক্ষুব্ধ দেবতা হতমান ভারতবাসীর প্রতীক। স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধারে দধীচির অস্থিদানের কথা উল্লেখ করে কবি ভারত উদ্ধারে দেশপ্রেমিকদের সামনে আত্মদানের আদর্শ তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি শুধু স্বদেশপ্রেমিক নন, তিনি সত্যদ্রষ্টাও।

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিদুষী ভগ্নি লাবণ্যপ্রভা সরকার বলেছেন, "গীতি কবিতায় হেমচন্দ্র অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন, আর এখন সে গীতি কে গাহিবে, গীতি কবিতায় তিনি তাঁহার নির্ভীক, স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হৃদয়ের যে তীব্র জ্বালা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রোতের মত আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। জন্মভূমি যে কি পদার্থ, আমাদের ভারত যে স্বর্গ হইতেও গুরুতরা, তাহা সেই বালিকা বয়সে জন্মের মত শিখিয়া গেলাম।"

অধ্যাপক ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরীর ভাষায়, "তিনি যেরূপ উদ্দীপিত করিতে পারিতেন, নিদ্রিতকে জাগরিত, অলসকে শ্রমপরায়ণ, রোগীকে সুস্থ, বৃদ্ধকে যুবা, এমন আর কেহ পারেন নাই।···উদ্দীপনায় তাঁহার তুল্য কেহ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। তাঁহার সম্বোধন তুরী ভেরীর ন্যায়—কোমল নহে। জলদ গম্ভীর ভীষণায় উচ্ছ্বসিত জলপ্রপাতের ন্যায় ভাসাইয়া লইত।"

হেমচন্দ্রের কবিকৃতি সম্বন্ধে সজনীকান্ত দাস বলেছেন, "হেমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন; কারণ, তিনি আমাদের সাজাত্য-বোধ ও স্বদেশ-প্রেম যে পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন এমন আর সে যুগে কোন কবি করেন নাই।"

অপর এক সমালোচকের মতে, "পাপের প্রতি বিদ্বেষ, অত্যাচারের প্রতি ক্রোধ, সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধা, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা হেমচন্দ্রের কবিতাপাঠে পাঠক উপলব্ধি করিবেন। হেমবাবুর কবিতা…নির্বাসিত ম্যাটসিনীর জ্বলন্ত হৃদয়ভেদী রচনাবলীর ন্যায় ভূতগৌরব বিস্মৃত সুষুপ্ত অধীন জাতিদিগকে জাগরিত করিবার জন্য রচিত হইয়াছে।"

হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতাবলীর মূল্য সেই যুগেই শেষ হয়ে যায় নি, স্বাধীনোত্তর ভারতের বর্তমান জাতীয় জীবনেও সে সবের প্রভাব অপরিসীম।

মাতৃমন্ত্রের দীক্ষাগুরু

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের প্রথমপাদে মহামনীষী রাজা রামমোহন রায় এদেশে যে জাতীয়তার শুভ উদ্বোধন করেছিলেন, তার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে সেই শতাব্দীর শেষার্ধে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সেই জাতীয়তাকে জাতির হৃদয়ে মূর্ত করে তুলেছিলেন স্বদেশপ্রীতির নব বাণী-মন্ত্রে। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের পূর্বে রামায়ণ রচনা করেছিলেন সে-যুগের ঋষি মহাকবি বাল্মীকি, জাতির মুক্তি-সংগ্রাম সুরু হবার প্রায় দু'যুগ পূর্বে জাতীয়তার মহামন্ত্র "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত রচনা করেছিলেন এযুগের ঋষি সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র। তিনিই সর্বপ্রথম দেশবাসীকে শিখিয়েছিলেন স্বদেশকে স্বদেশজননীরূপে বন্দনা করতে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র জাতির মাতৃমন্ত্রের শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৩৮ খৃস্টাব্দের ২৬শে জুন চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটির নিকটবর্তী কাঁটালপাড়া গ্রামে। তিনি অসাধারণ প্রতিভাধর ছাত্র ছিলেন। শোনা যায় তিনি একদিনে বাংলা বর্ণমালা আয়ত্ত করেছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই জ্ঞানার্জনস্পৃহা তাঁর মধ্যে ছিল অত্যন্ত প্রবল। কলেজ জীবনে তিনি সাহিত্যানুরাগী হয়ে উঠেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার তিনি ছিলেন পরমভক্ত। ছাত্রাবস্থায় তিনি গুপ্ত-কবির কবিতা পাঠ করে পরম তৃপ্ত হতেন এবং গুপ্ত-কবির দৃষ্টি তাঁরওপর পড়ে। গুপ্ত-কবি সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁর সাহিত্য সাধনার হাতে খড়ি হয়। প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের মনেপ্রাণে দেশপ্রেমের বীজ উপ্ত হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্বদেশপ্রীতিমূলক রচনাবলী থেকে।

পরবর্তীকালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেয়ে তাঁকে যখন বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল, তখন দেশের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দশা প্রভৃতি বহু কিছুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে। তিনি দেখলেন দেশের পথে-প্রান্তরে সাধারণ মানুষ কি নিদারুণ দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে। সমগ্র জাতি অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে মোহাচ্ছন্ন, আত্মসম্বিৎশূন্য। দেশ নিরন্ন, অন্নদাতা

কৃষক করভারে প্রপীড়িত। শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, ধনী নির্ধনে হৃদয়ের কোনো যোগ নেই। শিক্ষিত সম্প্রদায় মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগশূন্য। দেশ পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণে উন্মুখ। এক কথায় দেশের প্রতি দেশবাসীর কোনো প্রীতি ছিল না বললেই চলে। হাজার হাজার বছরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এক মহান দেশের নিদারুণ দুরবস্থা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র অন্তরে অত্যন্ত বেদনাবোধ করতে লাগলেন। দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণচিন্তায় তিনি বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছেন। অবশেষে স্থির করেন সাহিত্যসাধনার মধ্য দিয়েই জাতিকে জাগিয়ে তুলবেন, জাতির আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনবেন। তাই বজ্র-কঠোর হস্তে বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী ধারণ করলেন তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতির কর্ণকুহরে ভেরীরবে মুক্তি-মন্ত্র শোনাতে। ইংরেজী রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র পারদর্শী হলেও আবাল্য তিনি 'মাতৃসম মাতৃভাষা' বাংলার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাছাড়া, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করতে না পারলে কোনো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না। বিদ্যাসাগর কর্তৃক বাংলা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হলেও তখন তার দৈন্য দূর হয় নি। তখনও বাংলা ভাষা শিক্ষিত বাঙ্গালীর শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয় হয়ে উঠে নি। অনাদৃতা, উপেক্ষিতা মাতৃভাষাকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে লেখনী ধারণ করলেন। তিনি প্রথমেই সৃষ্টি করলেন উপন্যাস। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীর হৃদয় জয় করে নিল। একে একে কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হতে লাগল। আর বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির মাধ্যমে বঙ্গ ভাষার অপূর্ব শ্রী ও শক্তি দেখে বিস্মিত হল। বঙ্কিম সাহিত্যের মধ্য দিয়েই বাংলাভাষা ক্রমে ক্রমে বাঙালীর আদরের সামগ্রী হয়ে উঠল।

কেবল পাঠকদের চিত্তরঞ্জন করাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য ছিল না। দেশ, জাতি ও ভাষার মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়েই তিনি উপন্যাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আদর্শ সৃষ্টি। বহু শতাব্দী ধরে পরাধীনতার পাপপঙ্কে নিমজ্জিত থেকে দেশ হয়েছিল আদর্শভ্রষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র সেই আদর্শভ্রষ্ট, নীতিবিবর্জিত সমাজে পুরুষের আদর্শ, নারীর আদর্শ, জাতির আদর্শ, শাসনের আদর্শ, ধর্মোপদেশের আদর্শ প্রতিষ্ঠার আশায় উপন্যাস সৃষ্টি করেছিলেন।

আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী এবং সীতারাম এই শেষ তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকার প্রতি অসামান্য ভক্তি প্রদর্শন করেছেন। বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পালের কথায়, "এই দেশপ্রীতিই এই তিনখানি উপন্যাসের মূল সূত্র। আর এই জন্যই আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী এবং সীতারাম বাংলার নূতন স্বাদেশিকতার শাস্ত্র হইয়া আছে।"

বহুদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র শীঘ্রই উপলব্ধি করেছিলেন যে শুধু গল্প উপন্যাস লিখেই কোনো জাতীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ করা যায় না। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়েও প্রবন্ধাদি প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। তাতে সাহিত্যের উন্নতি এবং জাতির স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ হয়। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন', পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমের এক অনন্যসাধারণ কীর্তি। 'বঙ্গদর্শন' বাঙালীর স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার উদ্বোধক। 'বঙ্গদর্শন' কেবল সাহিত্য সৃষ্টি করে নি, সাহিত্যিকও সৃষ্টি করেছে। এই পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র বহু নবীন লেখককে উৎসাহিত করেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, "বঙ্গদর্শন বাংলাসাহিত্যে একটা নূতন ও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলরূপে উদিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সূর্যস্বরূপ।" রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য।...বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।...এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল।"

'বঙ্গদর্শন' পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী আত্মবিস্মৃত বাঙালীদের আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেছিল। যাঁরা মাতৃভাষা বাংলাকে অবজ্ঞার ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন তাঁরা 'বঙ্গদর্শন' দর্শনে মাতৃভাষাকে সমাদর ও মাতৃভাষার অনুশীলনে অনুরাগী হলেন।

জাতীয় ইতিহাস যে-কোনো জাতির গৌরব ও অগ্রগতির উপায়। দুঃখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাঙালীর কোনো ইতিহাস ছিল না বললেই চলে। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম আত্মবিস্মৃত বাঙালীজাতিকে ইতিহাস-সচেতন করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন বা করবেন তাঁদের বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন নি বটে, কিন্তু বাংলার অতীত সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলের সীমা ছিল না। তাঁর এই কৌতূহলের মূলে ছিল স্বদেশের প্রতি সুগভীর অনুরাগ। উনিশ শতকের বাংলার প্রাণচেতনা দেশের অতীতকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই চেতনাকে সাহিত্যিক কল্পনায় ভাষা দিয়েছিলেন। বাঙালীকে তিনি ইতিহাস পুনরুদ্ধার করতে এবং নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিলেন। ইতিহাস-বিমুখ বাঙালী জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সখেদে বলেছিলেন, "জাতীয় গর্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি, ইতিহাস সামাজিক বিকাশের এবং সামাজিক উচ্চাসনের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে, পিতা-পিতামহের নাম জানে না। এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্তিমন্ত

পূর্ব-পুরুষগণের কীর্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙালী।" পৃথিবীর অনেক অখ্যাত, অনগ্রসর দেশের ইতিহাস আছে, অথচ শত সহস্র বছরের সুপ্রাচীন নানা ঐতিহ্যবাহী বাঙালীর কোনো ইতিহাস নেই দেখে তিনি আরও বলেছিলেন, "গ্রীনলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরিজাতির ইতিহাসও আছে; কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষদ-চরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শম্যান, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি গ্রন্থকার প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি : সে কেবল সাধপূরণ মাত্র।"

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের উষালগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে তার গৌরবময় ইতিহাস রচনা করতে উদ্‌বুদ্ধ করে বললেন, "বাঙালী আজকাল বড় হইতে চায়,—হায়! বাঙালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই? বাঙালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী কখনো মানুষ হইবে না।"

বাঙালী ভীরু, কাপুরুষ বলে যে-সব অপবাদ আছে তা যে সর্বৈব মিথ্যা সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙালী চিরদিন দুর্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুষি দেখিলেই পলাইয়া যায়।...কিন্তু যে বলে যে, বাঙালীর চিরকাল এই চরিত্র...তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক। এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না।... বাঙালীর চির দুর্বলতা ও চিরভীরুতার আমরা কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।...যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা হিমালয়মূলে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে এবং বালীদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখন ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।"

এইভাবে বাংলার গৌরবময় অতীতের নানা ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক বিবরণের ইঙ্গিত দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাঙালীকে বাঙালী বলে আত্মপরিচয় দিয়ে গৌরব বোধ করতে শেখালেন। স্বদেশের ইতিহাসের প্রতি দেশবাসীর উদাসীনতা ও হীনমন্যতার ভাব লক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র এক সময় বলেছিলেন, "যে মনুষ্য জননীকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে মনুষ্য মধ্যে হতভাগ্য। যে জাতি জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি

গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে জাতি জাতিমধ্যে হতভাগ্য।" পরবর্তীকালে বঙ্গমনীষা বঙ্গভূমিকে যে "আমার সোনার বাংলা", "দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ" ইত্যাদি অভিধায় ভক্তি-শ্রদ্ধা জানিয়েছে, তা বঙ্কিমচন্দ্রেরই ইতিহাস-শিক্ষা প্রদানের প্রত্যক্ষ ফল। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-সচেতনতা শিক্ষাদানের ফলেই বাঙালী তার জাতীয় জীবন থেকে ভীরুতা, অকর্মন্যতার অপবাদ অপনোদন করার প্রয়াস পেয়েছে। বাঙালী আবার বাহুবলে, বাক্যবলে, জ্ঞান-বিদ্যা বলে বলীয়ান হয়ে উঠে বিশ্বসভায় তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে—সক্ষম হয়েছে নতুন যুগে বাঙালীর নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে।

যে-কোনো জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ ও সমুন্নতির সহায় ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) তাঁহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি বাঙালীর যে কি মহৎ কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন, সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।···তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ—শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্বে সেই অনাদরমলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। তখন, পূর্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বঙ্গ ভাষার যৌবনসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন।"

বিরাট মহাভারতীয় জাতিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ দান জাতীয় মুক্তিমন্ত্র। এই মুক্তিমন্ত্র দেশকে মাতৃরূপে বন্দনার মন্ত্র—"বন্দে মাতরম্"। আর "আনন্দমঠ" সে মন্ত্রের ব্যাখ্যা। পরাধীনতার পূর্বে দেশমাতৃকার রূপ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "মা যা ছিলেন—অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না, সর্বাভরণভূষিতা, জগদ্ধাত্রী"—"ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুগুলি পদতলে দলিত করিয়া, বন্যপশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্যশালিনী।" তারপর পরাধীনতার ফলে দেশমাতৃকার শোচনীয় দুরবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন—"মা যা হইয়াছেন—কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিকাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এইজন্য নগ্নিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!" শেষে স্বাধীনতা অপহরণকারী বিদেশী বিজাতি শাসকের স্বৈরাচার থেকে স্বদেশকে স্বাধীন করতে

হলে যে শক্তির আবির্ভাব প্রয়োজন তার বর্ণনা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, "এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী, শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভূজা—নানা প্রহরণধারিণী—শত্রুবিমর্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণীবিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।"

বহুদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের অমিত শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। মাতৃবন্দনার এই মহাসঙ্গীত তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি প্রায় হারমোনিয়ম্ নিয়ে বাড়ীর লোকজন বা বন্ধু বান্ধবের নিকট এই গানটি সুর করে গাইতেন। কবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র এই "বন্দেমাতরম্" বহুবার গান করে শুনিয়েছেন। তাঁর নিজের সৃষ্ট এই সঙ্গীতের ভাবে, সুরে তিনি নিজেই যেন কেমন বিভোর হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, "এই সঙ্গীতের কী শক্তি তোমরা জান না। দেখ, একদিন সমগ্র দেশ এই সঙ্গীতের জন্য উন্মাদ্ হইয়া যাইবে।...আমার বিশ্বাস, আনন্দমঠে দেশের একদিন উপকার হইবে।"

সুগভীর আত্মপ্রত্যয়ী সত্যদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশ্বাস ব্যর্থ হয় নি। তিনি 'আনন্দমঠ' রচনা করেছিলেন ১৮৮২ সালে, এর প্রায় চব্বিশ বছর পরে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'আনন্দমঠে'র 'বন্দে মাতরম্' মহাসঙ্গীতই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বীজমন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। এ যুগের আর এক ঋষি যৌবনে অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষাগুরু বিপ্লবী অরবিন্দ এই মহামন্ত্র 'আনন্দমঠ' থেকে উদ্ধার করে জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন।

বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' অরবিন্দের কাছে সেদিন দেবতার আশীর্বাদের মতোই প্রতিভাত হয়েছিল। 'আনন্দমঠ' পড়ে অরবিন্দ অন্তরে এক অভূতপূর্ব প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাই তিনি স্থির করলেন 'বন্দেমাতরম্'কেই জাতির মুক্তি সংগ্রামের 'মন্ত্রে' পরিণত করবেন। এজন্য তিনি বহু প্রবন্ধ লিখলেন। বঙ্কিমকে 'বন্দেমারতম্' মন্ত্রের ঋষি আখ্যায় অভিহিত করলেন। বললেন, "জন্মভূমিই জননী—এই জ্ঞানের উন্মেষ বঙ্কিমচন্দ্রই করিয়াছেন। পরবর্তীকালের ঋষিগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নামও স্থান পাইবে, কেন না, যে বন্দেমাতরম্ সঞ্জীবন-মন্ত্রে নব্য ভারতের সৃষ্টি হইতেছে, উহা তাঁহারই দান। মায়ের দর্শনলাভের উপযোগী অন্তর্দৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের দিয়াছেন।" সেই থেকে বঙ্কিম সমগ্র ভারতে 'ঋষি বঙ্কিম' নামে সম্মানিত। ভক্তিআপ্লুতচিত্তে অরবিন্দ লিখলেন, "যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেইদিন আমাদের হৃদয় মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিল, মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

স্বদেশ মাতা, স্বদেশ ভগবান এই বেদান্ত শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুত্থানের বীজস্বরূপ।" সেদিনের তরুণ অরবিন্দ এই বলেই প্রণাম জানালেন প্রবীণ বঙ্কিমকে। বঙ্কিম তাঁর কাছে ঋষি—'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র। কালে এই সঞ্জীবনী মন্ত্রে সমগ্র মহাভারতীয় জাতি তাদের শত শতাব্দীর সুপ্তি থেকে, জড়তা থেকে সহসা জেগে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ছিল এই 'বন্দেমাতরম্'। এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে কত অগণিত মানুষ অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন—হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এতেই এই মন্ত্রের অমিত শক্তি সহজ অনুমেয়।

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের বেদগ্রন্থস্বরূপ 'আনন্দমঠে'র মূল শিক্ষাই হল দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ। মাতৃভূমির মাতৃমূর্তি দেশবাসীর অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে 'আনন্দমঠে'র ভবানন্দের মুখ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলালেন, "আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা-শস্যশ্যামলা,—"। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অমোঘবাণী দেশবাসীর একেবারে "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" 'আনন্দমঠে'র 'সন্তানদলে'র আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ শত সহস্র যুবক সংসার ত্যাগ করে স্বাধীনতার সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। সাংবাদিকপ্রবর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভাষায়, "মৃণ্ময়ী জননীতে চিন্ময়ী জননীর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া—বঙ্কিমচন্দ্র সেই জননীকে আনন্দমঠের মন্দিরে—ভক্তির রত্নবেদীতে নিষ্ঠার পূত গঙ্গোদকে ধৌত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং স্বয়ং মনীষার পঞ্চপ্রদীপ দেশাত্মবোধের গব্য ঘৃতে পূর্ণ করিয়া সেই দীপশিখায় মা'র আরতি করিয়াছেন। তিনি যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, তাহা জাতির হৃদয়ে নূতন শক্তির সঞ্চার করিতেছে। তাই জাতি আজ তাহার জন্মগত অধিকার লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।"

'বন্দেমাতরম্' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত। অপরাপর জাতীয় সঙ্গীত হঠাৎ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলে, বিদ্রোহী করে। 'বন্দেমাতরম্' মানুষকে আত্মিক বলে বলীয়ান্ হতে শিক্ষা দেয়, চিত্তকে পবিত্রতর, সুন্দরতর করতে সাহায্য করে। বঙ্কিমচন্দ্রই বলেছেন—'আত্মিক বল বাহুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রপূত এই আত্মিক বলের প্রভাবেই ভারত তার স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল অহিংস উপায়ে। তৎকালে প্রকাশিত ইংরেজদের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুখপত্র 'পাইওনীয়ারে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধাংশ উল্লেখ্য: "কবিতা হিসাবে ও রচনাপারিপাট্যে

'বন্দেমাতরম্' ফরাসী জাতীয় সঙ্গীতের তুলনায় অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত। 'মার্সেলজ' বিদ্রোহদ্দীপক ও শাসনশৃঙ্খলাচ্ছেদক; 'বন্দেমাতরম্' কর্মপ্রবর্তক ও ভক্তিমূলক। প্রথমটি ভাবোন্মাদনার প্রবর্তক, দ্বিতীয় ভাবপ্রবণতার নিদর্শক। প্রথমটিতে আত্মদৃষ্টি নাই, পর পরকে মাতায়—সমাজকে নাচায়—নিজের দিকে চাহে না। 'বন্দেমাতরম্' অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ; ইহার গায়ক আপনার ভাবে আপনি মুগ্ধ হইয়া মর্মের কথার পরিচয় দেন; শ্রোতা শুনিয়া নিজের দিকে চাহেন এবং নিজ কর্মহীনতার পরিচয় উপলব্ধি করিয়া মর্মান্তিক বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গায়কের সুরে সুর মিশাইয়া গান করেন। 'মার্সেলজ' শ্রোতার কর্ণে অহঙ্কারের মদিরা ধারা ঢালিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলে; 'বন্দেমাতরম্' উপাসনার—প্রার্থনার সুধায় শ্রোতৃবৃন্দকে পূত ও উন্নত করে। 'মার্সেলজে' কবির হৃদয় নাই; 'বন্দেমাতরমে' কবি যেন আপনার আত্মা ঢালিয়া দিয়াছেন। উভয়ে এত প্রভেদ। 'বন্দেমাতরম্' জাতির উদ্গত প্রার্থনা—আত্মাশক্তিকে স্বদেশের আধারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মা বলিয়া তাঁহার উপাসনা।"

ডাক্তার গ্রিয়ার্সন বিলেতে একবার এক বক্তৃতায় 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করে বলেছিলেন, "যাঁহারা ভারতবর্ষকে ভালবাসেন, যাঁহারা ভারতবাসীর কল্যাণকামী—ইংরাজ-ভারতবাসি নির্বিশেষে তাঁহারা সকলেই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন।" 'বন্দেমাতরমে্'র সার্বজনীনতা ও অমোঘতা সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমাদের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র বাংলা দেশের বন্দনার মন্ত্র নয়—এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।"

'কমলাকান্তে'র 'আমার দুর্গোৎসবে' মুক্তি-পাগল বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র জাতিকে তূর্য-নিনাদে আহ্বান জানালেন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করতে, "এসো ভাই সকল! আমারা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই! এসো, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এসো, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে'র বর্ণনায় স্বদেশপ্রীতিকে সকল ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, "আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট

কর্ম।…সর্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষা কর্তব্য।…সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি ইহা বিস্মৃত হইও না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ পুরুষ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ। ভাবীকালের মাতৃভূমির মুক্তি-সংগ্রামীদের সামনে এই শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থাপিত করে গেলেন। তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে' জাতীয়তাবোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ কৃষ্ণ মোহনমুরলীধারী গোপীজনবল্লভ কদম্বতলের নারীজনসুলভ কৃষ্ণ নয়, এ কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য ও সুদর্শনচক্রধারী বলিষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তাই তিনি বললেন, "যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনমিত করিয়া লইলাম, সেইদিন হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না। এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে।"

দেশাত্মবোধ বঙ্কিম-প্রতিভার প্রধান উৎস। তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে স্বদেশপ্রেম কথা কয়ে উঠেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায়, ধর্মতত্ত্বের বিচারে, সাহিত্যসৃষ্টির অপূর্ব উন্মাদনায় —যৌবনের স্বপ্নে, প্রৌঢ়ের কর্মজিজ্ঞাসায়, বার্ধক্যের স্মৃতি-কল্পনায়—দেশপ্রেম তাঁকে অভিভূত করেছিল। এদেশ যেন কোনো কল্পিত দেবতা নয়—এ যেন সাকার বিগ্রহ। কত ভাবে, কত প্রসঙ্গে যে তিনি এই গভীর চেতনা ব্যক্ত করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

দেশপ্রেমের কূলপ্লাবী প্রবল প্লাবনে বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র দেশকে পরিপ্লাবিত করে ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল (২৬শে চৈত্র ১৩০০) ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন। কিন্তু জাতীয়তার মন্ত্রগুরুরূপে তিনি জাতির হৃদয়-সিংহাসনে চির অমর, চির ভাস্বর হয়ে বিরাজ করলেন। তাঁর 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র বিরাট মহাভারতীয় জাতিকে অনন্তকাল ধরে অফুরন্ত প্রেরণা যোগাবে। বিপ্লবী অরবিন্দের ভাষায়, "যাহাই কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত বা রক্ষা হউক না কেন বঙ্কিমের খ্যাতি কখনো বিনষ্ট হইতে পারে না।…ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যে দিন বিচার করিবে সেদিন তাহারা সংকীর্ণচেতা কোনো সমাজ-সংস্কারক কিংবা ভাগ্যান্বেষী কোনো রাজনৈতিককে ভারতের স্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিবে না—স্বীকার করিবে সেই মহানচেতা বাঙালীকে যিনি নিঃশব্দে নিভৃতে প্রকৃতির মতো নিঃস্বার্থ হৃদয়ে পরম সৃষ্টির সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন।…যিনি একটি ভাষা, সাহিত্য ও জাতি গড়িয়া গিয়াছেন—সেই বঙ্কিমচন্দ্রকে।"

বিদ্রোহী ব্রহ্মানন্দ

কেশবচন্দ্র সেন

রামমোহন উদ্ভাবিত ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মকে স্বাধীনতা ও মানবতার মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তাই বাংলা তথা ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের স্থান অতি উচ্চে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেশের নবজাগরণের প্রাণ-পুরুষ ছিলেন কেশবচন্দ্র। তিনিই সেদিন তরুণ বাংলার ললাটে জাতীয়তার রাজতিলক এঁকে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সত্য ও স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর প্রায় দু'যুগ ধরে মনস্বী কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই এই দেশের জাতীয় জাগরণ শক্তি সঞ্চয় করছিল। তাঁর প্রতিভামুগ্ধ বঙ্গদেশে সেদিন জাতীয়তার প্রাণবন্যা বয়ে গিয়েছিল।

কেশবচন্দ্র ধর্মপ্রবক্তা হিসাবেই দেশের নিকট সবিশেষ পরিচিত। কিন্তু জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর দান অসামান্য। সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা, সেবা, নীতি ও রাজনীতি—জাতীয় জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রেই কেশবচন্দ্রের প্রতিভার সমুজ্জ্বল স্বাক্ষর বর্তমান। কেশবচন্দ্র রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসাধক। রামমোহন যে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয়তার উদ্বোধন করেছিলেন, কেশবচন্দ্র তাকে পরিপূর্ণ রূপ দান করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'নববিধানে'র মধ্য দিয়েই তিনি দেশের জাতীয় জীবনে এক নতুন শক্তির সঞ্চার করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিরাট বিপ্লবী পুরুষ।

একুশ বছর বয়সে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। রামমোহন এদেশে ব্রাহ্মধর্মের যে বীজ বপন করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় তা অঙ্কুরে পরিণত হয়। আর কেশবচন্দ্র তাকে ফলে-ফুলে বিকশিত করে তুলেন। যে ব্রাহ্মধর্ম এদেশে নবযুগের বার্তা বহন করে এনেছিল, কেশবচন্দ্র ছিলেন তার ধারক ও বাহক।

ধর্মহীন, নীতিহীন ও জাতীয়তাহীন শিক্ষার ফলে তরুণদের মধ্যে যে হীনাবস্থা দেখা দিয়েছিল তার প্রতিকারের প্রচেষ্টায় কেশবচন্দ্র কতকগুলি পুস্তিকা প্রণয়ণ ও প্রচার

করেন। তাঁর মতে স্বাধীনতাপ্রিয়তাই জীবনের প্রধান ধর্ম। কেশবচন্দ্র তাঁর 'জীবনবেদ' পুস্তিকায় বললেন, "আমি দাসত্ব সহ্য করিতে পারিতাম না; এখনও পারি না।...আমার অস্ত্র অধীনতা কাটিবার জন্য সততই চক্‌মক্‌ করিত।...অধীনতা দেখিলেই আমি উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম।...মানুষকে ঈশ্বর স্বাধীনতা দিলেন, আর সেই মানুষ পৃথিবীর বাজারে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া পৃথিবীর পাপের নিকট পরাস্ত হইয়া চীৎকার করিতেছে।...দাস হওয়াই পাপ। দাসত্ববিধি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একেবারে পোড়াইয়া মারিতেছে। হা বিধাতঃ! স্বাধীনতা যে মুক্তি, অধীনতা যে নরক। স্বাধীনতার জয়-পতাকা উড়াইয়া অধীনতার দুর্গকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইবে।" কেশবচন্দ্রের স্বাধীনতার এই বাণী সেদিন পরাধীনতার জ্বালাজর্জরিত বাঙালীর অন্তরে আশার আলো জ্বালিয়েছিল। তাঁর লিখিত প্রবন্ধাবলী, তাঁর বক্তৃতা এবং জীবনযাপন প্রণালী বাঙ্গালী জাতিকে জাতীয়তার প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছিল।

সৌভ্রাত্র, সদ্ধর্ম, নৈতিকতা, জাতীয়তা ও স্বাধীনতার বাণী প্রচারের জন্য কেশবচন্দ্র তরুণদের নিয়ে 'সঙ্গত সভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের এই 'সঙ্গত সভার' প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। "তাঁহার হৃদয়ের স্বর্ণপাত্রে যে অগ্নি ছিল, তাহারই উত্তাপ পাইয়া এই সব তরুণদের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।"

কেশবচন্দ্রের অসামান্য মনীষা এবং ধর্মের প্রতি গভীর নিষ্ঠা দেখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদে বরণ করেছিলেন। আর ব্রহ্মে প্রগাঢ় প্রীতি দেখে তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সেই থেকে কেশবচন্দ্র 'ব্রহ্মানন্দ' কেশবচন্দ্র সেন নামে সুপরিচিত।

কেশবচন্দ্র ১৮৬৬ সালে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করলেন। ধর্মের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-প্রচার ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। মাতৃভূমি ভারতের কল্যাণসাধনই ছিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মূল লক্ষ্য। সারা ভারতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য কেশবচন্দ্র মাদ্রাজ, বোম্বাই, পুণা প্রভৃতি বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্ব ভারতীয় ঐক্যের কথাও প্রচার করেছিলেন। সমগ্র দেশকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এক জাতি, এক প্রাণ, একতার তিনিই উদ্গাতা। আজ যে আমরা জাতীয় সংহতির কথা বলি, একশ' বছর আগে কেশবচন্দ্র সেই সংহতি সাধনের প্রয়াস করেছিলেন।

কেশবচন্দ্রের পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম ধর্মমাত্রেই পর্যবসিত ছিল। সমাজ-সংস্কারের বিশেষ কোনো চেষ্টা হয় নি। তিনি ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে ধর্মীয় ও সামাজিক নানা পরিবর্তনসাধন

করেন। প্রথমেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা তুলে দেন, উপবীত ধারণ নিষিদ্ধ করেন। কেশবচন্দ্রের সংস্কৃত ব্রাহ্মসমাজই দেশে জাতীয়তা, প্রগতি ও স্বাধীনতার অগ্রদূত। ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি প্রচলনের চেষ্টা করেন। নিজের কন্যাকে তিনি অসবর্ণ বিবাহ দেন। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবাবিবাহের তিনি ছিলেন পূর্ণ সমর্থক। সমাজ-সংস্কারমূলক কাজের জন্য ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" গঠন করেন। দেশের নব্যশিক্ষিত প্রগতিশীল সমাজ এর অনুগামী হয়। কেশবচন্দ্রের এই নতুন সমাজের মূলমন্ত্র ছিল সত্য ও স্বাধীনতা। ধর্মের, শাস্ত্রের, সমাজের বা পুরোহিতের অধীনতা স্বীকার না করে আপন বিবেক বুদ্ধির কষ্টিপাথরে সব কিছু বিচার করে প্রতিষ্ঠিত সত্যকে স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে শেখানই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, "কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের বাইরেও এই সংগ্রাম ঘোষণা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু নানা দিক দিয়া অপরোক্ষভাবে স্বদেশের আত্মমর্যাদাবোধ জাগাইয়া তুলেন।"

কেশবচন্দ্র সর্বাধিক দৃষ্টি দিয়েছিলেন শিক্ষা-সংস্কার ও শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি। কারণ, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে জনগণ শিক্ষিত না হলে জনজাগরণ অসম্ভব। শিক্ষা যাতে জাতীয় চরিত্র গঠনের সহায়ক হয় সেজন্য তিনি একটি সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। স্ত্রী-শিক্ষার উপরও তিনি সমধিক জোর দেন। ব্রাহ্মসমাজকে তিনি এ বিষয়ে অগ্রণী হতে অনুরোধ করে বলেছিলেন, "ব্রাহ্মধর্মের জ্যোতি থাকিতেও আমরা নিরুৎসাহ ও নিস্তেজ থাকিব, এমন কখনই হইতে পারে না। সকলে উত্থান কর, সকলে আপন আপন সাহায্য দান করিয়া দেশস্থ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিদ্যার আলোক প্রচার করিতে তৎপর হও।" তিনি নিজে "ক্যালকাটা কলেজ" স্থাপন করেছিলেন তরুণদের জাতীয়ভাব বৃদ্ধি করার জন্য।

কেশবচন্দ্রের আর এক অবিস্মরণীয় অবদান দেশবাসীকে আর্তমানবের সেবায় উদ্‌বুদ্ধ করা। সর্বভারতীয় সমাজ সেবার আদর্শের প্রথম উদ্বোধক কেশবচন্দ্র। তিনিই সেদিন দেশের তরুণদের সামনে মানব সেবার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছিলেন। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ এই আদর্শকে সমগ্র দেশের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রই নবীন বাঙালীকে জনসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করে গিয়েছেন। সমাজ-সংস্কার, সংগঠন ও জাতীয়ভাব প্রচারে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' নামে একটি ইংরেজী পত্রিকা এবং 'সুলভ সমাচার' নামে একটি বাংলা পত্রিকা ছিল কেশবচন্দ্রের প্রধান

হাতিয়ার। বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাসে জনমতগঠনে এই পত্রিকাদ্বয়ের দান অসামান্য। "বলিতে কি, 'মিরার' তাঁহার হস্তে যেন একখানি শাণিত অস্ত্র-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।" 'সুলভ সমাচার' সম্বন্ধে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, "সাধারণ লোকের মনে ঐ 'সুলভ সমাচারে'র ভিতর দিয়ে কেশবচন্দ্র এদেশে রাজনৈতিক বিপ্লবের সূত্রপাত করলেন।"

কেশবচন্দ্রের সমস্ত কার্য, চিন্তা ও পরিকল্পনার কেন্দ্র ছিল ভারতবর্ষ। যা কিছু কল্যাণকর পরিকল্পনা তিনি নিয়েছিলেন তা সমগ্র ভারতের জন্যই। ভারতবর্ষই ছিল তাঁর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার কেন্দ্রবিন্দু। তাই তিনি তাঁর সংগঠিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নামের পূর্বে সর্বভারতের আদর্শে 'ভারতবর্ষীয়' নাম ব্যবহার করেছেন। যেমন, তিনি তাঁর মতবাদ ও সংবাদ প্রচারের জন্য যে কাগজ বার করলেন তার নাম দিলেন—'ইণ্ডিয়ান মিরার'; ধর্মপ্রচারের জন্য নতুন যে সমাজ স্থাপন করলেন তার নাম দিলেন—'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। সমাজ-সংস্কারের জন্য নতুন সমিতি গঠন করে নাম দিবেন—'ইণ্ডিয়ান রিফর্মস্ এ্যাসোসিয়েসন' বা 'ভারত সংস্কার সভা'। সমগ্র ভারতবর্ষকে তিনিই প্রথম স্বদেশ বলে চিনতে শিখিয়েছিলেন।

ব্রাহ্ম হলেও কেশবচন্দ্র নিজেকে কোনো ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করেন নি। তিনি নিজেকে ভারতবাসী বলেই পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। তিনি নির্ভীক কণ্ঠে বলতেন, "আমি হিন্দু নই, আমার একটিমাত্র পরিচয়ই আছে, আমি ভারতবাসী।" কেশবচন্দ্রের সর্বভারতীয় চিন্তা ভারতের নবজাগরণকে বেগবান করেছিল। তিনিই সর্বভারতীয় জাতীয়তার উদ্বোধক।

সর্বধর্ম সমন্বয় করে কেশবচন্দ্র এক মহামানব সমাজের কল্পনা করেছিলেন। সে সমাজের উদ্দেশ্য ছিল—এক ঈশ্বর, এক বিধান এবং এক সমাজ। এর নাম দিয়েছিলেন 'নববিধান'।

রামমোহনের পরে কেশবচন্দ্রই জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার প্রবক্তা। কেশবচন্দ্র সমস্ত মানব জাতির মহামিলন প্রার্থনা করতেন। তিনি সমস্ত ধর্মের মিলন এবং এশিয়ার মুক্তি কামনা করতেন। তিনি বলেছিলেন, "এশিয়ার আমি পক্ষ সমর্থক সন্তান। এশিয়ার দুঃখ আমার দুঃখ, তাহার আনন্দ আমার আনন্দ। এই ওষ্ঠাধর এশিয়ার পক্ষ সমর্থন করিবে। বিশ্বস্ত অনুগত দাস—অনুরক্ত পুত্রের ন্যায় অমি আমার পিতৃভূমির সেবা করিব।" স্বজাতি-প্রেমিক কেশবচন্দ্র জাতীয় সংকীর্ণতার বহু উর্ধে উঠে বিশ্বপ্রেমিক হয়েছিলেন।

কেশবচন্দ্র তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা, মনীষা ও পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রাচ্য

সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মপ্রচার এবং ভারতের নানা সমস্যার প্রতিকারের দাবী নিয়ে তিনি ১৮৭০ সালে বিলেত যান। সেখানে তিনি বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন। বহু সভাসমিতি করে তিনি সর্বত্র ঘোষণা করেন, "প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জ্ঞানে ভারত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ।" বিলেতে তৎকালীন বহু মনীষীর তিনি শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন। মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে তাঁর রাজপ্রাসাদে অভ্যর্থনা জানান। কেশবচন্দ্র অত্যন্ত নির্ভীকচিত্তে ভারতের নানা অভাব-অভিযোগ ও অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার দাবী করেছিলেন। ফলে ভারতের ইংরেজ শাসনের অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। কেশবচন্দ্রের পূর্বে একমাত্র রামমোহনই এই ধরনের দাবী ইংলণ্ডে উত্থাপন করেছিলেন। 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্তব্য' অভিভাষণে কেশবচন্দ্র বলেছিলেন, "বিশ্বাসের উপরই তোমরা ভারতবর্ষকে ধারণ করিয়া আছ। তোমাদের একথা বলিবার অধিকার নাই যে ঈশ্বর-প্রদত্ত ভারতের ধন-সম্পদ তোমরা কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও উপভোগের জন্যই ব্যবহার করিবে।" ইংলণ্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের দাবী এমন বলিষ্ঠভাবে এর আগে আর কেউ বলেন নি। ইংলণ্ডের সমস্ত পত্রপত্রিকায় তাঁর এই বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছিল এবং ইহা জনচিত্তকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্তব্য' বক্তৃতাটি আধুনিক ভারতের জাতীয় ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকবে। এই বক্তৃতা কেশবচন্দ্রের সুগভীর স্বদেশপ্রীতি, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও স্বাধীনচিত্ততার এক অপূর্ব নিদর্শন। বিপিনচন্দ্র বলেছেন, "আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার হরিদ্বারে কেশবচন্দ্রকে দেখিতে পাই।"

'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্তব্য' অভিভাষণটি ভারতের ইংরেজ রাজপুরুষরা সুনজরে দেখে নি। তারা এর মধ্যে বিদ্রোহের সন্ধান পেল। তারা এক ফতোয়া জারী করে বলল, "যদি কোনো দেশীয় লোক কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতা আবৃত্তি করে, তবে তাকে চাবুক মারা হবে।" ইংরেজ রাজপুরুষদের এই হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সেদিন কেশবচন্দ্র বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "যদি ইংলণ্ড স্থির করে থাকে যে সে ভারতের জনগণের স্বার্থে নয়, শুধু ম্যাঞ্চেস্টার ও ইংলণ্ডের বণিকসমাজের স্বার্থেই ভারত শাসন করবে, তাহলে আমি বলি, এই মুহূর্তেই বৃটিশ শাসন নিপাত যাক্।" সেই যুগে এমন চরম কথা বলার দুঃসাহস আর কারুর ছিল না। পরবর্তীকালে একমাত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যেই এই ধরনের দৃঢ়তা দেখতে পাওয়া যায়। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়, "রাষ্ট্রীয় বন্ধনের বেদনা তখনও জাগে নাই, সুতরাং রাষ্ট্রীয় মুক্তির বাসনাও প্রবল হয় নাই। তবে এই সাধনার পূর্ব অবস্থা কেশবচন্দ্র অনেকটা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বাজাত্যের গৌরববোধ নানাদিক দিয়া তিনি জাগাইয়া তুলেন।"

কেশবচন্দ্রের এত তেজ, এত উৎসাহ, উদ্দীপনার উৎস কি ? এসবের উৎস তাঁর 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা'। তাঁর নিজের ভাষায়, "বাল্যাবধি আমি অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, অগ্নিমন্ত্রের পক্ষপাতী। অগ্নির অবস্থাকে পরিত্রাণের অবস্থা মনে করি। অগ্নিমন্ত্র কি ? শীলতা, অলসতা, ভীরুতা প্রভৃতি লক্ষণগুলির বিপরীত দিকে যা কিছু দেখিতে পাও, তৎসমুদায় অগ্নি। এ জীবনে উৎসাহ উদ্যমের অগ্নি ক্রমাগত জ্বলিতেছে···উত্তাপের অর্থই জীবন। উত্তাপের বিপরীতই মৃত্যু।" এই উত্তাপের বলেই কেশবচন্দ্র এত তেজস্বী ও স্বাধীনতাপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সমগ্র জাতির জীবনেও তিনি এই উত্তাপ সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্রের ভাষায়, "ভারতের বিশেষতঃ বাংলার বর্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে ইহার মূলে একরূপ প্রথম শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুরূপে কেশবচন্দ্রকে দেখিতে পাই।"

ন্যাশন্যাল নবগোপাল মিত্র

এদেশে দেশবাসীগণের মধ্যে জাতীয়ভাব উন্মেষের জন্য নবগোপাল মিত্র মহাশয়ই সর্বপ্রথম বাস্তবপন্থা অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর এবিষয়ে প্রেরণার উৎসমূল ছিলেন তৎকালীন বাংলার দু'জন মহামান্য মনীষী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঋষি রাজনারায়ণ বসু।

নবগোপাল মিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানবার উপায় নেই। তবে যতদূর জানা যায়, তিনি কোন্নগরের মিত্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিন্দুস্কুলে অধ্যয়ন শেষ করে আইন পড়েন এবং পরে মোক্তারী করতেন। এই সময় তিনি প্রায়ই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে যাতায়াত করতেন। ফলে দেবেন্দ্রনাথ, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর কর্মদক্ষতা ও চরিত্রগুণে দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। নবগোপাল দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজের হ'য়ে নানা কাজকর্মও করতেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারই এদেশে স্বদেশীমন্ত্র প্রচারের প্রধান ও আদি উৎস। এঁদের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাই এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। আর ঠাকুর পরিবারের এই স্বাদেশিকতার মূলে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তিনি ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং স্বাদেশিকতা প্রচারের জন্য একটি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবং নবগোপাল মিত্রকে পত্রিকা প্রকাশের উপযুক্ত ব্যক্তি স্থির করে তাঁকে সম্পাদক পদে নির্বাচিত করেন। নবগোপাল ঐ পত্রিকার নামকরণ করেন 'ন্যাশন্যাল পেপার'। নবগোপালের সুযোগ্য পরিচালনায় পত্রিকাটি জাতীয়তার মন্ত্র প্রচারের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠে।

ঋষি রাজনারায়ণের দ্বারাও নবগোপাল যথেষ্ট প্রভাবিত হন। রাজনারায়ণ যে মহাহিন্দুসভা প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন, নবগোপাল কতকটা তাঁরই অনুসরণে হিন্দুমেলা বা জাতীয়মেলা প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বাদেশিকতা প্রচারে উদ্যোগী হন। এই হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠাই নবগোপালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

১৮৬৭ খৃস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল চৈত্র-সংক্রান্তিতে আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার ডন্‌কিন্ সাহেবের বাগান বাড়ীতে সর্বপ্রথম এই মেলা বসানো হয়। চৈত্রমাসে এই মেলা বসত বলে ইহা চৈত্রমেলা নামেও পরিচিত। মেলা প্রতিষ্ঠায় নবগোপালের প্রধান সহায়ক ছিলেন ঠাকুর পরিবার। বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং গণেন্দ্রনাথ। প্রথম বছর এই মেলার আয়োজন ছিল যৎ সামান্য। পরের বছর থেকে অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে এই মেলার অধিবেশন চলতে থাকে। এই মেলা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কুটিরশিল্প, চারুশিল্প ও কৃষির উন্নয়ন, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির উন্নতিসাধন, ব্যায়াম চর্চার দ্বারা শারীরিক উৎকর্ষসাধন ও জাতীয় আচার-আচরণ প্রভৃতি দেশীয়ভাবের পুনরুত্থান দ্বারা জাতীয়তার প্রচার করা। এবং পরিশেষে পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এক কথায় আত্মসচেতনতা ও আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। গণেন্দ্রনাথ ছিলেন এই মেলার সম্পাদক। মেলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন, "এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্র হওয়ার ফলে যদ্যপি আপাততঃ কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলিত ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। একদিন কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশোনা হওয়াতে অনেক সৎকর্ম সাধন, উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দুমেলা ও ইহা হিন্দুদিগের জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম কর্মের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারতভূমির জন্য।
ইহার আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর।...ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মানুষ নহি? মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে? অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।"
প্রতিবারেই মেলায় একটি করে প্রদর্শনী খোলা হত। ঐ প্রদর্শনীতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কুটির শিল্পজাত দ্রব্য, কৃষিজাত দ্রব্য, তাঁত, চরকা, মহিলাদের নানারকম সূচীশিল্প, চিত্রকলা ইত্যাদি সংগ্রহ করে প্রদর্শিত হত। যে সব জিনিস ভালো বিবেচিত হত তাদের পুরস্কার দেওয়া হত। শরীর চর্চায় উৎসাহিত করার জন্য

নানা প্রকার ব্যায়াম প্রদর্শিত হত এবং কুশলী ক্রীড়াবিদ্‌রা পারিতোষিক পেত। জাতীয় ভাবমূলক সঙ্গীত, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ হত। এবং উৎকৃষ্ট রচনাসমূহকে পুরস্কার দেওয়া হত। এছাড়া, জাতীয়ভাব প্রচারক নানা উদ্দীপনামূলক বক্তৃতাদি দেওয়া হত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের দ্বারা। বাংলার নবজাগরণে ও জাতীয়তার নবমন্ত্রে উদ্‌বোধিত হবার জন্য নবগোপাল মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই 'হিন্দুমেলা' বা 'জাতীয়মেলা'র অপরিসীম অবদান সম্বন্ধে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা…নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় মেলা' ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। বঙ্গ সমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা; কারণ, সেই যে বাঙালীর মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে, তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।"

১৮৬৮ সালের দ্বিতীয় অধিবেশনে হিন্দু মেলার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতসঙ্গীত' নামে একটি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করে পাঠান। সঙ্গীতটির প্রথমাংশ এইরূপ :

"মিলে সব ভারত সন্তান, একতান একপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান ॥
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী ;
শতখনি রত্নের নিধান ॥
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়
গাও ভারতের জয় ॥

এই সঙ্গীতটি অধিবেশনে পাঠ করা হলে উপস্থিত ব্যক্তিদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। এ সম্বন্ধে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় মন্তব্য করেছিলেন, "এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা

সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

এই মেলা উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও একটি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। যেমন:

"মলিন মুখ-চন্দ্রমা, ভারত তোমারি,
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি।" ইত্যাদি ইত্যাদি

১৮৭০ সালে হিন্দুমেলার চতুর্থ অধিবেশনের পর নবগোপাল মিত্র "ন্যাশন্যাল সোসাইটি" বা "জাতীয় সভা" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিমাসে এই সভার একটি করে অধিবেশন বসত। তাতে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, শিল্পাদির নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও বক্তৃতাদি হত।

১৮৭২ সালের এপ্রিলে নবগোপাল একটি "ন্যাশন্যাল স্কুল" বা "জাতীয় বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে সঙ্গীতচর্চা, ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, বন্দুক চালনা, চিত্রাঙ্কন, কারিগরি, জরিপ, বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮৭২-এর হিন্দুমেলার ষষ্ঠ অধিবেশনে মনোমোহন বসু একটি তেজোদৃপ্ত ভাষণ দেন: "ওহে অহংবাদি সভ্যতাভিমানী নববঙ্গ! তোমরা কিসের বড়াই করিয়া বেড়াও?…তোমাদের পূর্বপুরুষ অপেক্ষা তোমরা উন্নত হইয়াছ, একথা কোন্ সাহসে ব্যক্ত কর। যে ইংরাজ জাতির দ্বারা এই সকল কার্য্য হইতেছে ইহা তাহাদের উন্নতি, তোমাদের কি? শ্রীফল পক্ক হইলে বায়সের কি?

বৃথা অভিমান, অনর্থ গর্ব, সর্বনাশক ইন্দ্রিয় শক্তির বশীভূত আর থাকিও না। স্বদেশানুরাগকে তোমাদের পথ-প্রদর্শক কর…তোমাদের প্রতি তোমাদের অভাগ্যবতী জননীর অধিক আশাভরসা।…আর ঔদাসীন্য নিদ্রায় অচেতন রহিও না; জননীর দুঃখাবর্জনে আর বিলম্ব করিও না; জাগরূক হও—উত্থান কর—চক্ষুরুন্মীলন কর—পবিত্র প্রতিজ্ঞাজলে অভিষিক্ত হও—…চাহিয়া দেখ প্রভাত হইয়াছে।…হিমাচলের পবিত্র গিরিগুহা হইতে প্রতিধ্বনিত হোক "জয় জয় জয়।"

১৮৭৪ সালে নবগোপাল মিত্র নিজেই হিন্দু মেলার সম্পাদক হন। স্বাদেশিকতা প্রচারে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা ঐ সময় নানা পত্র-পত্রিকায় অজস্র প্রশংসার সঙ্গে উল্লিখিত হয়। প্রসিদ্ধ স্বদেশী নাট্যকার ও কবি মনোমোহন বসু হিন্দু মেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর সম্পাদিত "মধ্যস্থ" নামক পত্রিকায় লিখলেন, "সমাজের যতদূর বিশৃঙ্খলা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে। এই দুরবস্থা চাক্ষুষ করিয়া কোন্ চিন্তাশীল হিন্দু স্থির

থাকিতে পারে? কোন্ সুশিক্ষিত স্বদেশবৎসল মন প্রতিবিধানে অগ্রসর না হইয়া স্বীয় ধর্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনা ও ধিক্কারে বধির থাকিতে পারে? যে সকল মহাশয়গণের এরূপ উন্নত মন—যে সকল হিন্দুকুলোদ্ভব মহাত্মাগণ এইরূপ চিন্তাশীল, তাঁহারাই এই 'চৈত্রমেলা' নামা হিন্দুসমাজ বন্ধনের অদ্বিতীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শিমুলিয়াবাসী গুণরাশি, নির্মৎসর, অধ্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র সর্বাগ্রগণ্য। যে সকল গুণ দ্বারা বহুজনসাধ্য বৃহৎ কাণ্ডের আবিষ্কর্তা ও নিয়ন্তা হওয়া সম্ভব, তাঁহাতে সে সমস্ত গুণ সর্বতোভাবে বিদ্যমান আছে। সেই মহৎ গুণাবলীর শৃঙ্খলে অন্যান্য স্বদেশহিতৈষী মহাশয়েরা আবদ্ধ রহিয়া মধুমক্ষিকার ন্যায় অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে স্বদেশের সৌভাগ্য মধুচক্র একখানি রচিত করিয়া তুলিতেছেন। অত্র বঙ্গদেশে বাবু নবগোপাল মিত্রই জাতীয়ভাবের প্রথম ভাবুক ও প্রধান প্রচলনকর্তা। তিনি বিদ্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই—তদবধি একাল পর্য্যন্ত ঐ পবিত্রভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া সমাজের অবস্থা, বান্ধবমণ্ডলীর সাহায্য ও স্বীয় বহুদর্শনজনিত জ্ঞানানুসারে সেই ভাবের রূপান্তর ও উন্নতি যখন যেমন হউক, কিন্তু অনন্যকর্মা ও অনন্যভাবুকরূপে অবিচলিত চিত্তে দৃঢ় অধ্যবসায় সহযোগে সেই পথের পথিক ও সেই পবিত্র ব্রতের ব্রতী হইয়া আসিতেছেন। কিসে স্বীয় পৈতৃক সমাজ প্রকৃত সামাজিকতা, প্রকৃত জাতীয়ভাব, প্রকৃত স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত হইবেন—কিসে তাহাদিগের ভীরুতা ও স্বার্থপরায়ণতা অপগত হইবে—কিসে তাহারা অপর জাতীয়ের নিকট পূর্ববৎ হেয় পদার্থ না থাকিয়া সভ্যসমাজের পাঁচটার মধ্যে একটা হইতে পারিবে, তিনি এই চিন্তাতেই নিমগ্ন মহাত্যোগেই ব্যাপৃত—এই অনুষ্ঠানেই কাল কাটাইতেছেন। তাঁহার মুখে 'জাতীয় জাতীয় জাতীয়'। তাঁহার সকল কার্যে 'জাতীয় জাতীয় জাতীয়'। তাঁহার প্রচারিত সংবাদপত্রের নাম 'জাতীয়'। তাঁহার যত্নে স্থাপিত সভার নাম 'জাতীয়'। বিদ্যালয়ের নাম 'জাতীয়'। ব্যায়ামশালার নাম 'জাতীয়'। মেলার নাম 'জাতীয়'। তিনি জাগ্রত অবস্থায় 'জাতীয়' লইয়া বিব্রত। তিনি সুপ্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন 'জাতীয়'। তিনি জাগ্রত 'জাতীয়'।"
জাতীয় জাতীয় করে নবগোপাল পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য লোকে তাঁকে বলত "ন্যাশন্যাল নবগোপাল"। বাস্তবিকই জাতীয়তার জন্য এমন নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ আর দেখা যায় না। হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবাসীর মনে প্রথম জাতীয়ভাবোধ জাগ্রত করতে সমর্থ হয়েছেন।

নবগোপালের 'জাতীয় মেলা'র আদর্শ কেবল ক'লকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং আপামর জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়ভাব প্রচারে সহায়তা করেছে।

শুধু জাতীয় মেলা করেই নবগোপাল ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় আরও বহু ক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছেন। এ দেশের ব্রিটিশ শাসক বাঙালীদের সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে দিত না। এই নিয়ে বাঙালীদের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। নবগোপালের নেতৃত্বে বাঙালীর সামরিক বাহিনীতে যোগদানের আন্দোলন সুরু হল। তিনি ১৮৭৪ সালের ১লা জুন টাউন হলে একটি বক্তৃতা দিলেন। এ সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা লেখেন,

"...টাউন হলে আমাদের দেশহিতৈষী বাবু নবগোপাল মিত্র একটি অপূর্ব বক্তৃতা করিয়াছেন।...ইনি সেই মহাপুরুষ যিনি দেশ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আপনার প্রাণপণ করিয়াছেন।...নবগোপালবাবু তাঁহার বক্তৃতায় নানারূপ উদাহরণ ও যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে আমাদের দেশীয়রা যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছেন, যদি গভর্নমেন্ট ইহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেন তাহা হইলে ইঁহারা সমরেও বিখ্যাত হইতে পারেন।...তিনি বিশ্বাস করেন যে এ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে কোনরূপ বিক্রম দেখাইতে পারি নাই সে আমাদের দোষ না। ইংরেজ যে আমাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেন না ইহা কেবল সেই নিমিত্ত।"

১৮৭২ সালে কলকাতায় 'রঙ্গমঞ্চ' বা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কথা উঠে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি তার উদ্যোক্তা। নবগোপালের ধারণা জন্মাল যে 'রঙ্গমঞ্চ'ও জাতীয়তা মন্ত্র প্রচারের একটি বিশেষ হাতিয়ার হতে পারে। তাই তিনি এর সমর্থক হলেন। এবং তাঁর উপদেশানুসারে ঐ রঙ্গমঞ্চের নাম হ'ল 'জাতীয় রঙ্গমঞ্চ' বা 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার'।

এই সময় অনেক নাটক লেখা হয়। মনোমোহন বসু কয়েকটি জাতীয়-ভাবোদ্দীপক নাটক লেখেন। এ বিষয়ে তাঁর হরিশ্চন্দ্র নাটক উল্লেখযোগ্য। এতে তখনকার অত্যাচারী রাজশাসন এবং দেশের সমস্যা নিয়ে দু'টি গান রচনা করেন। যেমন :

(১) দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনুক্ষীণ!
...ইত্যাদি ইত্যাদি

(২) নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ঙ্কর!
দে কর, দে কর, রব নিরন্তর করের দায় অঙ্গ জর জর!
...ইত্যাদি ইত্যাদি

মেলার সপ্তম অধিবেশনে (১৮৭৩ সাল) জাতীয় নাট্যশালার অভিনেতৃগণ 'ভারত মাতার বিলাপ' নামক একটি স্বদেশী রূপক নাটকের অভিনয় করেন।

হিন্দুমেলার অধিবেশনসমূহে পাঠ করার জন্য বহু স্বদেশী কবিতা রচিত হয়েছিল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত একটি কবিতার কিয়দংশ এইরূপ :

"লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।
লুটিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥" ইত্যাদি

অজ্ঞাতনামা আরও কয়েক ব্যক্তির কবিতাসমূহের কিয়দংশ করে উদ্ধৃত করা গেল :

(১) সতত রত হও যতনে, দেশহিত সাধনে
একমত ভাব ধরি, একতানে।"

২) "কবে উদিবে সৌভাগ্য ভানু ভারতবরষে।
পোহাইবে দুঃখনিশা প্রভাত পরশে॥"

(৩) "ছাড় হে অসার অলস, প্রস্তুত হও লভিতে যশ!
সাধন কর ভারতের, উন্নতি জনসমাজে।"

হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে (১৮৭৭ সালে) রবীন্দ্রনাথও একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। তখন তিনি ছিলেন মাত্র ষোল বছরের বালক। তাঁর সেই কবিতা শুনে বহু ব্যক্তির চোখে জল এসেছিল।

কিয়দংশ এইরূপ :

"দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।"

নবগোপাল মিত্র এদেশে সার্কাস খেলাও সুরু করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "'কতকগুলো 'মড়া-খেগো' ঘোড়া লইয়া, নবগোগাল বাবুই সর্বপ্রথম বাঙালী সার্কাসের সূত্রপাত করেন।"

দশ বার বছর হিন্দুমেলা সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হওয়ায় উহা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসে। এদিকে নতুন নতুন জাতীয় সংস্থা গড়ে উঠতে থাকে জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার জন্য। যেমন 'ইণ্ডিয়ান লীগ' ও 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রভৃতি। নবগোপালও এসব সভার উদ্যোগী সদস্য হয়েছিলেন। বাস্তবিকই জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য ভারতবর্ষ নবগোপাল মিত্রের নিকট এক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

জাতীয়মন্ত্রের উদ্বোধক নবগোপাল মিত্র সম্বন্ধে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন : "নবগোপাল বাবু ঘোরতর ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ছিলেন, এবং কি উপায়ে ভারতবর্ষ অনতি-বিলম্বে ব্রিটিশের শৃঙ্খলমুক্ত হয়, অহর্নিশ তাহারই ধ্যান করিতেন। ভারতবর্ষ বাহুবলে ইংরাজের নিকট হটিয়া গিয়াছে, তাঁহার এই ধারণা ছিল। সুতরাং ইংরাজ তাড়াইতে হইলে এই বাহুবলেরই ভজনা করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার স্বাদেশিকতার মূলমন্ত্র ছিল।"

বাংলার নবজাগরণে
মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন

বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার নবজাগরণের উষালগ্নে যে-সব সাহিত্য-সাধক তাঁদের সাহিত্য সাধনার দ্বারা দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন করেছিলেন বাণীর বরপুত্র মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁদের মধ্যে এক বিশিষ্ট ও গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছেন। বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরেই নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব।

শৈশবাবস্থা থেকেই কবিতার প্রতি নবীনচন্দ্রের গভীর অনুরাগ ছিল। ছাত্রজীবনে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুকরণে কবিতা লিখতেন। ছাত্রজীবনের পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়ে তাঁকে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত থাকতে হত। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-সাধনা ছিল অব্যাহত। যশোহরে অবস্থানকালে নবীনচন্দ্র অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত ভ্রাতৃদ্বয় শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষের সাহচর্য লাভ করেন। তাঁদের প্রভাবে কবিচিত্তে স্বাদেশীকতার বীজ উপ্ত হয়। জাতির নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধঃপতনে তিনি অন্তরে অত্যন্ত বেদনা বোধ করতেন। সর্ববিধ অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার থেকে জাতির মুক্তিলাভই ছিল তাঁর নিকট একান্ত কাম্য। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী'। এতে তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক কতকগুলি কবিতা ছিল। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে :

"ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর
কেন পড়িলাম? আহা কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়? আর্যবংশ কীর্তিচয়—
কেন দেখিলাম আহা, কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর?"

'অবকাশরঞ্জিনী'র 'স্বায়ং চিন্তা' কবিতায় কবি নবীনচন্দ্র স্বদেশের ভাগ্য বিপর্যয়ে বিষণ্ণবোধ করে লিখলেন,

"স্বদেশের রাজনীতি, শাসন প্রণালী,
কেবা রাজা, কিবা জাতি, কোথায় বসতি
কেমনে ভারতে পশি, দাসত্বে করিল মসি
আর্য-সুত-বীর্যভানু পতঙ্গ যেমতি
ভস্মিল যবন-লক্ষ্মী কি অনল জ্বালি।"

বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম প্রচারের জন্য নবীনচন্দ্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "তাঁহার জাতীয়তামূলক কবিতাসমূহ একদা শিক্ষিত বাঙালীর মনে দেশাত্মবোধের উন্মেষসাধনে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল। বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক এবং বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তামূলক কবিতা রচনার অন্যতম পথিকৃৎরূপে নবীনচন্দ্র স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।" তিনি আরও বলেছেন,"দেশের প্রতি সুগভীর ভালবাসায় তাঁহার হৃদয় ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ, পরাধীনতার বেদনা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিতেন। বহু কবিতায় তিনি দেশের দুঃখ দুর্দশায় অশ্রুপাত করিয়াছেন। এই দেশপ্রীতির প্রেরণায় তাঁহার অন্তরের অন্তস্থল হইতে যে কবিতার স্রোত তরুণ বয়সেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিল, পরিণত যৌবনে তাহাই দুকূলপ্লাবী হইয়া তাঁহাকে 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনায় প্রণোদিত করে।"

'পলাশীর যুদ্ধ' নবীনচন্দ্রের দ্বিতীয় সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর এই স্বদেশপ্রেমমূলক প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখে তিনি কবি খ্যাতির উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে এই কাব্যগ্রন্থের প্রচার ও জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্যের পাণ্ডুলিপি পড়ে কবিকে লিখেছিলেন, "পলাশীর যুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রধান কাব্য—next, if at all, to meghnad." প্রকাশের কিছুকাল পরে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ ন্যাশনাল থিয়েটারে 'পলাশীর যুদ্ধ'কে নাটকে রূপান্তরিত করে অভিনয় করালেন। কাব্যটি এমন খ্যাতি অর্জন করেছিল যে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ ফ্রেঞ্চ মলেন 'পলাশীর যুদ্ধ' গ্রন্থটি Alexandrine ছন্দে ইংরেজী কবিতায় অনুবাদ করেছিলেন। 'পলাশীর যুদ্ধ' সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ।... ইংরেজীতে বাইরনের কবিতা তীব্র তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। বাঙ্গালাতেও নবীনবাবুর কবিতা সেইরূপ তীব্র তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। তাঁহাদিগের

হৃদয়-নিরুদ্ধ ভাবসকল, আগ্নেয়গিরি-নিরুদ্ধ অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য।"

সাহিত্যে নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "নবীনবাবুরও যখন স্বদেশ বাৎসল্য-স্রোত উচ্ছ্বলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিস্রাবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্বাসা প্রার্থিত :ক্রোধ, দেশ-বাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীনবাবুর।"

পলাশীর বর্তমান প্রান্তর দেখে কবি সখেদে লিখলেন,

"এই কি পলাশী ক্ষেত্র? এই সে প্রাঙ্গণ?
... ...
যেইখানে মোগলের মুকুট রতন
খসিয়া পড়িল আহা! পলাশীর রণে!
যেইখানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইলে অবহেলে পাপাত্মা যবনে?
দুর্বল বাঙালী আজি, মানস নয়নে,
দেখিবে সে রণক্ষেত্র?"

পলাশীর রণক্ষেত্রে মীরজাফরের সৈন্যদল যখন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান এবং ইংরেজ পক্ষের বিজয় আসন্ন তখন দেশভক্ত মোহনলাল দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নবাব সৈন্যদের এই বলে উত্তেজিত করতে লাগলেন :

"দেখিছ না সর্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ সিংহাসন, যায় স্বাধীনতা ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর?
নিশ্চয় জানিও রণে হলে পরাজয়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল তার, ঘুচিবে না জন্মে আর,
অধীনতা-বিষে হবে জীবন সংশয়!"

এত উৎসাহ, উত্তেজনা প্রদান করা সত্ত্বেও নবাব সৈন্য নিশ্চল রইল। মোহনলাল অমিত বিক্রমে একক সংগ্রাম করে মরণাপন্ন হলেন। বঙ্গদেশ ইংরেজদের করতলগত হল। মৃত্যু শয্যায় মোহনলাল নানা খেদোক্তি করতে থাকেন :

"পরাধীন স্বর্গবাস, হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস, আমরা নির্ভীক

স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি
অধীন ভূপতি হতে সুখী সমধিক।"

এইভাবে 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য গ্রন্থখানি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্বদেশপ্রেমে ভরপুর। ইহা জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার চিরন্তন উৎস।

শত শত বছরের পরাধীনতার জ্বালায় জর্জরিত খণ্ড-বিখণ্ড ভারতকে এক ঐক্যমন্ত্রের মহাবন্ধনে বাঁধবার আশায় শ্রীকৃষ্ণকে শক্তিশালী শাসক ও অখণ্ড ভারত রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁকে বিসমার্কের সঙ্গে তুলনা করে নবীনচন্দ্র রচনা করলেন 'কুরুক্ষেত্র' মহাকাব্য। এরই অপর দুই অংশ 'রৈবতক' ও 'প্রভাস'। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারায় অভিষিক্ত করেই রচিত হয়েছিল এই ত্রয়ীকাব্য।

এই ত্রয়ী কাব্যকে 'উনবিংশ শতকের মহাভারত' বলে ব্যক্ত করেছেন নবীনচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা। স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য দেশবাসীর সামনে নবীনচন্দ্র তুলে ধরেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের প্রভাব দেশবাসীকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। এযুগের আদর্শ পুরুষরূপেই চিত্রিত করেছেন শ্রীকৃষ্ণকে, যেমন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ত্রয়ীকাব্যে শ্রীকৃষ্ণ আর অবতার নন, মানবতার মহান্ আদর্শের প্রতীক। মানুষের সুখ-দুঃখ, ধর্মাধর্ম, কর্মশক্তি ও জাতীয়তাবোধের আদর্শে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র বিরাট করে চিত্রিত হয়েছে।

ত্রয়ীকাব্য ছাড়া নবীনচন্দ্র অহিংসা ও সত্যের বাণী প্রচারক বুদ্ধ চরিত্র অবলম্বন করে 'অমিতাভ' এবং মানবপ্রেমিক খৃস্ট ও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বন করে যথাক্রমে 'খৃস্ট' ও 'অমৃতাভ' কাব্যত্রয় রচনা করেন। তাঁর রচিত এই কাব্যসমূহ তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তে জাতীয় মর্যাদা, জাতিপ্রীতি ও মানবতাবোধ জাগিয়ে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। বাংলার জাতীয়তার ইতিহাসে নীবনচন্দ্রের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
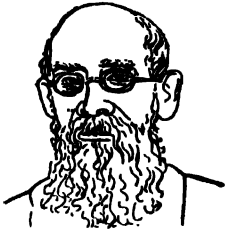
জাতীয়তার জনক
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

জাতীয়তার আদি মন্ত্রগুরু রাজা রামমোহনের সময় থেকে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত যে নবজাগরণের যুগ তা গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদিকে আশ্রয় করে। ঐ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের শেষের দিকে 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বদেশী ভাবধারা দেশের মধ্যে প্রচারের প্রচেষ্টা হয়। সপ্তম দশকের সুরুতে আবির্ভূত হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম নিছক রাষ্ট্রীয় আন্দোলন গড়ে তুললেন। কোনো ধর্মের প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিত ছিলেন না। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আকাঙ্খাতেই তিনি বাস্তব রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তাই নবযুগের বাংলার প্রথম রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যে বিলেতে আই. সি. এস. পাস করে এসে সুরেন্দ্রনাথ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু প্রথম থেকেই ইংরেজ সিভিলিয়ানরা তাঁর উপর বিরূপ ছিলেন। কোনো ভারতীয় সিভিলিয়ানের চাকরি পেয়ে তাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত হোক, এ তাঁদের অসহ্য ছিল। সুরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে কার্য পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু পরিশেষে সামান্য একটু ভুলের জন্য তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। তাঁর এই পদচ্যুতি জাতির পক্ষে শাপে বর হল। সুরেন্দ্রনাথ সংকল্প গ্রহণ করলেন মাতৃভূমিকে বিজাতি বিদেশী দুঃশাসনের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করবেন।

শীঘ্রই নির্যাতীতের বন্ধু বিদ্যাসাগর মশাই সুরেন্দ্রনাথকে দু'শত টাকা বেতনে তাঁর মেট্রোপলিটান কলেজের ইংরেজী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করলেন। সুরেন্দ্রনাথের জীবনে এল বিরাট এক সম্ভাবনার সুযোগ। তিনি এতদিন ধরে একাধিক বিষয় নিয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে উপযুক্ত জাতীয় জাগরণ ছাড়া বিদেশী শাসকের নিকট সুবিচারের আশা করা বৃথা। এখন অধ্যাপকের পদ পেয়ে তাঁর সেই উদগ্র বাসনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার প্রয়াস পেলেন। তিনি অনুভব করলেন যে জাতির ভবিষ্যৎ তরুণ বিদ্যার্থীদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তার মন্ত্রে উদবুদ্ধ করতে পারলেই জাতীয় জাগরণ

সম্ভব। তাই তিনি ক্লাসরুম বা শ্রেণীকক্ষগুলি থেকেই স্বদেশমন্ত্র প্রচার সুরু করলেন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গেই সুরেন্দ্রনাথ দেশ বিদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ও সেই-সেই দেশের বীর স্বদেশপ্রেমিকদের কথা জ্বালাময়ী ভাষায় ব্যক্ত করতে লাগলেন। তরুণ ছাত্রসমাজ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর সেই আবেগময়ী ভাষণ শুনত। আর মনে মনে স্বদেশহিতে আত্মোৎসর্গ করার সংকল্প গ্রহণ করত। পরবর্তীকালে সমগ্র দেশে স্বদেশ-প্রেমের যে বন্যা বয়েছিল, তার মূলে ছিল সুরেন্দ্রনাথের অনস্বীকার্য অবদান।

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ইতালির দেশপ্রেমিক বীর ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর মন্ত্রশিষ্য। এঁদের অসামান্য দেশপ্রেম, দেশের মুক্তি প্রচেষ্টায় আত্মোৎসর্গ, উচ্চ আদর্শ এবং সর্বোপরি মানবপ্রেম সুরেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি তাই এঁদের আদর্শ জীবনকাহিনী ছাত্রসমাজের সামনে অত্যন্ত তেজোদীপ্ত ভাষায় উপস্থাপিত করতেন। অনেক সময় বক্তৃতাশেষে সুরেন্দ্রনাথ অতি উচ্চৈঃস্বরে আবেগপূর্ণ ভাষায় জিজ্ঞেস করতেন, "তোমরা কে কে ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী হতে চাও?" পরিপূর্ণ সভাগৃহে সমস্বরে গগনবিদারী আওয়াজ উঠত, "আমরা সকলে, আমরা সকলে।" একবার সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রসভার এক অধিবেশনে "পাঞ্জাবের শিখশক্তির অভ্যুদয়" এই বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ অপূর্ব বক্তৃতা করেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণী শক্তি এবং দেশপ্রেমোদীপ্ত ভাষার অভূতপূর্ব ওজস্বিতা শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্পূর্ণ মন্ত্রমুগ্ধ ও উদ্বেলিত করে তুলেছিল। সুরেন্দ্রনাথের ঐ অভিভাষণ সম্বন্ধে বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, "ইহা কলেজ স্কোয়ারের চতুর্দিকে যেন তুফান তুলেছিল। এবং তিনি যে তাঁর যুগের একজন অত্যন্ত শক্তিশালী বাগ্মী তা সেই সভায় তৎক্ষণাৎ প্রতিপন্ন হল।"

এইভাবে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য বাগ্মিতার দ্বারা একদিকে যেমন জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তরুণদের সচেতন করে তুললেন, অপরদিকে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতালাভের ইতিহাসের কথা উপস্থাপিত করে স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্দেশ দিলেন। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বহু যুবক প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সভাসমিতি করতে সুরু করে। এইরূপ বহু সভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে যেতে হত।

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। অধ্যাপনাকে তিনি একটি অতি মহৎ ও পবিত্র ব্রত বলেই মনে করতেন। দেশসেবার নানা কাজে লিপ্ত থাকলেও অধ্যাপনাকে তিনি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করতেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "রাজনৈতিক কাজ কম বেশী প্রয়োজনীয়। কিন্তু শিক্ষার কাজের একটা চিরস্থায়ী উপযোগিতা আছে। শিক্ষকের সাম্রাজ্য একটি স্থায়ী সাম্রাজ্য যা ভবিষ্যৎকেও প্রভাবিত করে। শিক্ষকরাই ভবিষ্যৎকালের প্রভু। তাঁদের কাজ ঈশ্বর প্রদত্ত—একটি পবিত্র বৃত্তি—একটি স্বর্গীয়

কর্ম।" ১৮৭৫-১৯১৩ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ৩৭ বছরের শিক্ষকজীবনে ছাত্রসমাজের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ অতি গভীর আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁর গভীর ও অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা তাঁকে ছাত্রদের অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন করে তুলেছিল। এবিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, "আমার ও ছাত্রগণের মধ্যে এমন একটি অনুরাগ জন্মিয়াছে যাহাকে আমি আমার এক মহামূল্য সম্পদ বলিয়া বিবেচনা করি।...ছাত্রদের জীবনসংগঠনে যদি আমি কিছু করিয়া থাকি, তবে আমি যাহা হইয়াছি তাহাও ছাত্ররাই গঠন করিয়াছে। যদি তাহাদিগকে আমি দেশসেবায় অনুপ্রাণিত করিয়া থাকি, তবে প্রতিদানে তাহারাও আমাকে তারুণ্যে ও যৌবনের উৎসাহে পূর্ণ করিয়াছে। তাহাদের সহবাসে আমি নবীনতা অনুভব করিয়াছি, তাহাদের নিত্য সান্নিধ্যে আমার এই পরিণত বয়সেও যৌবনোচিত কতকগুলি গুণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

দেশের যুবসম্প্রদায় যখন জাগ্রত হল, তখন সুরেন্দ্রনাথ তাদের দেশসেবামূলক কাজে নিয়োজিত করতে এবং দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনসাধারণের মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের বাসনায় ১৮৭৬ সালে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারতসভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন।

এতদিন সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কার্যকলাপ কেবল কলকাতা ও তার উপকণ্ঠেই সীমাবদ্ধ ছিল। 'ভারতসভা' প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই তিনি সমগ্র ভারতে জাতীয়তার মন্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে অভিযান সুরু করলেন। তিনি প্রথমে গেলেন উত্তর ভারতে। তারপর দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্যভারত পরিভ্রমণ করে সমস্ত দেশবাসীকে তিনি দেশপ্রেমে দীক্ষিত করলেন। স্বদেশের গৌরবোজ্জল অতীত ইতিহাস, অপর পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিকথা এবং পরশাসিত ভারতে নানা অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের কাহিনী তিনি বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করলেন। কামরূপ থেকে পাঞ্জাব এবং হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ঝড়ের বেগে ভ্রমণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অভূতপূর্ব দেশানুরাগে উদ্দীপ্ত করলেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বহু প্রতিভাধর কৃতি দেশনায়ক তাঁদের যৌবনে সুরেন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায়, "সুরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে পেট্রিয়টিজম্-এ অথবা স্বদেশভক্তিতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।"

জাতীয় জাগরণে সুরেন্দ্রনাথের আর একটি অবদান "ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স" বা 'জাতীয় সম্মেলনে'র উদ্বোধন। ১৮৮৩ সালে কলকাতায় এর প্রথম অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনের মাধ্যমে সুরেন্দ্রনাথ জনকল্যাণকর নানা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

১৮৮৫ সালে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাইতে কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন হয়েছিল তার চেয়েও সুরেন্দ্রনাথের 'জাতীয় সম্মেলন' ছিল অনেক বেশী জনগণের আত্মসচেতনকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রথমে সুরেন্দ্রনাথকে পরিহার করে চলাই ছিল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। পরে হিউম প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ যখন উপলব্ধি করলেন যে সুরেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস চলতে পারে না, তখন তাঁকে কংগ্রেসে গ্রহণ করা হল। এর পর সুরেন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠান ছেড়ে কংগ্রেসের কাজেই একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। শ্রীরাজাগোপালাচারী বলেছেন, "সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জনক।...কংগ্রেসের চেয়ে সুরেন্দ্রনাথ অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।...তিনিই ছিলেন কংগ্রেসের জীবন ও প্রেরণা।" মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায়, "আমাদের এই স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতার আন্দোলনের অন্যতম আদিগুরু সুরেন্দ্রনাথ। প্রথম যৌবনে দেশের নব্য শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা জাগাইয়াছিলেন তাহাই ঋজু কুটিল পথে পরিচালিত হইয়া আজিকার প্রবলতর স্বাদেশিকতা ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার গতিবেগের সৃষ্টি করিয়াছে। আজ দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাধকেরা প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ প্রভুশক্তিকে উপহাস করিয়া অম্লান বদনে মৃত্যুকে বরণ করিতেছেন। দলে দলে ইংরেজের শাসনযন্ত্রকে বিকল করিয়া বা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সহচর এবং অনুচরেরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শুষ্ক মাটি কাটিয়া নূতন খাত প্রস্তুত করিয়া যে স্বাদেশিকতার পুণ্য প্রবাহ আনিয়াছিলেন, তাহা না আনিলে আজিকার এই প্রবল প্লাবন সম্ভব হইত না।"

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের বিষয় অনুসন্ধানের জন্য যে ওয়েলবি কমিশন গঠিত হয়েছিল, সুরেন্দ্রনাথ তাতে সাক্ষ্য দিবার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি ওখানকার নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে ইংরেজদের নিকট ভারতবাসীর অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা দেন। এদেশে ব্রিটিশ দুঃশাসনের নগ্নমূর্তি তিনি তাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তখন অনেক ইংরেজের ধারণা ছিল যে ভারতবর্ষ একটি অসভ্য বর্বর দেশ। এখানে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা চলে না। এইসব ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করে অক্সফোর্ড ইউনিয়নের এক সভায় সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। ভারতের হিন্দুজাতি অতীব প্রাচীন ও মহৎ বংশসম্ভূত। হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আমি আপনাকে সম্মানিত মনে করি। ইউরোপের সুসভ্য জাতিসমূহের পূর্বপুরুষগণ যখন বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ

তখন বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, সমৃদ্ধিশালী নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ধর্ম, দর্শন, কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা এমন মহীয়সী ও গরীয়সী ভাষার প্রবর্তন করিয়াছেন যাহা আজিও সভ্য জগতের প্রশংসালাভ করিতেছে। ...সকলেই জানেন যে স্বায়ত্তশাসন আর্য সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল এবং আমরাও সেই আর্যজাতিরই বংশধর। ভারতের আর্যপঞ্চায়েতপদ্ধতি পাহাড় পর্বতের মতোই প্রাচীন। আমরা যে প্রতিনিধিমূলক শাসনপদ্ধতির আংশিক বা পূর্ণ দাবী করিতেছি, তাহা ভারতবাসীর অস্থিমজ্জাগত—তাহা ভারতবাসীর প্রকৃতি, চিরন্তন সংস্কার, জাতীয় ধারা ও পারম্পর্যের অনুকূল এবং তাহা ব্রিটিশ শাসন-নীতিরও প্রতিকূল নহে।"

ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত বঙ্গদেশ। জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালী জাতিকে এদেশের ইংরেজ শাসকরা মোটেই সুনজরে দেখত না। তাই তারা জাগ্রত বাঙালী জাতিকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে দ্বিধাবিভক্ত করতে চাইল। বঙ্গভঙ্গের এই চক্রান্তে সমগ্র বঙ্গদেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ফলে সুরু হল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই আন্দোলনের সামিল হলেন। আন্দোলনের নেতৃপদে বৃত হলেন সুরেন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর তেজোদীপ্ত বাগ্মিতার দ্বারা সমগ্র দেশকে উদ্বেলিত করে তুললেন। সারা দেশে সুরু হল বিলাতি দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন; এবং স্বদেশী জিনিসের ব্যবহার। এই আন্দোলনের প্রভাব বাংলার প্রতিটি গ্রামে এমন কি প্রতি গৃহে বিস্তার লাভ করেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় একবার তাঁকে 'দেশনায়ক' আখ্যা দিয়ে সম্বর্ধনা জানান হয়। ঐ সভায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থেকে বলেছিলেন, "এই সভাস্থলে 'দেশনায়ক' বলিয়া আমি যাঁহার নাম লইতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার নাম আজ কেবল বাংলাদেশে নহে, ভারতবর্ষের সর্বত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি জানি, আজ বঙ্গলক্ষ্মী যদি স্বয়ংবরা হইতেন তাঁহারই কণ্ঠে বরমাল্য পড়িত। ব্রাহ্মণের ধৈর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজ যাহাতে একত্র মিলিত, যিনি সরস্বতীর নিকট হইতে বাণী পাইয়াছেন এবং যাঁহার অক্লান্ত কর্মপটুতা স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মীর দান, আজ বাংলাদেশের দুর্যোগের দিনে যাঁহারা নেতা বলিয়া খ্যাত, সকলের উপরে যাঁহার মস্তক অভ্রভেদী গিরিশিখরের মতো বজ্রগর্ভ মেঘপুঞ্জের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বাঙালীকে আজ আহ্বান করিতেছি।"

১৯০৯ সালে লণ্ডনে যে 'ইম্পিরিয়াল প্রেস কন্‌ফারেন্স' হয়, তাতে সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন। বিশ্ব-বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ

সাংবাদিকগণের ঐ বিরাট সম্মেলনে তিনি যে অসামান্য বাগ্মিতা শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রগুলির মতে শ্রেষ্ঠতম বলে প্রশংসিত হয়েছিল। ঐ সময় সুরেন্দ্রনাথ লণ্ডনে বহু সভাসমিতিতে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের কথা প্রচার করেছিলেন। বিলেতে তাঁর প্রধান দাবী ছিল বঙ্গভঙ্গ রহিত এবং ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন।

'রিভিউ অব্ রিভিউজ্' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক মানবপ্রেমিক মনস্বী উইলিয়াম স্টেড সাহেব তাঁর গৃহে সুরেন্দ্রনাথের সম্বর্ধনার এক আয়োজন করেন। বিলেতের প্রতিনিধি-স্থানীয় বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তির এক বৈঠকে তিনি সুরেন্দ্রনাথকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন, "মিস্টার ব্যানার্জী, মনে করুন আপনার প্রাণদণ্ডাদেশ হয়েছে, দু-মিনিটের মধ্যে ঘাতকের কুঠার আপতিত হবে, এরূপ অবস্থায়, আপনার মাতৃভূমির জন্য ইংরেজ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আপনার চরম কোন্ বাণী দিবেন ?

মুহূর্তমাত্রও কোনো চিন্তা না করে সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আমি ইহাই বলিব :

(১) বঙ্গভঙ্গ সংশোধন করুন, (২) বিনাবিচারে অন্তরীণ ব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান করুন এবং বঙ্গদেশে যে বিধানে ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করুন, (৩) সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্ত করুন, (৪) ভারতবাসীকে তাহার প্রদত্ত করের উপর আধিপত্যের অধিকার দিন, (৫) ভারতবর্ষকে কানাডার আদর্শে শাসনতন্ত্র দান করুন। আর কিছু বলিতে চাই না।"

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লণ্ডনে সুরেন্দ্রনাথের নিরলস পরিশ্রম শীঘ্রই ফলপ্রসূ হল। ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রহিত করে দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের অনমনীয় মনোভাব এবং সুদৃঢ় সংকল্পের জন্য কোনো কোনো ইংরেজ তাঁকে Surrender not (আত্মসমর্পণ করেন না) বলে অভিহিত করতেন। সেটি তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল।

১৯১৯ সালের মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার অনুযায়ী ১৯২১ সালে বাংলাদেশে যে নির্বাচন হয় তাতে সুরেন্দ্রনাথ আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং গভর্নর কর্তৃক স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁর মন্ত্রিত্বকালের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কীর্তি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন, যার ফলে ভারতের বৃহত্তম মহানগরী কলকাতার পৌর শাসনাধিকার দেশবাসীর করায়ত্ত হয়। সত্যকথা বলতে কি বর্তমান কলকাতা করপোরেশন তাঁরই সৃষ্টি।

রাষ্ট্রীয় জীবনে সুরেন্দ্রনাথকে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্যে চলতে হয়েছে।

তাঁর ছিল গভীর আত্মবিশ্বাস এবং অপূর্ব প্রাণপ্রাচুর্য দীর্ঘ কর্মঠ জীবন। যার ফলে তিনি সকল বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে প্রচুর কাজ করতে পারতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, "সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহ দেখিয়া আমার শুভ্র কেশ কৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে।"

জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে সুরেন্দ্রনাথের অবদান সম্বন্ধে তাঁর সহপাঠী মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, "এক পুরুষের জীবনকালের মধ্যে কী বিস্ময়কর বিপ্লব আমরা দেখিলাম। একটি জাতির চিন্তায় ও আদর্শে কত উন্নতি ঘটিল।"

বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায়, "যাঁহারা ক্রমে নূতন পথ ধরিয়া, ক্রমে নূতন মন্ত্র সাধন করিয়া দেশের জনমণ্ডলীর চিত্তে এক নবশক্তির সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে স্বাদেশিক উদ্দীপনার জন্য সুরেন্দ্রনাথের নিকট চিরঋণী রহিয়াছেন।...তিনি এই জাতীয় জীবনের গঠনের যে কাজটি করিয়াছেন সে কাজ আর কেহ করেন নাই এবং করিতে পারিতেনও না। আর এইজন্যই আধুনিক ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি এমন অক্ষয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।"

লোকনায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত

আদর্শ শিক্ষাপ্রদান ও প্রচার এবং নিজ উন্নত চরিত্রবলে যিনি বাংলার জাতীয় চরিত্র সুদৃঢ় করেছিলেন, তিনিই লোকনায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত। তিনি ছিলেন দেশের মুকুটহীন রাজা। ১৮৫৬ সালের ২৫শে জানুয়ারি বরিশাল জেলার বাটাজোড় গ্রামে অশ্বিনীকুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ব্রজমোহন দত্ত ছিলেন স্বাধীনচেতা ও চরিত্রবান পুরুষ। মাতা প্রসন্নময়ী ছিলেন প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক মনোমোহন ঘোষ এবং লালমোহন ঘোষের ভাগিনেয়ী এবং অত্যন্ত তেজস্বিনী রমণী। পিতামাতা উভয়েরই চরিত্রবৈশিষ্ট্য অশ্বিনীকুমারের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

রংপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে অশ্বিনীকুমার কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এই সময় তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর আবেগপূর্ণ বক্তৃতা ও নীতিজ্ঞানের দ্বারা তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত হন। সত্যপরায়ণতা ও নিয়মনিষ্ঠা তাঁর জীবনের বিশেষ আদর্শ হয়ে উঠল। এফ্. এ. পাস করে বি. এ. পড়বার সময় অশ্বিনীকুমারের মনে হল প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর বয়স বাড়িয়ে চৌদ্দর স্থলে ষোল করা হয়েছিল। জীবনের এই একটি অসত্য ঘটনার জন্য তিনি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। কিন্তু তখন প্রতিকারের কোনো উপায় না দেখে তিনি কিছুদিনের জন্য পড়াশুনা বন্ধ করে দিলেন। এজন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শাস্তি চেয়েছিলেন কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

কিছুকাল অতিবাহিত হলে পর অশ্বিনীকুমার কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হলেন। তখন কৃষ্ণনগর ছিল আদর্শ কলেজ। ইংরেজী ভাষায় তাঁর বিশেষ দখল ছিল। কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক রো সাহেব ও আদর্শ পুরুষ রামতনু লাহিড়ীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। রামতনুর চরিত্রাদর্শে তিনি বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকেই তিনি বি. এ., এম. এ. ও বি. এল. পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হন।

কৃষ্ণনগর কলেজে পড়বার সময় তিনি ঐ কলেজের স্কুলের শিক্ষকতাও করতেন।

এম. এ. পাস করে ২৩ বছর বয়সে তিনি শ্রীরামপুরের নিকটস্থ চাতরা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে কাজ করেন। প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁর কাজ-কর্ম ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিদ্যালয়ে অশ্বিনীকুমার খেলাধুলা ও আমোদ উৎসবের ব্যবস্থা করে ছাত্র ও অভিভাবকদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন। স্থানীয় জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য 'শ্রীরামপুর এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। অশ্বিনীকুমার ঐ সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে নানা উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এইখানেই তাঁর স্বদেশ সেবার কাজ সুরু হয়।

অশ্বিনীকুমার ইংরেজ সরকারের অধীনে ভালো চাকরি পেয়েও তা গ্রহণ করেন নি। বিদেশী শাসকদের দেওয়া চাকরি তিনি পছন্দ করলেননা। পিতা ব্রজমোহনের নির্দেশক্রমে অশ্বিনীকুমার ১৮৮০ সালে বরিশালে ফিরে গিয়ে ওকালতি আরম্ভ করেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই যিনি ন্যায় ও সত্যকে জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তাঁর পক্ষে এ কাজ করা অসম্ভব। বিবেক-বিরোধী বলে কয়েক বছর পরেই তিনি ওকালতি ছেড়ে দিলেন। আগেই বলেছি অশ্বিনীকুমার ছাত্রাবস্থায় কেশবচন্দ্র সেন ও রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। পরে তিনি জাতীয়তার বলিষ্ঠ মন্ত্রগুরু ঋষি রাজনারায়ণ বসুরও সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ফলে তিনি স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। রাজনারায়ণ তাঁকে প্রায়ই বলতেন, "যদি নেতা হইতে চাও, কলিকাতায় যাইও, আর যদি কাজ করিতে চাও বরিশালে থাকিও।" দেশপ্রেমিক অশ্বিনীকুমার রাজনারায়ণের উপদেশ শিরোধার্য করে সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ করবার ইচ্ছায় বরিশালেই বাস করতে লাগলেন। ছাত্রজীবন থেকেই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এখন তিনি বরিশালে ব্রাহ্মসমাজের হয়ে কাজ করতে লাগলেন। ব্রাহ্মমত প্রচারের জন্য তিনি এমন সুন্দর বক্তৃতা দিতে লাগলেন যে লোকে তাঁকে 'বরিশালের কেশবচন্দ্র' বলে অভিহিত করতে লাগল। বরিশালের আপামর সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য এবং জনকল্যাণমূলক কাজ করার উদ্দেশ্যে তিনি 'Peoples Association' বা 'লোকসমিতি' স্থাপন করলেন। বরিশালে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের জন্য যে আন্দোলন হয়, অশ্বিনীকুমার তার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। ফলে ১৮৮৭ সালে ঐ জেলায় ডিষ্ট্রিক বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড ও মিউনিসিপালিটি গঠিত হয়। এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি নানা উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বাংলার জাতীয় জাগরণে অশ্বিনীকুমারের শ্রেষ্ঠ দান আদর্শ শিক্ষার প্রবর্তন। তৎকালে দেশের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত অধঃপতিত, শিক্ষার মান ছিল অনুন্নত। প্রচলিত

শিক্ষা ব্যবস্থায় ডিগ্রিলাভ হত আর চাকরি মিলত; কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা ও চরিত্র গঠিত হত না। অশ্বিনীকুমার উপলব্ধি করলেন যে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর তরুণ সম্প্রদায়কে সুশিক্ষা দিয়ে চরিত্রবান করে তুলতে পারলে জাতির মুক্তি সংগ্রামে তারাই হবে বীর সৈনিক। জাতীয় চরিত্র বলিষ্ঠ ও উন্নত হলেই জাতির বন্ধন-মুক্তির পথ সুগম হওয়া সম্ভব। এই সুমহান উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে তিনি ১৮৮৪ সালের ২৭শে জুন বরিশালে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। পিতার নামে তার নামকরণ করলেন ব্রজমোহন ইন্‌স্টিটিউসন। এই বিদ্যায়তনকে কেন্দ্র করেই তিনি জাতি গঠনমূলক সমস্ত কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ব্রজমোহন বিদ্যায়তনের তিনটি মূলমন্ত্র ছিল সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা। স্কুলের নিজস্ব একটি পতাকা ছিল। তাতে ঐ তিনটি মন্ত্র লেখা থাকত। এই বিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি সঙ্গীত ছিল। তার নাম ছিল 'ব্রজমোহন বিদ্যালয় সঙ্গীত'। সঙ্গীতটি নিম্নরূপ:

"আয় ভাই আয় মাতি নব বলে,
এই মহাব্রত সাধিব সকলে;
অদম্য উৎসাহে যতন করিলে,
স্বরগ হইবে মরত ধাম।
.. ..
হাতে হাতে ধরি হও অগ্রসর,
দুর্নীতির সহ করিতে সংগ্রাম।
সত্যের নিশান তুলিয়ে গগনে,
পবিত্রতামৃত পূরিয়ে পরাণে,
প্রেম-ডোরে বাঁধি ভাই বন্ধুগণে,
চল পূর্ণ হবে যত মনস্কাম।"

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবশ্য পালনীয় বিশটি নীতি-উপদেশ ছিল। কোনো ছাত্র ভর্তি হতে এলে তার হাতে ঐ নীতিগুলির ছাপা একটি পত্র দেওয়া হত। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি পালন করবার সংকল্প-বাক্য পাঠ করিয়ে নেওয়া হত। ঐ নীতিগুলি ছিল: ছাত্রদের অধ্যয়ন, চরিত্রগঠন ও আচার-আচরণ পালন। তাছাড়া, ঐ পত্রের শিরোদেশে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথাও মুদ্রিত থাকত।

"এই বিদ্যালয় তোমাকে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সুশিক্ষা প্রদান করিবে। আমরা বিদ্যালয়ে ও গৃহে উভয় স্থলেই তোমার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিব। তোমার প্রতি আমাদের তত্ত্বাবধান বিদ্যালয় ছুটি হইবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইবে না, তুমি

বিদ্যালয়ে যেরূপ দণ্ড পাইবে, বাড়ীতে দুর্ব্যবহার করিলেও তেমন শাস্তি পাইবে। নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্যগুলি প্রণিধানপূর্বক প্রতিপালনের চেষ্টা করিও।" এর ঠিক পরেই এক, দুই করে বিশ পর্যন্ত নীতিবাক্যগুলি লিখিত থাকত।

পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রদের মধ্য থেকে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করে অশ্বিনীকুমার একটি আদর্শ শিক্ষক মণ্ডলী গড়ে তুলেছিলেন। এবং তাঁরই নির্ধারিত উচ্চাদর্শে শিক্ষকগণ শিক্ষাপ্রদান করতেন। চিরাচরিত প্রথায় তিনি শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন না। খালি পাঠ্য পুস্তক গলাধঃকরণ করিয়ে পুথিগত বিদ্যার তোতাপাখী তৈরী করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ছাত্রদের জ্ঞানের দিগন্ত যাতে বর্ধিত হয় এবং চরিত্র গঠন হয়, সেদিকেও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। বিদ্যালয়ের বাইরেও ছাত্রদের কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণের প্রতি তিনি নজর রাখতেন। খেলাধুলায়, ভ্রমণে, সভাসমিতিতে এবং আমোদ উৎসবেও শিক্ষকরা ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। এবং কোনো ছাত্র যাতে কুপথে না যায় সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখা হ'ত। এক একজন শিক্ষকের উপর এক একদল ছাত্রের ভার দেওয়া হত। তিনি প্রায়ই তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের আচার-আচরণের খোঁজ নিতেন। এর ফলে ছাত্ররা সৎজীবন যাপনের জন্য সতত সচেষ্ট থাকত।

অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রেরা যাতে দেশের অগণিত আর্ত, আতুর দরিদ্র জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে শেখে এবং স্বদেশহিতে তাদের অনুরাগ বাড়ে, সেজন্য অশ্বিনীকুমার কয়েকটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। যেমন দরিদ্র ও রোগীদের সেবার জন্য তিনি গড়েছিলেন—'Little Brothers of the Poor' (দরিদ্র লোকদের ছোট ভাই)। অশ্বিনীকুমার নিজে কলেরা রোগগ্রস্ত দরিদ্র মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন। আর ছাত্রদেরও ঐ সেবাব্রতে উদ্‌বুদ্ধ করতেন। ফলে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পালা ক'রে দল বেঁধে সর্বশ্রেণীর দরিদ্র মানুষের সেবা করত। জনকল্যাণমূলক আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তিনি গঠন করেছিলেন। যেমন, 'Band of Hope' বা 'আশা দল', 'Fire Brigade' বা 'অগ্নিনির্বাপক দল,' 'Friends Union' বা 'বান্ধব সমিতি' প্রভৃতি।

অশ্বিনীকুমার বহুদিন থেকেই উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি আদর্শ কলেজ প্রতিষ্ঠার বাসনা মনে জাগরূক রেখেছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি একটি কলেজ গড়ে তুলেন। এটিরও নামকরণ করলেন পিতার নামে—'ব্রজমোহন কলেজ'। এই ব্রজমোহন কলেজের আদর্শ শিক্ষানীতি সারা দেশে প্রবাদ বাক্যের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও নীতিজ্ঞান প্রভৃতি চরিত্রের মহৎ গুণগুলি

বিকশিত করার ব্যবস্থা ছিল। তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা হত। পরীক্ষার হলে ব্রজমোহন কলেজে পরীক্ষার সময় কোনো গার্ড দেওয়া হইত না। কারণ, ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র এমন সুদৃঢ় এবং আত্মমর্যাদাবোধ এত তীব্র ছিল যে তারা বই দেখে নকল করা বা পরস্পর জিজ্ঞাসা করে প্রশ্নের উত্তর লেখা অবমাননাকর বলে মনে করত। অধ্যাপক সুপণ্ডিত ক্যানিংহাম সাহেব ব্রজমোহন কলেজ পরিদর্শন করে বলেছিলেন, "বঙ্গদেশে ব্রজমোহন মহাবিদ্যালয়ের মতো উৎকৃষ্ট বিদ্যায়তন থাকতে বাঙালী ছাত্রেরা অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজে বিদ্যাশিক্ষা করবার জন্য কেন যায়, আমি তাহা বুঝি না।" এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছিলেন, "বে-সরকারী উদ্যোগের এটি একটি আশ্চর্য কীর্তি।" ১৮৯৭-৯৮ সালের সরকারী বার্ষিক শিক্ষা-বিবরণীতে শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ ব্রজমোহন বিদ্যালয় সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "ছাত্রদের ব্যবহারের শিষ্টতা ও শিক্ষার উৎকর্ষের হিসাবে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সমকক্ষ দ্বিতীয় কোনো শিক্ষায়তন নেই। এই বিদ্যালয় সরকারী ও বেসরকারী সকল বিদ্যালয়ের আদর্শ হওয়া উচিত।"

প্রাণপাত পরিশ্রম করে অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ দেশের মধ্যে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। এজন্য তাঁর আত্মত্যাগ অতুলনীয়। তিনি উচ্চ বেতনের সরকারী চাকরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, ওকালতিও ছেড়ে দিলেন। এবং দরিদ্র সাধারণ শিক্ষকের জীবন যাপন করতেন। তিনি শুধু উপদেশ দিয়েই স্থির থাকতেন না। ছাত্রেরা যাতে সত্যাই মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে তিনি সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি যা উপদেশ দিতেন, নিজেও তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়"—ইহাই ছিল তাঁর জীবনের মূল সত্য। এমন আদর্শ চরিত্র এযুগে দুর্লভ। তিনি যে সব উপদেশ দিতেন, সেই অনুযায়ী নিজের জীবনকে গঠন করে এবং দেশ-বিদেশের নানা মনীষী মহামানবদের জীবনের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ছাত্রদের চরিত্রবান হতে উৎসাহিত করতেন। ছাত্ররা যাতে জীবনের মহদ্‌গুণগুলি আয়ত্ব করতে পারে, সেজন্য তিনি তাদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। এজন্য তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত 'বান্ধব সমিতি', 'আশার দল' প্রভৃতিতে ছাত্রসমাজের সামনে যে সব সারগর্ভ বক্তৃতা দিতেন, সে সব 'কর্মযোগ', 'ভক্তিযোগ', 'প্রেম' প্রভৃতি নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সমগ্র বাংলাদেশের তরুণ ছাত্রসমাজ সে সব পড়ে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং নিজ নিজ জীবন গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। শুধু ছাত্র কেন, সে সব গ্রন্থ যে কোনো মানুষকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ভক্তিযোগ' একটি অমূল্য গ্রন্থ। আজও এসবের মূল্য ফুরায় নি। আজকের এই দুর্যোগের দিনেও এই সব গ্রন্থ আমাদের ছাত্র ও যুব-

সম্প্রদায়কে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে তাদের জীবন গঠনের নতুন পথের নির্দেশ দিতে পারে।

অশ্বিনীকুমারের জীবনীকার শরৎকুমার রায় বলেছেন, "যুবকদিগের চরিত্র গঠনরূপ পবিত্র কার্যই অশ্বিনীকুমারের জীবনের ব্রত ছিল। এই ব্রত সাধনের নিমিত্ত তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং যুবক ও বালকদের সঙ্গেই তাঁহার পুণ্যময় জীবনের অধিকাংশ কাল ব্যয়িত হইয়াছে।…অশ্বিনীকুমারের অনুরাগী শিষ্যদের অনেকেই তাঁহাদের গুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রত করিয়াছেন।… স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বঙ্গদেশে এমন একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না যেখানে শিক্ষকদের মধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র দেখা যাইত না। ধর্মপরায়ণ কর্তব্যনিষ্ঠ আদর্শ শিক্ষক অশ্বিনীকুমারের নিকট যাঁহারা সুশিক্ষা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন তাঁহাদের চরিত্রে কিছু না কিছু বিশেষত্ব দেখা যাইত।"

অশ্বিনীকুমার তাঁর ছাত্রদের সর্বদা শারীরিক ও মানসিক বলিষ্ঠ হতে বলতেন। কোনো কাজে তাঁর ছাত্রদের অবদমিত হতে দেখলে তিনি বলতেন, "তোরা যে সিংহশাবক, শিয়াল কুকুরের বাচ্চার মতো কেউ-মেউ করিস কেন?" আবার তাদের মধ্যে যখন তেজের বিকাশ দেখতেন, তখন খুসী হয়ে বলতেন, "গর্হিত কিছু করিলেও ভীরুর মতো করিও না। বীরের মতো নির্ভীকভাবে কর। যাই কর পুরুষ হও।" অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিযোগ' এবং ব্রজমোহন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি স্বদেশী আন্দোলনে বিরাট সহায়তা করেছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এ বিষয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার যোগ্য। অশ্বিনীকুমার বাংলার জাতীয়তার সাচ্চা মন্ত্রগুরু। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, "ফলতঃ, আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরে, অশ্বিনীকুমারের মতন আর কেহ এতটা নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশীয়দিগের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রচার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন নাই।…অশ্বিনীকুমার লোকশিক্ষার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া আপনার সময়, শক্তি এবং অর্থ অকাতরে দান করিয়াছেন। এইজন্যই বোধ হয় তাঁহার শিক্ষার ও চরিত্রের প্রভাব এদেশের, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতঃ অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরাই পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় সাচ্চা স্বদেশীর পুরোহিত হইয়া বসিয়া আছেন। স্বদেশী যে পূর্ববঙ্গে এতটা শক্তিশালী হইয়াছিল, এবং এখনো হইয়া আছে, তাহার প্রধান কারণ অশ্বিনীকুমারের চরিত্র ও শিক্ষা। স্কুল কলেজ খুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট গ্রন্থাবলী পড়াইয়াই যুবকগণের শিক্ষার কাজ হইল, অশ্বিনীকুমার কখনও এমনটা মনে করেন নাই। ছাত্রদিগের চরিত্রগঠনের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। চরিত্র-গঠনের উপায় কেবলমাত্র উপদেশ

নহে, কিন্তু সদনুষ্ঠান।…অশ্বিনীকুমারের শিষ্যরা দল বাঁধিয়া আর্তজনের সেবায় নিযুক্ত হইতেন।"

জাতি গঠনোপযোগী আদর্শ শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনীকুমার দেশের মুক্তি সংগ্রামেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিরলসভাবে সংগ্রাম করে গিয়েছেন। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন। এদেশে প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপক্ষে তিনি বরিশাল জেলা থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত স্বাক্ষর সমন্বিত একটি আবেদন-পত্র ঐ অধিবেশনে উপস্থাপিত করেছিলেন। এই আবেদনের একটি অনুলিপি তিনি বৃটিশ পার্লামেন্টেও পাঠিয়েছিলেন।

সে-যুগের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করেই ক্ষান্ত থাকত। অশ্বিনীকুমার এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৮৯৭ সালে অমরাবতীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, অশ্বিনীকুমার তাতে উপস্থিত হয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেসকে তিন দিনের তামাসা বলে বিদ্রূপ করেছিলেন। তবুও তিনি কংগ্রেসকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে দেখতেন। তিনি কংগ্রেসের প্রতিটি অধিবেশনে যোগদান করতেন এবং ফিরে এসে বরিশালের বিভিন্ন জনসভায় কংগ্রেসের কথা প্রচার করতেন।

একবার ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ ব্রজেন্দ্রনাথের উপর নীলকরের কর্মচারীরা যে অত্যাচার করে, অশ্বিনীকুমার তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করেন। হাইকোর্টের মামলায় ব্রজেন্দ্রনাথ জয়ী হন এবং ঐ অঞ্চলে নীলকরের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এতে প্রকারান্তরে অশ্বিনীকুমারেরই জয় ঘোষিত হয়। তিনি মাদকদ্রব্য নিবারণী আন্দোলনও চালিয়েছিলেন। বরিশালের নৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত কলুষিত ছিল। অশ্বিনীকুমারের প্রভাবে সমাজের নৈতিক মান অনেক উন্নত হয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে বরিশাল জেলায় প্রবল বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে। ঐ বছর তিনি 'স্বদেশ বান্ধব' সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির পক্ষ থেকে অশ্বিনীকুমার ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত একটি ইস্তাহার প্রচার করা হয়। এতে বরিশালবাসীকে বিলিতি দ্রব্য বর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে বরিশালে বিলিতি জিনিস বিক্রি-বন্ধ হয়ে যায়। সরকারী কর্মচারী এমন কি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নানা চেষ্টা করেও বিলিতি জিনিস কিনতে পারলেন না। বিক্রেতারা বলত যে 'বাবু'র অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারের বিনা অনুমতিতে বিলিতি জিনিস বিক্রি করতে পারবে না। সারা বরিশাল জেলায় 'স্বদেশ-বান্ধব' সমিতির প্রায় দেড়শ'র

অধিক শাখাসমিতি স্থাপিত হয়েছিল। এবং ঐ সমিতির সভ্যেরা পূর্ণোদ্যমে বিলিতি জিনিস বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলন অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পরিচালনা করেন।
দেশের অজ্ঞ, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশী প্রচারের জন্য অশ্বিনীকুমার যাত্রা-গান, কথকতা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি বহু গায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। বিখ্যাত স্বদেশী যাত্রা গায়ক মুকুন্দ দাস অশ্বিনীকুমারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথমে বরিশাল জেলা পরে বাংলাদেশের বহু গ্রামকে স্বদেশী মন্ত্রে উদ্দীপিত করে তুলেছিলেন। নিরক্ষর মানুষদের জন্য অশ্বিনীকুমার নিজে সহজ সরল ভাষায় বহু স্বদেশী গান রচনা করেছিলেন। তাঁর ঐ সব গান 'ভারত-গীতি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর স্বরচিত দু'-একটি গান নিম্নরূপ :

(১) "আয় আয় সবে ভাই, যাই দ্বারে দ্বারে,
ভারতের ভাগ্য দেখি ফিরে কি না ফিরে।
সোনার এই রাজ্য ছিল, ক্রমে ক্রমে সকল গেল,
এমন যে ভারতবর্ষ, গেল ছারেখারে।"

(২) "গেল গেল, সবই গেল, আর কি ফিরিবে না দিন ?
ক্রমে রসাতলে, গভীর অতলে, ভারত হবে কি লীন ?
যে ভারত ছিল ভুবনমোহিনী, দেশে দেশে যার হ'ত জয়ধ্বনি,
প্রতাপে যাহার কাঁপিত অবনী সে আজ ভিখারী দীন।"

১৯০৫ সালে বরিশালে জাতীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়। সভার পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট এক আদেশ জারী করলেন যে প্রকাশ্য রাজপথে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেওয়া চলবে না। তখন ঐ আদেশ অমান্য করে একটি শোভাযাত্রা বার করা হয়। ঐ শোভাযাত্রা পুলিশ লাঠি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। ধুতি চাদর পরা অবস্থায় ছিলেন বলে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে অপমানিত করেন। অশ্বিনীকুমার তখন প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি সকল অবস্থাতেই ধুতি চাদর পরবেন। ছোটলাটের সঙ্গে তিনি এই ধুতি চাদর পরেই সাক্ষাৎ করেছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, জাতীয় পোশাক ধুতি-চাদর পরার প্রেরণা তিনি অশ্বিনীকুমারের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। স্যাডলার কমিশনের সদস্যরূপে আশুতোষ ঐ ধুতি চাদর পরেই সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন।
অশ্বিনীকুমারের জাতীয় মন্ত্রে দীক্ষিত বরিশাল জেলা স্বদেশী আন্দোলনে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিল। এতদিন ধরে তিনি যে জনসেবা এবং শিক্ষা বিস্তার করে

আসছিলেন এ তারই ফল। পূর্ব-বাংলা ও আসামের কুখ্যাত অত্যাচারী শাসনকর্তা ফুলার সাহেবও তাঁর প্রশংসা না করে পারেন নি। পদত্যাগ করে চলে যাবার সময় তিনি অশ্বিনীকুমারকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "আমি জানি যাঁরা মুখে দেশ-সেবার কথা বলেন আপনি তাঁদের দলে নন। শিক্ষার কারণে আপনি বাস্তব ও সফল প্রচেষ্টা করেছেন।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশে দু'টি দলের আবির্ভাব হয়—চরম পন্থী ও নরম পন্থী। অশ্বিনীকুমার চরমপন্থী দলে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯০৭ সালে ইংরেজ সরকারের চক্রান্তে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ জেলায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাঁধে। বরিশাল জেলায়ও দাঙ্গা বাঁধাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এখানে মুসলমানরা রাজী হয় নি। তারা বলেছিল যে, 'বাবু' রোগে সেবা ও দুর্ভিক্ষে অন্ন দিয়ে সাহায্য করেন, তাঁর আদেশ অমান্য করে আমরা দাঙ্গা বাঁধাতে পারব না। সেবা ও সাহায্যের দ্বারা অশ্বিনীকুমার জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন, "বস্তুতঃ আমাদের বর্তমান কর্মিগণের মধ্যে কেবল একজন মাত্র প্রকৃত লোক-নায়ক আছেন বলিয়া আমার মনে হয়, তিনি বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত।...তাঁর মতো এমন সত্য ও সাচ্চা লোকনায়ক বাংলার প্রসিদ্ধ কর্মিগণের মধ্যে আর একজনও আছেন বলিয়া জানি না।"

অশ্বিনীকুমারের বিনা অনুমতিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত কোনো বিদেশী জিনিস কিনতে পারতেন না। ইংরেজদের কাছে এ ব্যাপার একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠছিল। তখন তারা দমননীতি প্রয়োগ করল। সংবাদপত্র নিরোধ ও সভা-সমিতি বন্ধ আইন পাস হল। ফলে অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি কয়েকজন নেতা বন্দী হলেন। তাঁর 'স্বদেশ বান্ধব' সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। চোদ্দ মাস কারাবাসের পর তিনি যখন বরিশালে ফিরে আসেন তখনো স্বদেশবান্ধব সমিতি বে-আইনী ছিল। তখন অশ্বিনীকুমার 'শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিধায়িনী সমিতি' গঠন ক'রে জনসেবা মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯২০ সালে স্পেশাল কংগ্রেসে অশ্বিনীকুমারের নির্দেশে চিত্তরঞ্জন দাশ ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি কাউন্সিল বর্জন প্রস্তাব গ্রহণ করেন। চিত্তরঞ্জন অশ্বিনীকুমারকে 'গুরু' বলে স্বীকার করতেন। ১৯২১ সালে তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করেছিলেন। ঐ সালেই তাঁর মৃত্যু হয়। জাতিগঠনে অশ্বিনীকুমার তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, "নির্বাণ চাই না, মোক্ষ কামনা করি না, আবার এই পৃথিবীতে আসিতে চাই, আবার খাটিতে চাই।" "কোন্ দেশে?" "এই ভারতবর্ষে।" "কোন্ প্রদেশে?" "সোনার বাংলায়।"

অশ্বিনীকুমার তাঁর শিষ্যদের বলতেন, "যেখানে থাকবি সেখান গরম করে তুলবি।" তিনি নিজেই তো বরিশালকে গরম করে রেখেছিলেন। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের ভাষায়, "তখন সমগ্র বরিশাল এক নেতার অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত হইত। একটি কল টিপিয়া দিলে যেমন হাজার হাজার বিজলা বাতি জ্বলিয়া উঠে, তেমনি বরিশালের লক্ষ লক্ষ লোকের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইত অশ্বিনীকুমারের ইচ্ছা দ্বারা।"

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'চরিত কথায়' অশ্বিনীকুমার সম্বন্ধে বলেছেন, "বহু বৎসরের নিঃস্বার্থ সামাজিক সেবাই জনসাধারণের হৃদয় মন্দিরে তাঁহার জন্য এক অক্ষয় স্বর্ণ-সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহারা তাঁহাকে তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, দুর্দিনের সহায় এবং দুঃখে কষ্টে একান্ত প্রিয়জন বলিয়াই জানে। অগাধ অর্থ দিয়া নহে, বাগ্মিতার মোহিনী শক্তির বলেও নহে, জ্ঞান-গরিমার প্রভাবেও নহে, কিন্তু জনসাধারণের সহিত চিন্তায়, ভাবে ও কার্যে সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়াই যথার্থ-জননায়কের বিশেষত্ব। আমরা এ দেশে অধুনা একমাত্র অশ্বিনীকুমার দত্তেই এই লোক নেতৃত্বের কতকটা আভাষ পাই।"

বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল

বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্র পাল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির মাধ্যমে বাংলা তথা সারা ভারতে জাতীয়তার যে চরম ও নতুন মন্ত্র প্রচার করেছিলেন, তা সেদিন দেশবাসীকে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের পথে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছিল। তিনিই ছিলেন সেই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম জনক ও অগ্রদূত।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে বিপিনচন্দ্র জাতীয়তার অন্যতম উদ্গাতা কেশবচন্দ্র সেন ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁদের আদর্শে উদ্‌বোধিত হয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এঁদের সংস্পর্শে তিনি জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে বিপিনচন্দ্র একদিন সংকল্প গ্রহণ করলেন যে ব্রিটিশ অধিকার থেকে দেশকে মুক্ত করে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন। এই সংকল্প-বাক্য লেখা হয়েছিল তাঁদের বক্ষ রক্তে বটপত্রে।

বিপিনচন্দ্রের বাস্তব রাজনৈতিক গুরু ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁর অসামান্য বাগ্মিতা যৌবনে তাঁকে বিমুগ্ধ করেছিল। উনিশ শতকের অষ্টম দশকের প্রথম দিকে তিনি রাজনীতিতে আগ্রহশীল হন। তবে প্রথমের দিকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ-গ্রহণ করার চেয়ে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রচারে অধিক ব্যস্ত ছিলেন। ১৮৯৮-১৯০০ সালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্ররূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকা পরিদর্শন করেন এবং ভারতীয় চিন্তা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বিশেষ করে ভারতের বেদ, বেদান্ত, দর্শন ও উপনিষদের উপর বহু মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ফলে ভারতের সুউন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোক ঐসব দেশবাসীর চিত্তে গভীর রেখাপাত করে। আমেরিকায় বিপিনচন্দ্র বহু বন্ধু লাভ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর এই অভিজ্ঞতা জন্মেছিল যে দেশকে বিদেশী, বিজাতি নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে না পারলে বিদেশে ভারতের গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। একদিন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আমেরিকান বন্ধু বললেন, "আপনার নিজের দেশ আজও পরাধীন। আপনি এখানে যত ভাল বক্তৃতা দিন না কেন তাতে বিশেষ কিছুই

লাভ হবে না। কারণ, পরাধীন দেশের লোকের কাছ থেকে এই স্বাধীন দেশের জনগণ কোনোও শিক্ষাই গ্রহণ করবে না। তার চেয়ে আপনি ফিরে যান নিজের দেশে, আপনার দেশকে আগে স্বাধীন করুন।"

তাই দেশে ফিরে এসেই বিপিনচন্দ্র স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। ১৯০১ সালে 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দেশে নব জাতীয়তাবোধ নিয়মিত প্রচার করতে সুরু করলেন। কালে এই পত্রিকা নবজাগ্রত ভারতীয় জাতীয়তার মুখপত্র হয়ে উঠেছিল।

১৯০৫-০৮ সাল বিপিনচন্দ্রের জীবনের বিশেষ গৌরবময় যুগ। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে বিরাট জাতীয় অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল, বিপিনচন্দ্র ছিলেন তার অন্যতম পুরোধা। ঐ সময় তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পদব্রজে পরিভ্রমণ করে বয়কট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা ও স্বাধীনতার মন্ত্র উদাত্ত-কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। বাংলাকে দ্বিধা বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রের কথা ইংরেজ শাসক-শক্তি কর্তৃক যখন বিঘোষিত হল, তখন সারা বাংলাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। এই সময় বিদেশী দুঃশাসকদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য দেশবাসীকে আত্মোৎসর্গের আহ্বান জানিয়ে বিপিনচন্দ্র একটি গোপন পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। তিনি লিখলেন, "শুধু কথায় কিছু হবে না—কাজ চাই। রক্তবীজের জাতির কাছ থেকে অত সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে না। যদি না আমরা আমাদের রক্ত দিই, আমাদের দুঃখ দুর্দশার অবসান হবে না।…বাংলার দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। বঙ্গজননীর কি কোনো কর্তব্যপরায়ণ সন্তান নেই? এই দুর্দিনে তোমরা নীরব কেন? ভীত হও না, মরবার জন্য প্রস্তুত হও। জন্মালেই মরতে হবে। বীরের ন্যায় আচরণ কর। অসুরের রক্তে বঙ্গজননীর পূজা কর। শাশ্বত স্বর্গলাভ হবে! হিন্দু ও মুসলমানের বাংলা - সোনার বাংলা ধ্বংসের সম্মুখীন। হিন্দু ও মুসলমান ভাই সব, অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য একতাবদ্ধ হও। ভুলে যেও না মায়ের রক্ত পান করাই শয়তানের কাজ। যে-জাতি আমাদের মাকে হত্যা করে, তারা আমাদের শত্রু। শত্রুকে হত্যা করা মহাপুণ্য।… মাতৃভূমির দুর্দশা দূর করতে চাও তো ফিরিঙ্গি বিতাড়নের জন্য প্রস্তুত হও।"

১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের প্রবীণ হোতা বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠেই স্বাধীনতা সংগ্রামের উষালগ্নে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। এতদিন কংগ্রেস আবেদন-নিবেদন ও ভিক্ষুকের মতো প্রার্থনার মাধ্যমেই বিদেশী শাসকের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টা করে আসছিল। বিপিনচন্দ্র কংগ্রেসের

এই ভিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন, "এখন আর প্রাচীন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে চলিবে না। ইংরেজের অনুকম্পার আশা পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে এখন আত্মশক্তি জাগ্রত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। মুক্তির অন্য কোনো পথ নাই।"

১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে বিপিনচন্দ্রই প্রথম বাংলার ছাত্র ও যুবসমাজকে বজ্রনির্ঘোষে উদাত্ত আহ্বান জানালেন দেশের চরম দুর্দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (তখনকার কথায় গোলামখানা) বর্জন করে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করতে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার ছাত্র বিদ্যালয় বর্জন করল। জাতীয় জনজাগরণের অন্যতম গুরুরূপে, জাতীয়তার ও স্বাধীনতার মন্ত্রদাতা হিসাবে তাঁর সম্মানার্থে ঐ সময় একাধিক গান রচিত হয়েছিল। একটি গানের কথাগুলি এইরূপ :

"বিপিন পালের কথার চোটে
ছেলেরা যে পাগল হলো,
বেঁচে থাক সুরেন ভূপেন আবার
দেশের আদর হলো।"

বিপিনচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র কেবল বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নিরলসভাবে ভ্রমণ করে সর্বত্র তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় জাতীয়তার, স্বাদেশিকতার মন্ত্র প্রচার করেছিলেন। তাঁর বাগ্মিতার আবেগময়তা, আন্তরিকতা দেশবাসীকে স্বদেশহিত ব্রত গ্রহণে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯০৭ সালে মাদ্রাজ সমুদ্র সৈকতে বিপিনচন্দ্র যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাহাই দাক্ষিণাত্য-বাসীদের নিকট ছিল জাতীয়তার প্রথম পাঠ; তাদের প্রথম রাজনৈতিক শিক্ষা। মাদ্রাজে বিপিনচন্দ্রের কয়েকটি বক্তৃতার পরেই মাদ্রাজীদের মধ্যে স্বাদেশিকতাবোধ তীব্রভাবে জাগ্রত হয়। তাঁর অভিভাষণগুলি দক্ষিণ ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তার বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত করেছিল। দক্ষিণভারতের তৎকালীন বিখ্যাত নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলেছিলেন, "বাগ্মিতার এমন সাফল্য এর পূর্বে ভাবতে কখনো কল্পনা করা যায় নাই। কথিত শব্দের শক্তি কখনো এরূপভাবে প্রদর্শিত হয় নাই।" মাদ্রাজে বিপিনচন্দ্রের অগ্নিস্রাবী বক্তৃতার ফলে দক্ষিণ ভারতে যে বিপ্লবের মনোভাব দেখা দিয়েছিল তা থেকে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিণ্টো, তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড মর্লিকে লিখেছিলেন, "বিপিনচন্দ্র পাল দেশে যেভাবে বিপ্লবের কথা প্রচার করছেন, আমার মনে হয় তাঁকে আর এরূপ করতে দেওয়া ঠিক হবে না।"

বিপিনচন্দ্র কংগ্রেসের জন্মক্ষণ থেকেই এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এবং

এর প্রত্যেক অধিবেশনে নানা সংস্কার সাধনের প্রয়াস পেতেন। ১৯০৬ সালে কলকাতায় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাতে বিপিনচন্দ্র এই মর্মে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন যে বিদেশী হস্তক্ষেপ বর্জিত স্বায়ত্তশাসনই এই মুহূর্তে দেশের পক্ষে জরুরী প্রয়োজন। ঐ স্মরণীয় অধিবেশনে সর্বপ্রথম স্বরাজই জাতির লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র এই স্বরাজের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে স্বরাজ অর্থে বিদেশী হস্তক্ষেপবর্জিত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনই বোঝায়। "আমার বিবেচনায় স্বরাজ দান হিসাবে প্রদত্ত হইতে পারে না। জাতির আপন চেষ্টায় ইহা অর্জিত হওয়া উচিত। যদি ব্রিটিশরা বলে, স্বরাজ গ্রহণ কর, আমি উহা ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিব। কারণ, যে জিনিস আমার অর্জিত নয় তা আমি গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করিব এবং আমাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য বিরোধী শক্তিকে বাধ্য করিব। আমাদের সংগ্রামের হাতিয়ার হচ্ছে ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। আমরা গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিব এবং সদৃশ সরকার গঠন করিব।"

বিপিনচন্দ্রের এই প্রস্তাবের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দু'টি দলের উদ্ভব হল—মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী। প্রথম দলে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজশা মেহতা প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় দলে ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপত‌রায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি। ঐ সমসাময়িক কালে বিপিনচন্দ্রই ছিলেন প্রধান বিপ্লবী নেতা। তিনিই দেশের যুব সম্প্রদায়ের মনে বিপ্লবের বীজ উপ্ত করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র আজীবনই বিপ্লবী ছিলেন। একবার কলকাতায় তাঁর সম্মানে আয়োজিত বিরাট এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন, "যে সংগ্রামে আমরা লিপ্ত হয়েছি, সে শুধু আমাদের দেশ বা জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নয়; সমগ্র বিশ্বমানবের মঙ্গলের জন্য। আমরা কেবল আমাদের জন্য, ভারতের জন্য বা এশিয়ার জন্যই সংগ্রাম করছি না, আমরা ইংলণ্ড, ইউরোপ এবং সারা বিশ্বের জন্যই সংগ্রাম করছি। এই ভারতের মুক্তির সঙ্গে মানব জাতির মুক্তি নিহিত।"

বাংলা তথা ভারতের সর্বত্র বিপিনচন্দ্র চরমপন্থীদলের মতাদর্শ প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দেশ ও কংগ্রেস যে মাতৃভূমির মুক্তির উদগ্র কামনায় সংগ্রাম প্রবণ হয়ে উঠেছিল তা বিপিনচন্দ্রেরই বলিষ্ঠ জাতীয় মন্ত্র প্রচারের প্রত্যক্ষ ফল। রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক অভিভাষণে বিপিনচন্দ্র একবার বলেছিলেন, "যখন কোনো ডাকাত দল আমাদের আক্রমণ করে তখন আমরা কি করি? তখন কি আমরা নীরব থাকি? এখন বিদেশী দস্যুদল আমাদের আক্রমণ করছে। এস আমরা সবাই মিলে দেশের জন্য

কাজ করি। ত্রিশ কোটি ভারতবাসী যদি মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য জেগে ওঠে, তবে কয়েক লাখ ইংরেজ কী করতে পারে ?" সে যুগে বিপিনচন্দ্রের মতো অন্য কোনো নেতা বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের চিত্তকে এত প্রবলভাবে উত্তেজিত করতে সমর্থ হন নি। যখনই কোনো অঞ্চলে আন্দোলন স্তিমিত হবার উপক্রম দেখা দিত, তখনই বিপিনচন্দ্র সেখানে গিয়ে তাঁর উদ্দীপনাময়ী অভিভাষণের সাহায্যে আবার সংগ্রামী জনগণকে আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহে জাগিয়ে তুলতেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল প্রবল প্রেরণাদায়ক—যে একবার শুনেছে সে প্রভাবিত না হয়ে পারে নি।

শ্রীঅরবিন্দ বিপিনচন্দ্রকে "জাতীয়তার অন্যতম শক্তিশালী ভবিষ্যৎ বক্তা," "সমসাময়িক কালের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তানায়ক ও সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ আখ্যায় অভিহিত করেছিলেন।

বিপিনচন্দ্র ছিলেন ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার অকুণ্ঠ পরিপোষক। মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধির মানসে তিনি দেশে বিদেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রচার করেছিলেন। সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় ছিল তাঁর অসামান্য অধিকার। ইংরেজী ও বাংলা বহু পত্রপত্রিকার তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। তাছাড়া, ইংরেজী ও বাংলা বহু পত্রিকায় তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর বাগ্মিতা ছিল যেমন অগ্নিস্রাবী, সাহিত্যও ছিল তেমনি উদ্দীপনাময়ী। দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে আজও তার প্রভাব অসামান্য। স্বাধীনতার নির্ভীক পতাকাবাহী বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল বাংলা তথা ভারতের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই মনীষীপ্রবর ১৮৫৮ সালের ৭ই নভেম্বর শ্রীহট্ট জেলার পৈল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর ১৯২২ সালের মে মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

জাতীয় জাগরণের অবিসংবাদী মন্ত্রগুরু হিসাবে বিপিনচন্দ্র সম্বন্ধে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেছেন, "আমার বিচারে সে যুগের আসল নেতা বিপিন পাল। ১৯০৫ সনের আগষ্ট হইতে ১৯০৮ সন পর্যন্ত বাঙালী জাতিকে তাতিয়ে তুলবার ভার ছিল বিপিন পালের হাতে। বিপিন পালের গলার আওয়াজ না শুনলে যুবক বাংলার জন্ম হত না। বিদ্যায়, রাষ্ট্রনীতি, জ্ঞানে, দার্শনিকতায়, বিপ্লবী ভাবনায়, কর্তব্যনিষ্ঠায় বিপিন পালের ঠাঁই ছিল উঁচু। আমি বিপিন পালকে বঙ্গ-বিপ্লবের জন্মদাতা ও নেতা বলে সম্বর্ধনা করে থাকি।"

দেশগৌরব বিজ্ঞানাচার্য

জগদীশচন্দ্র বসু

বিজ্ঞান-সাধনার দ্বারা যাঁরা আমাদের মাতৃভূমিকে গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। প্রাচীন ভারত ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে তার নব নব উন্মেষশালিনী শক্তি বিশ্বকে বিস্ময়-বিমূঢ় করেছিল। কিন্তু তারপর প্রায় সুদীর্ঘ সহস্র বছরের পরাধীনতার পাপপঙ্কে নিমগ্ন থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার মৌলিকতার সূত্রটি গেল হারিয়ে। ফলে বিদেশীরা বিশেষ করে এদেশের ইংরেজ শাসকরা ভেবেছিল যে ভারতের উদ্ভাবনীশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের দেওয়ার কিছুই নেই। ক্ষমতা মদমত্ত কপট ইংরেজ শাসকের এই ধারণাকে মিথ্যা ও অমূলক প্রতিপন্ন করার জন্য এগিয়ে এলেন জগদীশচন্দ্র। মাতৃভূমির অগৌরব সেদিন তাঁর বুকে শেলবিদ্ধ করেছিল। তিনি মনে মনে কঠোর সংকল্প করেছিলেন যে বিজ্ঞানে বঙ্গভূমি তথা মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে বিশ্বের আসনে সমাসীন করবেনই। এই সুতীব্র জাতীয়তাবোধ বা স্বাদেশিকতাই বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ব্যক্তিগত নামযশের চেয়ে দেশের খ্যাতি বৃদ্ধিই ছিল তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার আসল প্রেরণা। তাঁরই প্রেরণায় পরবর্তীকালে শত শত ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের মনে আত্মশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞানাচার্যের বিরাট সাফল্যে সেদিন ভারতের জাতীয় জাগরণ শক্তি সঞ্চয় করেছিল।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাঢ়িখাল গ্রামে ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা ভগবানচন্দ্র ছিলেন তাঁর জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু। সরকারী চাকরি করলেও স্বাদেশিকতাই ছিল ভগবানচন্দ্রের ধ্যান ও জ্ঞান। তিনি তাঁর সকল চিন্তা-ভাবনা ও সমস্ত ধনসম্পদ জাতির সেবায় নিয়োজিত করে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন।

বিলেতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে ফিরে এলে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। অধ্যাপনায় তাঁর বিশেষ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ অধ্যাপকদের

সমান মাইনে তিনি পেলেন না। বিদেশী শাসকের এই হীন বৈষম্যমূলক নীতিতে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন বিজ্ঞানাচার্য। তাঁর প্রতি এই অপমান তাঁর জাতীয় অপমান ভেবে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু কোনো কাজ না হওয়ায় তিনি মাইনে না নিয়েই অধ্যাপনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কলেজে জগদীশচন্দ্র ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষক। বিনা বেতনে তিনি এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যাপনা করতেন যে অধ্যক্ষ টনি সাহেব পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যেতেন। পুরো তিন বছর তিনি মাইনে না নিয়েই পড়িয়ে গেলেন। অবশেষে তাঁর তেজস্বিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার কাছে ব্রিটিশ সিংহকে হার মানতে হল। তিনি পুরো বেতনে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হলেন। এমন কি তিন বছরের পুরো মাইনে তিনি এককালীন পেলেন। সেই থেকে ইংরেজ ও ভারতীয় অধ্যাপকদের মধ্যে বেতনের বৈষম্য প্রথাও উঠে গেল। এইভাবে জগদীশচন্দ্র একক সংগ্রামের দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে নিজের ও জাতির মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের আসনে পূর্ণ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের গবেষণায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। ক্লাসে চার ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে দিনরাত্রির বাকী সময় তিনি গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন। ক্লাসে ছাত্রদের পড়াবার সময় তাঁকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের নাম করতে হত। কিন্তু এ যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে কোনো ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের নামোল্লেখ করতে না পারায় তিনি অত্যন্ত বিষণ্নবোধ করতেন। প্রসঙ্গক্রমে একবার তিনি বলেছিলেন, "শিক্ষার্থে অন্যে যাহা বলিয়াছে, তাহাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধান কার্য কোন দিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম।...তখন মনে হইল অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমার কর্মভূমি।" সেই থেকে তিনি সংকল্প গ্রহণ করলেন যে বিশ্বের বিজ্ঞান-সভায় ভারতের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবেনই।

প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগার ছিল অতি সাধারণ। তাতে তাঁর কাজের খুব অসুবিধা হত। কর্তৃপক্ষকে একটি উন্নত গবেষণাগারের জন্য কত লিখলেন। কিন্তু শাসক যেখানে বিদেশী বিজাতি তাদের কাছ থেকে কোনো মহৎ প্রচেষ্টায় সহায়তার আশা করা বৃথা। তারা চাইত না যে কোনো ভারতবাসী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃতী হোক। জগদীশচন্দ্র কিন্তু দমবার পাত্র ছিলেন না। তাঁর ছিল অসাধারণ উদ্ভাবনী প্রতিভা। গবেষণাগারে ভাল যন্ত্রপাতি না থাকলেও তিনি নিজে অনেক নতুন নতুন যন্ত্রের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করলেন এবং দেশীয় কারিগরদের সাহায্যে তৈরী করে কাজ চালাতে লাগলেন। পরবর্তীকালে তিনি তরুণ বিজ্ঞান-সাধকদের উৎসাহিত করে

বলতেন, "কোটি টাকায় তৈরী বীক্ষণাগারে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় না। প্রকৃত অনুশীলন দ্বারাই যথার্থ আবিষ্কার সম্ভব। অসুবিধা আছে, অনেক বাধা আছে সত্য; কিন্তু তার জন্যে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়লে চলবে না। অবসাদ ঘুচাও। দুর্বলতা পরিত্যাগ করো।" এইভাবে তরুণ বিজ্ঞানীদের পরদেশী শাসকদের অবহেলা অবজ্ঞাকে উপেক্ষা করে মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করতে শিক্ষা দিতেন।

জগদীশচন্দ্র তাঁর প্রথম গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন পদার্থ বিদ্যার উপর। তাঁর মৌলিক গবেষণার বিবরণ লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সারা বিশ্ব বিস্মিত হয়ে গেল। তাঁর ও তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষের নাম প্রশংসিত হল দেশে দেশে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. এস. সি. উপাধি প্রদান করলেন। সেই থেকে জগদীশচন্দ্র হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র।

জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহ প্রথমে মাতৃভাষা বাংলায় প্রকাশ করেন। তাঁর সকল্প ছিল তাঁর গবেষণা যখন মৌলিক, তখন বিশ্বের অন্যান্য বিজ্ঞানীরা যদি তাঁর আবিষ্কারের বিষয় জানতে চান, তবে তাঁরা গবেষকের মাতৃভাষা বাংলা শিখেই জানুন। আসল উদ্দেশ্য তিনি চেয়েছিলেন মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধি করতে। ইহাই যে-কোনো স্বাধীনচেতা ও জাতীয় মর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির যোগ্য চিন্তা। জগদীশচন্দ্রের আপন ভাষায়, "আমার যাহা কিছু আবিষ্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা সর্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল।...বিজ্ঞানক্ষেত্রে ভারতবাসীর যে নিন্দা ঘোষিত হইত, তাহার বিরুদ্ধে যুঝিতে যাইয়া আমি বারংবার প্রতিহত হইয়াছিলাম। কিন্তু ঘোরতর নিরাশার মধ্যেও আমি পরাজয় স্বীকার করি নাই। এই সুদীর্ঘ পরিণামে যদি জয়মাল্য আহরণ করিয়া থাকি, তবে তাহা দেশলক্ষ্মীর চরণেই নিবেদন করিতেছি।"

আচার্য জগদীশচন্দ্রই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে বেতারের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করেন। কিন্তু সহানুভূতিহীন বিদেশী সরকারের উদাসীনতার জন্য তাঁর সেই তথ্যগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়-নি। কিছুদিন পরে ইতালীর মার্কনি বেতার আবিষ্কারের সম্মান লাভ করেন। তবে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা বিশ্ববন্দিত হয়েছিল। ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি তাঁকে অভিনন্দিত করে লিখেছিলেন, "আপনার আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা আপনি বিজ্ঞানকে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। দুই হাজার বছর পূর্বে আপনার পূর্বপুরুষগণ মানব সভ্যতার অগ্রণী ছিলেন এবং বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক জগৎ সমক্ষে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। আপনি আপনার পূর্বপুরুষদিগের গৌরবকীর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করুন।" অধ্যাপক

লাফোঁ এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "প্রিয় জগদীশ, তুমিই যে মার্কনির পূর্বে বেতারে বার্তা প্রেরণে সমর্থ হইয়াছ, তাহা আমি সকলকে জানাইতে চাই।" এইভাবে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিশ্বের বিজ্ঞানক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় মর্যাদা বহুল পরিমাণে বর্ধিত করেছে। ভারতের তরুণ বৈজ্ঞানিকদের সামনে তিনি আশা ও উদ্দীপনার এক অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছিলেন। নবজাগ্রত ভারতের সামনে সেদিন জগদীশচন্দ্র ছিলেন প্রেরণার এক মূর্ত প্রতীক।

বেতার আবিষ্কারের গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেও জগদীশচন্দ্র হতোদ্যম হলেন না। তিনি নতুন উদ্যমে অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে উদ্ভিদ বিদ্যায় গবেষণার কাজ সুরু করলেন। এই গবেষণায়ও অচিরেই তিনি যুগান্তর আনয়ন করলেন। তিনি বৃক্ষ, লতা, কাঠ, পাথর প্রভৃতি জড় বস্তুর মধ্যে যে প্রাণের স্পন্দন আছে তা সপ্রমাণ করলেন। হাজার হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত সমস্ত বস্তুর মধ্যে চৈতন্যের সাড়া উপলব্ধি করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র ভারতের সেই সুপ্রাচীন উপলব্ধ সত্যকে বর্তমান বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে সুপ্রমাণিত করে ভারতের শাশ্বত চিন্তার মৌলিকতা জগৎ সমক্ষে পুনরুদ্ঘাটিত করলেন। পরাধীন ভারতের জাতীয় মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। ভারতের জাতীয় জাগরণ আশার ও উদ্দীপনার নব বলে বলীয়ান হল। শক্তি পেল, প্রেরণা পেল ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের তরুণ সাধক দল। জগদীশচন্দ্রের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা দৃষ্টে সমগ্র বিশ্ব ভারতের সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হল।

জড়ের-মধ্যে প্রাণের স্পন্দনের কথা বহু বৈজ্ঞানিকের কাছে সম্পূর্ণ নতুন লাগল। জগদীশচন্দ্র বললেন, "তিন হাজার বছর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। বিশ্বের প্রতি বস্তুতে তাঁরা কল্পনা দিয়ে যে চেতনার প্রবাহ অনুভব করেছিলেন, তাকেই আমি সপ্রমাণ করলাম গবেষণাগারের পরীক্ষায়। আমার কৃতিত্ব এইটুকুই।"

১৯০০ সালে ফ্রান্সের প্যারী নগরীতে আন্তর্জাতিক পদার্থ বিজ্ঞানের এক মহাসম্মেলন হয়। তাতে জগদীশচন্দ্র আমন্ত্রিত হন। ঐ সময় স্বামী বিবেকানন্দও প্যারীতে ছিলেন। সম্মেলনে জগদীশচন্দ্রের অসামান্য সাফল্য দেখে স্বামীজী স্বদেশের জন্য অত্যন্ত গর্ব অনুভব করেন। তিনি লিখলেন, "নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জন-সঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এই প্যারীতে।...সে বহু গৌরবর্ণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস। একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্ত্য

মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎ সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করলো। সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী—বঙ্গবাসী।"

ইউরোপে জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্বে অভিভূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি অভিনন্দনমূলক কবিতা লেখেন :

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্য খানি
সেথা হতে আনি
দীনাহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে ॥

ইউরোপে বিজ্ঞান-চর্চায় উৎসাহ দেখে জগদীশচন্দ্র বিস্মিত হতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের দেশের কথা মনে পড়ত। স্বদেশে সাধনাবিমুখতা দেখে তিনি ব্যথিত হতেন। রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "প্যারীতে যা যা দেখলাম, তাতে যেমন নতুন বিজ্ঞানের প্রভাব দেখে সুখী হয়েছি, তেমনি দেশের কথা ভেবে নিরুৎসাহ হয়েছি। এই ভয়ানক জীবন-সংগ্রাম নির্মম বিরামহীন—এই সংগ্রামে যারা একটু পেছনে পড়ে থাকে, তারা একদিন নির্মূল হয়ে যাবে। এখানে কী ব্যগ্রতা। একটা নতুন আবিষ্কার হলো, আর অমনি তা কাজে লাগলো। · আমাদের মতো উদ্যমহীন অকর্মঠ জাতি আর কতকাল বেঁচে থাকবে ? এসব মনে করে মনের জ্বালা সম্বরণ করা অসম্ভব। সম্মুখে আশার আলো দেখলে মনে উৎসাহ আসে, কিন্তু ব্যর্থ উদ্যম নিয়ে কে জীবন বইতে পারে ?"

প্যারী থেকে জগদীশচন্দ্র লণ্ডনে এলেন বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত বিজ্ঞান সভা রয়েল সোসাইটিতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। সঙ্গে ছিলেন প্রেরণাদাত্রী ভগিনী নিবেদিতা। ঐ মহাসভায় জগদীশচন্দ্র তাঁর অসামান্য প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন দেখে নিবেদিতা ভারতের গৌরবে গৌরবান্বিতা ও অনুপ্রাণিতা হয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন, "আমরা অনুভব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ শিষ্যভাবে নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক সভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞান-শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল। পদার্থতত্ত্বসন্ধানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।"

জগদীশচন্দ্রের অভিনব আবিষ্কারে মুগ্ধ হয়ে বিলেতের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে

গবেষণা ও অধ্যাপনার আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু স্বদেশপ্রাণ জগদীশচন্দ্রের চিত্তপটে ছিল স্বদেশজননীর ধ্যানমূর্তি। নানা অসুবিধার কথা জেনেও তিনি ভারতে থেকে কাজ করা শ্রেয় মনে করলেন। এ বিষয়ে তিনি বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "একদিকে আমার কাজের জন্য অসীম পরিশ্রম ও অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্যদিকে আমার সমস্ত মন প্রাণ দুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। আমার সমস্ত অনুপ্রেরণার মূলে আমার স্বদেশী লোকের স্নেহ। সেই স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল ?" এমনই জাতীয়তাবোধে ভরপুর ছিল জগদীশচন্দ্রের কোমল অন্তর। বন্ধুর কৃতিত্বে, দেশজননীর গৌরবে গৌরবান্বিত রবীন্দ্রনাথ গদ্যে-পদ্যে জগদীশচন্দ্রকে বারবার অভিনন্দন জানাতে লাগলেন তাঁকে অনুপ্রাণিত করার জন্য। ১৩০৮ সালে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হল :

"হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জনে
'উত্তিষ্ঠত! নিবোধত'। ডাক শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে। সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে। ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম-পূতাগ্নি ঘিরিয়া।
আর বার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,—বসুক সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধশান্ত গুরুর বেদীতে।"

বন্ধুর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে জগদীশচন্দ্র দূরদেশে থেকে নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে নতুন প্রেরণা লাভ করতেন। তাঁর প্রেরণার আর এক উৎস ছিল মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধির বাসনা। তিনি রবীন্দ্রনাথকে একবার এক পত্রে লিখেছিলেন, "তোমার পত্র ও কবিতা পাইয়া আমি কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা জানাইতে পারি না। তুমি কি জান যে, এই বিদেশে থাকিয়া, দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমার মন কিরূপ অবসন্ন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ? সম্মুখে অজ্ঞাত রাজ্য, আমি একাকী পথ খুঁজিয়া একান্ত ক্লান্ত, কখনও একটু আলোক পাই তাহার সন্ধানে চলিতেছি। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই—সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে ? তোমাদের স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়, তোমরা আমার উৎসাহে উৎসাহিত, তোমাদের বলে আমি বলিয়ান। তোমাদের আশাতে আমি আশান্বিত।"

অপর এক পত্রে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, "গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে প্রস্ফুটিত হইল ?—কেবল গাছের

গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরিয়া হোমানলের অগ্নি অনির্বাপিত রহিয়াছে। কোটি কোটি হিন্দু-সন্তান প্রাণবায়ু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক কণা এই দূরদেশে আসিয়া পড়িয়াছে।...আমি শত বাধা পাইয়াও ভগ্নোদ্যম হইব না এবং তোমাদের জন্য জয়লাভ করিব।"

কি গবেষণায়, অধ্যয়নে, অধ্যাপনায় সমস্ত কর্মেই প্রতিটি মুহূর্ত স্বদেশ-জননীর গৌরব বৃদ্ধি করাই ছিল জগদীশচন্দ্রের একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান। ইউরোপ পরিভ্রমণকালে বিদেশী কিছু বৈজ্ঞানিকের কাছে যখন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতেন, তখন মাঝে মাঝে প্রেরণা লাভের আশায় তিনি স্বদেশে ফিরে আসবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতেন। একবার রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "আমি একবার ক'দিন ভারতের মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া জীবন পাইতে চাই।"

"আমাদের হৃদয়ের মূলে ভারতবর্ষ"—এই চিন্তাই ছিল জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার মূল আদর্শ। তাঁর সাধনা যে ব্যক্তির নয়, জাতির একথা জগদীশচন্দ্র বহুবার বহুপত্রে বলেছেন রবীন্দ্রনাথকে। কবি তাঁকে এক পত্রে অনুপ্রাণিত করে লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কারো হাতে দেন নাই—তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি বসিবে—সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্য সমীরণে নির্মল এবং সূর্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন।"

জগদীশচন্দ্রের বিশ্ববিমুগ্ধ সাফল্যে সমগ্র দেশবাসী গৌরবান্বিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তিনি বিজ্ঞানের জয়মাল্য পরে দেশে ফিরে এলে দেশবাসী তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা জানিয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন,

'জয় তব হোক জয়।
অবারিত গতি তব জয়রথ
ফিরে যেন আজি সকল জগৎ।
দুঃখ দীনতা যা আছে মোদের
তোমারে বাঁধি না রয়।

বৈজ্ঞানিক জীবনের সুরু থেকেই জগদীশচন্দ্র একটি ভাল গবেষণাগারের অভাব অনুভব করছিলেন। কিন্তু বিদেশী শাসকের ঔদাসীন্যে তা তাঁর কপালে জুটে নি। বহু সাধ্য-

সাধনার ফলে ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর তাঁর ষষ্টিতম জন্মদিনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পাশেই বসু-বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গবেষণা-মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শে নির্মিত হয়। ইহা ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার পরম তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ। দেশ-বিদেশের বহু মনীষী বসু-বিজ্ঞান মন্দির দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। এটি আমাদের জাতীয় মর্যাদার প্রতীক। এই গবেষণা-মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি গান বিশেষ উল্লেখ্য :.

"মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গণে
করো মহোজ্জ্বল আজ হে !
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে !
... ...
এস জ্ঞানী এস কর্মী,
নাশ ভারত লাজ হে।"

বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্বোধনী ভাষণে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, "ভারতবাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধান কার্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, কোনো সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনোদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সেই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমার কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের নহে।"

"আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতে জ্ঞান সার্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশীলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি।"

কলিকাতা করপোরেশনের এক সম্বর্ধনা সভায় জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, "একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে আমরা পুণ্যভূমি ভারতের অধিবাসী, এই-ই আমাদের গর্ব, এই-ই আমাদের গৌরব। আমরা আজো ভারতবাসী, আমরা চিরদিনই ভারতবাসী।"

স্বদেশপ্রেমই ছিল জগদীশচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র। দেশপ্রেম নিছক রাজনীতি বা সমাজসেবাতেই আবদ্ধ নয়। যে-কোনো মহৎ কর্মের দ্বারা দেশের মুখোজ্জ্বল করাই দেশপ্রেম। বিজ্ঞান চর্চার দ্বারা দেশের মর্যাদা বিশ্বের নিকট তুলে ধরাই ছিল

জগদীশচন্দ্রের দেশপ্রেম। অতীতে ভারতবর্ষ অনেক কিছু দিয়েছিল বিশ্বকে। তখন গুরুর আসনে সমাসীন ছিল ভারতবর্ষ। তারপর দীর্ঘ বিরতির পর জগদীশচন্দ্রের সাধনায় ভারত বর্তমানযুগে আবার গুরুর আসন ফিরে পেল। জগদীশচন্দ্র ভারতের অতীত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর সাধনায় ভারতের জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। তাই ভারতবাসী সেদিন জগদীশচন্দ্রকে প্রণাম জানিয়েছে। তাঁর সাধনার সিদ্ধিলাভে আমরা বুঝতে পারলাম যে কেবল রাজনীতি বা সমাজসেবাতেই দেশপ্রেম সীমাবদ্ধ নয়; কর্মের দ্বারা সাধনার দ্বারা দেশের গৌরববৃদ্ধিও দেশপ্রেম।

বিজ্ঞান-সাধনায় নিমগ্ন থাকলেও পরাধীন দেশের নানা সমস্যার প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। দেশবাসীকে শ্রমবিমুখ দেখে ব্যথিত চিত্তে তিনি বলতেন, "স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে। যদি বাঁচিতে চাও, তবে কশাঘাত করিয়া নিজেকে জাগ্রত কর।" পল্লীর কৃষক শ্রমিকদের দুর্দশা দেখে তিনি অন্তরে অত্যন্ত বেদনাবোধ করতেন। শিক্ষিত সমাজসেবী ও দেশপ্রেমিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন, "সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে দেখিতে পাইবে পথে অর্ধ নিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই পতিত শ্রেণীরাই ধনধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই। কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চির-বেদনা নিহিত আছে।"

বিজ্ঞান সাধনায় রত দেশের তরুণদের উদ্দেশে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, "পরীক্ষাসাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তর-দৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই, সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোনো কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করিবার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না। দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ, দেবী সরস্বতীর যে নির্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।"

বিজ্ঞানী হলেও বাংলা সাহিত্যের প্রতি জগদীশচন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনেক প্রবন্ধ বাংলায় লিখেছিলেন। তাঁর বাংলা প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'অব্যক্ত' বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সংযোজন। তাঁর রচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁকে (জগদীশচন্দ্রকে) বিজ্ঞান-সরস্বতী উপাধি দেওয়া যেতে পারে। প্রখ্যাত প্রবন্ধকার প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়, "জগদীশচন্দ্র মাতৃভাষার মন্দির প্রাঙ্গণে অনেকগুলি সম্ভাবনার দীপ জ্বালিয়েছিলেন। বিধিনির্দিষ্ট প্রেরণা তাঁহাকে অন্যপথে চালিত না করিলে এই সম্ভাবনার দীপগুলি উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল হইয়া বাংলা সাহিত্যাকাশে এক অক্ষয় সপ্তর্ষিমণ্ডল রচনা করিতে পারিত—সেই শক্তি, সেই কবিমন, সেই সরস প্রসাদগুণ তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।"

'বন্দেমাতরম্'কে জাতীয় সঙ্গীতরূপে নির্বাচনকালে ১৯৩৭ সালে যখন সারা ভারতে তুমুল বিতর্ক চলে, তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র এ সম্পর্কে আচার্য জগদীশচন্দ্রের অভিমত প্রার্থনা করলে উত্তরে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন, "যাঁহার কল্যাণে আমরা পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হইয়া আসিতেছি, সেই জন্মভূমি ও জননীর মধ্যে সন্তান কি ভেদ কল্পনা করিতে পারে? জননী জন্মভূমির নামের ধ্বনি হৃদয় হইতে স্বতই উৎসারিত হইয়াছে এবং উহা আপনা আপনি সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ, ঐ ধ্বনি ভারতের অন্তর্নিহিত প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে।"

জগদীশচন্দ্রের তিরোধানের পর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বিজ্ঞানের সাধনায় তিনি তাঁর কৃতিত্ব অসমাপ্ত রেখে যান নি, বিদায় নেওয়ার দ্বারা তিনি দেশকে বঞ্চিত করেন নি। যা অজর, যা অমর তা রইল।...তাঁর চরিত্রে সংকল্পের যে একটি সুদৃঢ় শক্তি ছিল, তার দ্বারা তিনি অসাধ্যসাধন করেছিলেন। সমস্ত বাহ্য বাধা অতিক্রম করে তাঁর কর্মজীবন পরিব্যপ্ত হয়েছিল বিশ্বভূমিকায়।"

বর্তমান বিশ্বের সঙ্কটময় মুহূর্তে জগদীশচন্দ্রের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, "বিজ্ঞানীরা আজ রাষ্ট্ররথচক্রে আবদ্ধ এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের দ্বারা পরিচালিত। আজ তাই জগদীশচন্দ্রের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সেতুবন্ধনের যে বাণী তিনি প্রচার করেছিলেন, বিশ্বকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার মন্ত্র তারই মধ্যে নিহিত আছে।"

বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

বাংলা তথা ভারতে মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দের মতো তিনিও সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। গৈরিক পরিধান করলেও মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সর্বপ্রকার আপোষমূলক প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ক্ষাত্রশক্তির সাহায্যে দেশকে মুক্ত করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে করুণা ভিক্ষা করে, আপোষ রক্ষা করে কোনো পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করতে পারে নি। ভারতকে স্বাধীন করতে হলে চাই ক্ষাত্রশক্তির পুনরুত্থান—চাই অস্ত্রবল। তাই এই দূরদর্শী বিপ্লবী মুক্তিসাধক বাঙ্গালাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন।
ব্রহ্মবান্ধবের পারিবারিক নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৬১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলার খন্যান গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি দেশের দুঃখ, দারিদ্র্য ও পরাধীনতার মর্মজ্বালা গভীরভাবে অনুভব করতেন। দিনরাত তিনি বিদেশী বিতাড়নের চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। অবশেষে একদিন গোপনে বাড়ী ছেড়ে গোয়ালিয়রে পালিয়ে গেলেন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করতে। কিন্তু ধরা পড়ে বাড়ী ফিরে এসে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। তখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই কলেজের অধ্যাপক। তাঁর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় ভবানীচরণ গভীরভাবে অভিভূত হন। এই সময় তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন যে মসী নয় অসির সাহায্যেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনতে হবে। এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি আবার গোয়ালিয়র পালালেন সামরিক শিক্ষা আয়ত্ত করতে। কিন্তু বিশেষ কোনো সুবিধা করতে না পেরে দেশে ফিরে আসেন।
ভবানীচরণ বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন হলেও ধর্মপরায়ণও ছিলেন। ১৮৯৪ সালে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করে গেরুয়া পরতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁর নাম হয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে "ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করলে ব্রহ্মবান্ধব তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন। তাঁর চিতাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মবান্ধব প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি স্বামীজীর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করবেন। ভারত পরাধীন হলেও ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি বিলেত যাত্রা করেন। ইংরেজরা দৈহিক বলে এদেশ অধিকার করে রেখেছিল। ব্রহ্মবান্ধব ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বলে ইংরেজের মন অধিকার করতে চাইলেন। তিনি বলেছিলেন, "ফিরিঙ্গীরা ভারতের পদতলে বসিয়া যেদিন আমাদের বেদবেদান্তের পাঠ লইবে, সেদিন উহাদের দর্প চূর্ণ হইয়া ফিরিঙ্গীর ভারত জয়ের প্রতিশোধ হইবে।" তিনি বিলেতের সর্বত্র ঘূর্ণিবাত্যার মতো পরিভ্রমণ করে ভারতীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনাদির মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণে বিলেতী সমাজে রীতিমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল।

বিলেতে ফিরিঙ্গী বিজয় অভিযান শেষ করে ব্রহ্মবান্ধব দেশে ফিরে আসেন এবং এরপর তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। প্রাণাধিক প্রিয় মাতৃভূমির পরাধীনতার গ্লানি তাঁর চিত্তকে অস্থির করে তুলেছিল। তাই নির্জনবাসের বাসনা ত্যাগ করে সংগ্রামী জীবনকেই বরণ করে নিলেন। তাঁর নিজের কথায়, "আমাদের ঘর নাই— পুত্র কলত্র কেহই নাই। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে নর্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া সেই নিভৃত স্থানে ধ্যান-ধারণায় জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে কি এক কথা শুনিলাম। ...ভারত আবার স্বাধীন হইবে।...আমি চন্দ্র দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে আমি ঐ মুক্তির সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি। আমি দেখিতেছি স্থানে স্থানে স্বরাজ-গড় নির্মিত হইয়াছে। সেখানে ফিরিঙ্গীর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকিবে না! আর গোলাম গড়ে থাকিতে চাই না। ঐ স্বরাজগড় গড়িতে—স্বরাজ-তন্ত্রের প্রজা হইতে—আমার প্রাণ সদাই আনচান।"

স্বদেশবাসীর মনে সত্যিকারের জাতীয়তাবোধ তীব্রভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ সুরু করলেন ১৯০৪ সালে ২০শে নভেম্বর। প্রতিদিন সন্ধ্যায় 'সন্ধ্যা' প্রকাশিত হত। এর দাম ছিল এক পয়সা। 'সন্ধ্যা' প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব লিখেছিলেন, "আমরা এক নূতন স্বরাজশীল ব্যবস্থা কায়েম করতে চাই যা আমাদের শিক্ষানীতিকে পরিচালিত করবে,যা আমাদের ধনপ্রাণ,আমাদের

ব্যবসা-বাণিজ্য, আমাদের কৃষিকার্য, আমাদের আইন-কানুন ও অন্যান্য সবকিছু রক্ষা করবে। আমরা চিরদিন বিদেশী শাসনাধীনে থাকতে চাই না। আমরা জানি বর্তমানে পূর্ণ স্বরাজলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু সেই লক্ষ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি যেন সদা-সর্বদা জাগ্রত থাকে।" আবেদন নিবেদন নয়, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বরাজ ও পূর্ণ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়াই ছিল বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধবের সংকল্প। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। 'সন্ধ্যা'র পৃষ্ঠায় এই মত অত্যন্ত জোরালো ভাষায় প্রচার করতেন। তাঁর উদ্দীপনাময়ী তেজোদীপ্ত ভাষায় সমগ্র দেশ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। তাঁর এক জীবনীকারের কথায়, "যখন দেশের 'স্বদেশ-উদ্ধারকারী' ভিখারীর দল সরকারের কাছে, 'কেঁউ কেঁউ' করে রাজনৈতিক অধিকারের 'আকঁড়া' চাল ভিক্ষে চাইতেন···সেই সময়েই যুবক ভবানীচরণের মনে সত্যিকারের ভারত-উদ্ধারের আশা জাগল। এই ভবানীচরণই ভবিষ্যৎকালে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, তীব্র কশাধারী 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক, বাঙালীর আত্মবোধ জাগরণের ঋষি, উপেক্ষিত ভারত-সভ্যতার পূজারী—বাঙলার আদুরে দুলাল।" পূর্বে কেউ স্বাধীনতার কথা বলেও নাই শুনেও নাই। ব্রহ্মবান্ধবই অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। সিংহনাদে 'সন্ধ্যা'র পৃষ্ঠায় তিনি ঘোষণা করলেন, "আমি শুনেছি মুক্তির সংবাদ! ভারত আবার স্বাধীন হবে।"

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান হোতা। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট (বর্তমানে বিধান সরণি) ও শিবনারায়ণ দাস লেনের উপর একটি বাড়ীতে ব্রহ্মবান্ধব একটি মেস পরিচালনা করতেন। ঐ বাড়ীতেই বিপ্লবীদের আড্ডা বসত এবং আন্দোলন পরিচালনাসংক্রান্ত সব আলোচনা ঐখানে হত। মনস্বী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ভাষায়, "বঙ্গ-বিপ্লবের 'গ্রীণ-রুমে' বা সাজঘরেই রাধাকুমুদ, রবি আর সমাধ্যায়ীর সঙ্গে আমি ১৯০৫-এর গৌরবময় দিন, সপ্তাহ বা মাসগুলি কাটিয়েছি। তখন আমাদের আত্মিক অভিভাবক সতীশবাবু (মুখোপাধ্যায়) আর ব্রহ্মবান্ধব।" 'সন্ধ্যা' আফিসে সমবেত হতেন বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রাজনীতিবিদ ও লেখকগণ। স্বদেশী আন্দোলনের নানা আলোচনার প্রধান প্রবক্তা ও উদ্ভাবক ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। বিনয়কুমার সরকারের ভাষায়, "ব্রহ্মবান্ধব একজন জবরদস্ত, স্বার্থত্যাগী ও নির্ভীক কর্মবীর। যতগুলো গুণ আমার বিবেচনায় যুগ-প্রবর্তকের লক্ষণ সবগুলিই তাঁর ছিল। তাঁর সংস্পর্শে এসে যুবক বাঙলার অনেকে স্বদেশসেবার নানা কাজে মোতায়েন হতে পেরেছে। ব্রহ্মবান্ধবের চিন্তাসম্পদে বাঙালী জাতি ঐশ্বর্যশালী হয়েছে।"

বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতি যে ভাষায় স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র প্রচার করেছিলেন তা

শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণের বোধগম্য ছিল না। ব্রহ্মবান্ধব অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত আপামর জনসাধারণের বোধগম্য অতি সহজ সরল ভাষায় জাতীয়তার ভাবধারা প্রচার করলেন। এর আগে কোনো পত্রপত্রিকায় এ ধরনের চল্‌তি ভাষা ব্যবহৃত হয় নি। এদিক থেকে বাংলাভাষায় ব্রহ্মবান্ধবের দান অবিস্মরণীয়। ইংরেজরা যেমন আমাদের দেশীয় অনেক নাম বিকৃত উচ্চারণ করত, ব্রহ্মবান্ধবও ইংরেজী অনেক নাম সেরূপ বিকৃত উচ্চারণ করতেন। কিংস্‌ফোর্ডকে বলতেন 'কিংফর্দ', ইংরেজকে বলতেন 'ফিরিঙ্গী'। সন্ধ্যার ভাষা পাঠ করে সেকালে "দোকানের দোকানী-পশারী, জমিদারের সরকার, গোমস্তা, পাঠশালার গুরু-শিষ্য, রাস্তার মুটে, গাড়োয়ান সকলেই হাসিত কাঁদিত। জমিদার, গৃহস্ত, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, পুরনারী, বালক-বালিকা, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই কখন আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িত, কখন বা ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিত। কখন 'সন্ধ্যা' আসিবে, আজ 'সন্ধ্যা'য় কি লিখিয়াছে, এই জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকিত।"

কি বিদেশী সরকার কি স্বদেশী মেকী স্বদেশপ্রেমিক সবারই তিনি কঠোর সমালোচনা করতেন। লোকে ইংরেজদের দেখলে যে ভয় পেত, সে ভয় ভাঙ্গার জন্য ব্রহ্মবান্ধব ইংরেজদের শক্তি-সামর্থকে সর্বদা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেন। 'সন্ধ্যা'পত্রে প্রকাশিত "গোদা পার ভোঁথা লাথি" আজও উল্লেখ্য। আবার দেশীয়দের মধ্যে যারা পাশ্চাত্ত্য ভাব অনুকরণে ব্যস্ত, অথবা তমোভাবাপন্ন ভীরু, কাপুরুষ তাদেরও তিনি কশাঘাত করতেন 'সন্ধ্যা'র পৃষ্ঠায়। তাঁর চেতনার চাবুক খেয়ে সেদিন বাঙালী জাতির মোহভঙ্গ হয়েছিল। প্রবীণ ও প্রখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছিলেন, "ব্রহ্মবান্ধব এদেশে জনসাধারণের মনে জাতীয়ভাব প্রচারের পথ প্রস্তুত করেন। ...সেই নির্ভীক—নিঃস্বার্থ ত্যাগীর আদর্শ একদিন দেশের জাতীয় অনুষ্ঠানে অসীম শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল।" বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায়, "এই নির্ভীকপ্রাণ স্বদেশপ্রেমিকের প্রায় একক চেষ্টার ফলে বাঙালী জাতির দৃষ্টিভঙ্গি আজ সংগ্রাম সুলভ হয়ে উঠেছে। সকল নেতার মধ্যে তিনিই আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে একটা উগ্র, সংগ্রামাত্মক মনোভাব সঞ্চার করেছেন।" উপাধ্যায়ের মতে পরাধীনতার বন্ধন-বেদনা তীব্রভাবে অনুভূত না হলে স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় না। তিনি বলতেন, "মার না খাইলে অসাড়ের সাড় হয় না।... মার না পড়িলে মোহ ভাঙিবে না—সাড় হইবে না—মর্যাদাবোধ জাগিবে না।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় উপাধ্যায় লিখলেন, ফিরিঙ্গীরা একটা কৃত্রিম দাগ কাটিয়া বঙ্গদেশকে দু'টুকরা করিতে চায়। কে বা ঐ দাগকে মানে। ঐ দাগকে পদদলিত করিয়া পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে। অপূর্ব মিলন সঙ্ঘটিত হইবে।"

'স্বরাজ-গড়' প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধব বাঙালী জাতিকে ডাক দিয়ে বললেন, "তোমরা অত ভয় পাও কেন। তোমাদের প্রাণটা একবার দেখ দেখি। দেখিতে পাইবে যে তোমাদেরও প্রাণে ঐ মুক্তি-সঙ্গীত বাজিতেছে। তোমরা যে মায়ের ছেলে—ফিরিঙ্গীকে অত ভয় কর কেন। কপটতা ছাড়িয়া দিয়া—এস সকলে একবার সপ্তকোটি কণ্ঠে বলি—বন্দেমাতরম্—মায়ের ছেলে হইব—স্বাধীন হইব—স্বরাজ স্থাপন করিব।"

"এস এস সবে—যাহারা মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ—পুরাণো বাঁধন ছাড়িয়া সেই স্বরাজ-গড়ের প্রজা হই। কেন আর ভাব—ভাবনার কি এই সময়।"

"আর সংশয় করিও না—সন্দেহ করিও না—সংবাদ আসিয়াছে—ভারত স্বাধীন হইবে—বিলম্ব আর নেই। পরাধীন অবস্থা সহজ অবস্থা নহে। ইহা সংগ্রামের অবস্থা।"

দেশের মুক্তি-সংগ্রামে দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানালেন ব্রহ্মবান্ধব—"উঠ ভাই বাঙালী—তোমার চিরকালের জড়তা ত্যাগ করিয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াও—উঠ মা বঙ্গলক্ষ্মী—তোমার শ্মশান-শয্যা ত্যাগ করিয়া ধূলি-ধূসরিত কেশদাম ঝাড়িয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াও—উঠ গ্রামের গ্রাম্যদেবতাগণ—তোমাদের নিজ নিজ গ্রামে সদ্ভাবের—স্বদেশীয়তার পুণ্যপ্রবাহ আবার ছুটাইয়া দাও।"

বিপিনচন্দ্র বলেছেন, "উপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশী সমাজকে, লোকে দেবতার মন্দিরকে যে চক্ষে দেখে, সেই চক্ষে দেখিতেন।"

"এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়," "ছিদিসনের হুড়ুম দুড়ুম, ফিরিঙ্গীর আক্কেল গুড়ুম," "বোচ্‌কা সকল নিয়ে যাবেন বৃন্দাবনে" প্রভৃতি কয়েকটি রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় ১৯০৭ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর ইংরেজ সরকার ব্রহ্মবান্ধবকে বিদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। বিদেশীর বিচারালয়ে ব্রহ্মবান্ধব মামলা চালাতে অস্বীকৃত হন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন—এই বিচারে আমি কোনরূপ অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক নই, কারণ, বিধাতা-নির্দিষ্ট স্বরাজ-ব্রত উদ্‌যাপনে আমার কোনো অংশের জন্য আমি বিদেশী জাতির নিকট—যে জাতি দৈবাৎ আমাদের শাসক ও যার স্বার্থ আমাদের প্রকৃত জাতীয় বিকাশের পথে অন্তরায়স্বরূপ তার নিকট—জবাবদিহি করতে বাধ্য নই। উপাধ্যায়ের এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক, তেজোদৃপ্ত ঘোষণা সেদিন জাতির ধমনীতে এক অপূর্ব উৎসাহ ও সাহসের সঞ্চার করেছিল। 'সন্ধ্যা'র মামলা চলাকালে ব্রহ্মবান্ধব দুরারোগ্য হার্নিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্যাম্বেল (বর্তমানে নীলরতন সরকার) হাসপাতালে ভর্তি হন। সেইখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে আর জেলে যেতে হয় নি। তাঁর প্রতিজ্ঞাই রক্ষিত হল। কারণ, তিনি বলেছিলেন যে অত্যাচারী ব্রিটিশের কারাগারে তিনি যাবেন না।

মানবাত্মার বাণীমূর্তি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজা রামমোহন রায় যে নব জাতীয়তার উদ্বোধন করেন তার ক্ষীণ স্রোতধারা ডিরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গতিশীলভাবে প্রবাহিত হয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রবীন্দ্রসাগরে এসে পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। এই কালজয়ী কথাশিল্পী ও সঙ্গীতকার তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভাবলে সমগ্র দেশকে জাতীয়তার এক মোহমুগ্ধকর সঞ্জীবনী মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার ফলে কবিগুরু গদ্যে, পদ্যে, সঙ্গীতে, নাটকে, গল্পে ও উপন্যাসাদির মধ্য দিয়ে অজস্র জাতীয় ভাবোদ্দীপক রচনা সৃষ্টি করে গেছেন। তাছাড়া, তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যেই যেন জাতীয়তাবোধের পরিচয় সুপরিস্ফুট। নিপীড়িত, অধঃপতিত জাতীয় জীবনে চেতনা-সঞ্চারের উদগ্র বাসনা নিয়েই যেন তিনি তাঁর অমর লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক রচনারাজি একত্র সংকলিত হলে বিরাট একখানি গ্রন্থ সৃষ্টি হতে পারে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের কোনো জাতীয় কবি এমন সার্থকতাপূর্ণ এত অধিক সংখ্যক রচনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঘরে-বাইরে নব প্রকাশমান এক জাতীয়তা ভাবপূর্ণ গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে বেড়ে উঠছিলেন। এরই ফলে উত্তরকালে তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিরাট উন্মেষ দেখা যায়। আমাদের জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যুগন্ধর মহামানব। মহাত্মা রামমোহনের পর তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন জাতীয়তার অন্যতম উপাসক। তিনি পরিবারের মধ্যে এক পরিপূর্ণ জাতীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। গৃহসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার ও কথাবার্তায় তিনি দেশীয় রীতিই অনুসরণ করে চলতেন। তৎ কর্তৃক পরিকল্পিত ও প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' জাতীয় ভাবোদ্দীপক আদর্শ প্রচারিত হত। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও মধুসূদনের জাতীয়তামূলক কবিতারাজি প্রকাশিত

হয়েছিল। কবিগুরুর শৈশবে স্বদেশী প্রচারের অন্যতম পুরোধা প্রতিষ্ঠান "হিন্দুমেলা"র সৃষ্টি হয়। এই মেলার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ঠাকুর বাড়ীর গণেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি।

হিন্দুমেলায় পঠিত সত্যেন্দ্রনাথের রচিত "মিলে সব ভারত সন্তান" অনবদ্য জাতীয় সঙ্গীতটি 'বন্দেমাতরমে'র ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে বিমুগ্ধ করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বহু কবিতা ও নাটক রচনা করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সমগ্র ভারতের জন্য একটি "সার্বজনীন জাতীয় পরিচ্ছদ"-এর পরিকল্পনা করেছিলেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবর্তনও ঠাকুর বাড়ীর অবদান। এইসব পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মনে কৈশোরেই জাতীয়তার একটা পরিপূর্ণ ছাপ পড়েছিল। ১৮৭৭ সালের হিন্দুমেলায় ষোল বছর বয়সে কিশোর রবীন্দ্রনাথ জাতীয় ভাবোদ্দীপক স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি এইরূপ :

"দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
... ...
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে-ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।"

কবিতাটির নাম ছিল "দিল্লী দরবার।" সেদিন উপস্থিত সকলে কিশোর কবির এই দেশ-প্রীতি দেখে অশ্রুসিক্ত হয়েছিলেন। 'সাধারণী'পত্রিকাতে এক ব্যক্তি লিখেছিলেন, "তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আদ্রিত হইয়াছিলাম। তাঁহার সুকুমার কণ্ঠের আবৃত্তির মাধুর্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি সুকুমারমতি শিশু ভারতের জন্য এরূপ রোদন করিতেছে, যখন দেখিলাম যে তাহার কোমল হৃদয় পর্যন্ত ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে, তখন আশাতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তখন ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রনাথের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি—আয় ভাই 'আমরা গাইব অন্য গান।' সুপ্রসিদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও বিগলিত হৃদয়ে বলেছিলেন, "যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধক রচনাগুলি কেবল ভাবপ্রবণ কল্পনাবিলাসী নয়, নানাক্ষেত্রে সেগুলি বাস্তবময়ও। ১৮৯২ সালে 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বহু সামাজিক, রাজনৈতিক প্রবন্ধ এবং জাতীয়তার উদ্বোধক কবিতা

ও গল্প প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। 'এবার ফিরাও মোরে' এই বিখ্যাত কবিতাটিও সাধনাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই কবিতার মধ্যে একস্থানে তিনি বলেছেন যে আমাদের দেশের এই কোটি কোটি অজ্ঞ, মূক জনসাধারণকে শিক্ষিত ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তারা একবার রুখে দাঁড়ালে অত্যাচারী আপনা হতেই পলায়ন করবে। কবিতায় কবি বলেছেন :

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।
ডাকিয়া বলিতে হবে মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
যখন জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে পথ কুক্কুরের
মত সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে॥

কবি আরও বললেন যে চারিদিকে যখন অন্যায়, অবিচার, তখন স্বার্থপরের মতো কেবল আত্মসুখে নিমগ্ন না থেকে নিপীড়িত মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে হবে।

"কী গাহিবে কী শুনাবে। বল মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ,
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা।

এদেশে জাতীয়তার ভাব সম্প্রচারের জন্য রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতেন ও প্রবন্ধ পাঠ করতেন। ১৮৯৩ সালে কলিকাতার চৈতন্য লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় "ইংরেজ ও ভারতবাসী" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ঐ সভার সভাপতি। রবীন্দ্রনাথ পাঠ করলেন, "আজ আমরা মনে করিতেছি, ইংরেজের নিকট কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষাস্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব, তখনো দেখিব অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না—বরং যতদিন না পাইয়াছি, ততদিন যে সান্ত্বনাটুকু ছিল, সে সান্ত্বনাও আর থাকিবে না। ... ইংরেজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব; অন্যের নিকট ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণে নিষ্ঠার সহিত ত্যাগ স্বীকারেই প্রকৃত কার্যসিদ্ধি।"

১৮৮৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" স্বরচিত একটি জাতীয় সঙ্গীত গান করেন। ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতে সুর সংযোজনা করে গান করেন। কবিগুরু প্রদত্ত সুরেই আজও 'বন্দেমাতরম্' গীত হয়ে থাকে।

১৮৯৮ সালে ঢাকাতে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মিলন' হলে রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগদান করেন। ঐ সম্মিলনে তিনি দেশীয় ভাষা, দেশীয় ভাব, জাতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্যবহারের সমর্থনে ভাষণ প্রদান করেন। এই সময় তিনি বিদেশী বিজাতি অনুকরণে সাহেবিয়ানার প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও ব্যঙ্গ নাটক রচনা করেছিলেন।

১৮৯৮ সালে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। রাজদ্রোহ আইনের প্রতিবাদে কলিকাতা টাউনহলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় রবীন্দ্রনাথ "কণ্ঠরোধ" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করে শুনালেন, "একদিকে পুরাতন আইন-শৃঙ্খলের মরিচা সাফ হইল, আবার অন্যদিকে রাজকারখানায় নূতন লৌহ-শৃঙ্খল নির্মাণের ভীষণ হাতুড়ীধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। একটা ভয়ানক ধূম পড়িয়া গিয়াছে। আমরা এতই ভয়ঙ্কর।"

"মূল কথাটা এই তাঁহারা আমাদিগকে জানেন না। আমরা পূর্বদেশী, তাঁহারা পশ্চিম দেশী; আমাদের মধ্যে যে কী হইতে কী হয়, কোথায় আঘাত করিলে কোন্‌খানে ধোঁয়াইয়া উঠে, তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারেন না। সেইজন্যই তাঁহাদের ভয়। আমাদের মধ্যে ভয়ঙ্করত্বের আর কোন লক্ষণ নাই, কেবল একটি আছে—আমরা অজ্ঞাত।"

দেশের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের গভীর যোগ ছিল। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "রাজদ্বারে নিবেদনের থালা লইয়া বৎসরের পর বৎসর কেবলমাত্র কাঁদুনীর সুরে 'কিছু দাও কিছু দাও' করিয়া প্রার্থনা করিলে কিছু পাইব না। গুরুতর দুঃখকে শিরে বহন করিরা কারাদণ্ডে অবিচল থাকিয়া, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবার পূর্বে বাহুবলে উহা আমাদের অর্জন করিতে হইবে।"

১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' বা 'স্বদেশী আন্দোলন' আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ১৯০০ সাল থেকেই তার প্রস্তুতি চলছিল। এই সময় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল বিরাট। ১৯০১ সালে

নব পর্যায়ে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায়। এই বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়ে তিনি জাতিকে আত্মসচেতন করে তোলার জন্য ভারতের গৌরবময় সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ রচনা করেন। স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনা ও আদর্শই জাতির চিত্তকে সর্বতোভাবে অধিকার করে বসেছিল। ঐ সময় তিনি বহু সভাসমিতিতে জাতীয় ভাবোদ্দীপক্ প্রবন্ধাদি পাঠ করতেন। সভায় তাঁর উপস্থিতিতে এমন বিরাট জনসমাগম হত যে তিল ধারণের স্থান থাকত না। স্বদেশী প্রচারের জন্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ডন্ সোসাইটি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সোসাইটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই এই সোসাইটিতে উপস্থিত হয়ে নানা বক্তৃতা দিয়ে দেশের তরুণদের জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুল্‌তেন। তাঁর স্বরচিত বিখ্যাত সঙ্গীত "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে" প্রথম এই সভায় গান করে শুনিয়েছিলেন।

১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী সমাজ" নামে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধটি বিরাট এক জনসমাবেশে পাঠ করেন। দেশ ও জাতিকে সংঘবদ্ধ করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনতন্ত্র গড়ে তোলাই ছিল তাঁর পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। বিদেশী সরকারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা তিনি প্রবর্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন। "স্বদেশী সমাজে"র সদস্যদের জন্য একটি প্রতিজ্ঞাপত্রও তিনি রচনা করেছিলেন। প্রতিজ্ঞাপত্রটির কিয়দংশ এইরূপ :
"আমাদের নিজেদের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাবমোচন ও কর্তব্য-সাধন আমরা নিজেরা করিব। আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়দের সাধ্য, তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজবিহিত দণ্ড স্বীকার করিব।"

১৯০৪ সালে কলিকাতায় "শিবাজী উৎসব" অনুষ্ঠিত হয়। শিবাজীর আদর্শকে লক্ষ্যপথে স্থির রেখে যে সমগ্র ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম করা উচিত এই আদর্শ প্রচারের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কবিতা "শিবাজী উৎসব" রচনা করেন। টাউনহলে আয়োজিত বিরাট জনসভায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উহা পাঠ করেছিলেন।

স্বদেশীযুগের সুরুতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর "কথা ও কাহিনী" কাব্যগ্রন্থের প্রসিদ্ধ কবিতাগুলি রচনা করেন। প্রাচীন ভারত, রাজপুত, মারাঠা, শিখ প্রভৃতির গৌরবময় ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে জনচিত্তকে জাগ্রত করাই ছিল এইসব কবিতা রচনার

উদ্দেশ্য। স্বদেশী প্রচারের উদ্দেশ্যে এই সময় "ভাণ্ডার" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উহার সম্পাদনা করেন।

অবশেষে ১৯০৫ সালে কুখ্যাত কার্জন বাঙালীর জাতীয় জাগরণে ভীত চকিত হয়ে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে চাইলেন। এই দুরভিসন্ধির উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী জাতিকে চিরতরে দুর্বল করে দিয়ে তার জাতীয় অভ্যুত্থানকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা। এই দেশ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে সেদিন সমগ্র বাংলা ক্রোধে, ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট এক আন্দোলন দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় অভ্যুত্থানে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্করূপে আবির্ভূত হলেন। সাম্রাজ্যবাদীর হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতিকে সজাগ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ অমিততেজে তাঁর লেখনী চালনা করেছিলেন। অতি শৈশব থেকেই তিনি যে জাতীয় পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিলেন এবং তার জন্য যে গভীর স্বদেশানুভূতি তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল, তাহাই ১৯০৫ সালে তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে। এই সময় তিনি অজস্র কবিতা, সঙ্গীত ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। যে সব প্রচলিত জাতীয় সঙ্গীত আমরা দেখতে পাই তার প্রায় সবই ঐ সময়ের রচনা। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়, "তখন, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কি নিঃশঙ্ক বেপরোয়াভাবে কাজ করেছি। যা মাথায় ঢুকেছে করে গেছি—কোনো ভয়ডর ছিল না। আশ্চর্য রূপ দিয়েছে, ছবির পর ছবি ফুটিয়ে গেছে অবন। সে একটা যুগ, আর রবিকাকা তার মধ্যে ভাসমান। আজ অবনের গল্পে সে কালটা যেন সজীব প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠল। আবার সে যুগে ফিরে গিয়ে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। ঐখানেই পরিপূর্ণ আমি। পরিপূর্ণ আমাকে লোকে চেনে না—তারা আমাকে নানাদিক থেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেখেছে। তখন বেঁচে ছিলুম,—আর এখন আধমরা হয়ে ঘাটে এসে পৌঁচেছি।"

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ১৯০৫ সালের ২৫শে অগস্ট টাউনহলে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। ঐ সভায় রবীন্দ্রনাথ "অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। কিন্তু জনসমাগম এত অধিক হয়েছিল যে স্থানাভাববশতঃ বহু লোককে ফিরে যেতে হয়। তাই এক সপ্তাহ পরে অন্যস্থানে আয়োজিত এক সভায় প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। এরপর রবীন্দ্রনাথ বহু সভাসমিতিতে যোগদান করে প্রবন্ধাদি পাঠ করতে লাগলেন। ঐ সালের ১৬ই অক্টোবর সরকার বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করার বিষয় ঘোষণা করলেন। রবীন্দ্রনাথও ঐ দিনই বাঙালীর অভিন্ন ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করার জন্য রাখীবন্ধন উৎসবের দিন ধার্য করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতির একপ্রাণতা সম্বন্ধে একটি অতি সুপরিচিত ভাবগম্ভীর সঙ্গীত রচনা করলেন,

"বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।

... ...

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

এই গানটি গাইতে গাইতে লোকে পরস্পর পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধে দিত বাঙালীর অভিন্ন ভ্রাতৃত্ব ও বাঙলার অখণ্ডতার নিদর্শন-স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ১৬ই অক্টোবর প্রভাতে গঙ্গার ঘাটে স্নান করে রাখীবন্ধন উৎসব সুরু করলেন। এমনি সারাদেশে এই উৎসব আরম্ভ হয়ে গেল। ১৯০৫ সালের এই স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান অসামান্য। নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে, প্রবন্ধ পাঠ করে, সাময়িক পত্রপত্রিকাদিতে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধাদি লিখে তিনি সমগ্র দেশবাসীর মনে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও উন্মাদনার সঞ্চার করেন। তাঁর এই অভাবনীয় সৃজনী-প্রতিভা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথকে 'গানের রাজা' আখ্যা দিয়েছেন। সত্যই পৃথিবীতে আর কোনো কবি এত গান রচনা করেন নি। জাতীয় ভাবোদ্দীপক এত স্বদেশী সঙ্গীতও কোনো কবি রচনা করতে সক্ষম হন নি। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি একাই অজস্র কবিতা ও গান রচনা করে জাতীয় চিত্তকে উন্মোথিত, উদ্বেলিত করে তুলেছিলেন। সারা বাংলাদেশের অসংখ্য জনসভায়, রাস্তায় রাস্তায়, হাটে, মাঠে, ঘাটে কবিগুরুর নিত্য নতুন রচিত আবেগময় সঙ্গীতগুলি গীত হত। একমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতেই স্বদেশী আন্দোলন গীতিমুখর ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে স্বদেশী গানে একেবারে ভরে দিয়েছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে তিনিই ছিলেন এ আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র, প্রধান হোতা। জাতীয়তার মহামন্ত্রে জনচিত্ত আশায়, উৎসাহে, উদ্দীপনায় পরিপূর্ণভাবে জেগে উঠেছিল শত শতাব্দীর সুপ্তি থেকে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায়, "বাঙালীর জাতীয়তাবোধে তিনি মেঘমন্দ্র-স্বরে গান গাহিয়াছেন। সে গান কর্মের উদ্দীপনায় তেজস্বী, নির্ভীক, সাহসী। ১৯০৫ সালে বাংলাদেশ আলোড়ন করিয়া যেদিন স্বদেশী আন্দোলনের ডঙ্কা নির্ঘোষে বাজিয়া উঠিল, সেদিন রবীন্দ্রনাথই সকলের আগে ভাবাবিষ্ট হইয়া, সেই উত্তেজনা-স্পন্দনকে এক শঙ্কাহরণ ওজস্বী জাতীয় সংগীতে পরিণত করিয়াছিলেন। বাংলার স্বাদেশীকতার বহ্নিশিখার পাশে সেদিন তিনি যে উদাত্ত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন,

তাহাই বাংলার কর্মের পিছনে দিল শ্রদ্ধা, জাতীয়তার পিছনে দিল মধুর দেশভক্তি।"

দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করার পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র এবং বন্দেমাতরম্ই সেই মাতৃবন্দনার মহামন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশকে নানাভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর মাতৃবন্দনায় মাতৃভূমির কেবল মৃন্ময়রূপই বর্ণিত হয় নি, তার চিন্ময় সত্তাটিও বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে। ইতিহাস-সমুজ্জ্বল সভ্যতার লীলাভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী ভারতভূমিকে কবিগুরু "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী·· জনকজননীজননী" বলে অভিহিত করেছেন। অন্যত্র জন্মভূমিকে তিনি চিন্ময়ী জননীরূপে কল্পনা করেছেন। শুধু তাই নয়, স্বদেশ জননীর মধ্যে তিনি বিশ্বজননীর সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করছেন। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম বা জাতীয়তা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। উহা অত্যন্ত উদার ও বিশাল। তাঁর দেশপ্রেম বা জাতীয়তার পরিণতি বিশ্বপ্রেম বা আন্তর্জাতিকতায়। তাই তিনি উদাত্ত স্বরে গেয়েছেন :

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের, আঁচল পাতা ॥"

সুপ্রাচীন সভ্যতার আদি লীলাভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে এবং তাকে ভালবেসে কবির জীবন সার্থক হয়েছে বলে অনুভব করছেন। তাই তিনি গেয়েছেন :

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মাগো, তোমায় ভালবেসে ॥"

ভারতে স্বাধীনতা অপহরণকারী বিদেশী শাসক ব্রিটিশ যখন বাংলাদেশকে বিভক্ত করতে উদ্যত হল, তখন কবিগুরু তাকে "সোনার বাংলা" আখ্যা দিয়ে তার নানা রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা করলেন। বাঙালী-হৃদয়ে মৃণ্ময়ী বাংলার চিন্ময়ী রূপ উপলব্ধি করালেন।

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥"

অপর একটি কবিতায় দেখা যায় কবি বঙ্গজননীর মধ্যে বিশ্বজননীর মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন :

"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে, জননী।"

মাতৃভূমির মুক্তি-সংগ্রামে দেশের তরুণসম্প্রদায়কে আত্মোৎসর্গে উদবুদ্ধকরারজন্য রবীন্দ্রনাথ বহু প্রেরণাদায়ক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তরুণদের তিনি উদাত্ত

আহ্বান জানিয়েছেন—"কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা।" কখনো তিনি বজ্রনির্ঘোষে বলেছেন—"ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।" আবার প্রয়োজন হলে চরম মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন—
"হও মৃত্যুতোরণ উত্তীর্ণ, যাক যাক ভেঙে যাক যাহা জীর্ণ।" কখনো জয়ের আশ্বাস দিয়ে তাদের নির্ভীক হতে বলেছেন—"নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার।" আবার কখনো তাদের এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিয়ে বলেছেন—"আগে চল্, আগে চল্, ভাই। পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে, বেঁচে মরে কিবা ফল, ভাই।"
পরিশেষে ভারতের ভাগ্যবিধাতৃপুরুষকে কবি বন্দনা করছেন তাঁর জয়গান গেয়ে—
"জনগনমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।" আর দেশবাসীকে আশার বাণী শুনিয়ে বলেছেন—

"দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর তীরে।"

ভবিষ্যদ্রষ্টা কবি আরও কামনা করেছেন যে সভ্যতার লীলাভূমি ভারত শীঘ্রই বিশ্বে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবে :

"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।"

আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যত রকমের সমস্যা আছে, তার সমস্ত কিছুর উপরই রবীন্দ্রনাথ অজস্র লিখে গেছেন। তাঁর জাতীয়তামূলক রচনাসমূহ অত্যন্ত ভাবগম্ভীর, অথচ শান্ত সমাহিত। তাঁর রচনারাজি কারুর বিরুদ্ধে কাউকে উত্তেজিত করে তুলে না, কারুর হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার করে না, কিন্তু মানুষের অন্তর আবেগে, আদর্শে, ত্যাগে দৃঢ় হয়ে উঠে, চিত্তকে আবিচলিত করে।
বিদেশী বিজাতি শিক্ষায় ভারতবাসীর মন থেকে জাতীয়তাবোধ বিলুপ্ত হতে বসেছিল দেখে বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে "জাতীয় শিক্ষার" পরিকল্পনা করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই এই জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন—যে শিক্ষায় জাতির চরিত্র গঠিত হয় না, মনে জাতীয় ভাব জাগে না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। পরে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহযোগিতায় তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ও বর্তমান সুদূরপ্রসারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর "শিক্ষা" শীর্ষক গ্রন্থখানি শিক্ষাজগতে এক অসামান্য অবদান।

রবীন্দ্রনাথ সর্ববিষয়ে জাতীয় রীতিনীতি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলতেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল সাদাসিদে ও ভারতীয়। স্বজাতীয় লোকের সঙ্গে তিনি ইংরেজী ভাষায় কথা বলা পছন্দ করতেন না। ১৯০৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। সেই থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার রেওয়াজ হল।

নানা অপ্রীতিকর কারণে ১৯০৮ সালের পর রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য রাজনীতিক আন্দোলন থেকে সরে যান এবং সম্পূর্ণভাবে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় "ব্যাধি ও প্রতিকার" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন। সেদিন দেশের যুবকদের গঠনমূলক কাজের ভার গ্রহণ করার জন্য এক উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

"...যে কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া, যাহাকে কেহ কোনদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আলো দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও, মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে—সে জগৎ সংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে ; সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও, তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ সংস্কার হইতে রক্ষা কর।...ইহাতে খ্যাতির আশা করিবে না ;... কেবল ধৈর্য ও প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা।

পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা বহুলাংশে বহুপূর্বে উদ্ভাবিত রবীন্দ্র পরিকল্পনারই অনুরূপ। শুধু পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপ দিয়েই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত থাকেন নি। গঠনমূলক স্বদেশসেবার আদর্শ কার্যে পরিণত করার জন্য ১৯১৪ সালে তিনি "শ্রীনিকেতন" স্থাপন করেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এর শ্রীবৃদ্ধির জন্য কাজ করে গেছেন। পৃথিবীর আর কোনো লেখককে এমন বাস্তব কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে দেখা যায় নি। ভারতের জাতীয় আদর্শকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই

তিনি একদিকে শান্তিনিকেতন ও অপরদিকে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে ভারতীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। পরাধীন ভারতে জরাজীর্ণ মৃতপ্রায় গ্রামগুলির স্বাস্থ্য-সংস্কার, পল্লীশিল্পের পুনরুদ্ধার ও প্রসার, লোকশিক্ষার বিস্তার, সমবায় সমিতি গঠন—এই সবই ছিল শ্রীনিকেতনের লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন, "দেশের সবচেয়ে বড় দুর্গতি গ্রামবাসীদের এই ঘোর দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য। তাহারা কুকুর বিড়ালের মতো না খেয়ে মরে, বিনা চিকিৎসায় মরে, এমন কি চৈত্রের কাঠফাটা রৌদ্রে এককোটা পানীয় জলও তাদের পক্ষে দুর্লভ হয়ে ওঠে। যদি এই গ্রামবাসীদেরই বাঁচান না গেল, তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করা না গেল, তবে আর দেশোদ্ধারের বড় বড় কথা বলে লাভ কি ?"

শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ও বিশ্ববিদ্যার সমন্বয়সাধন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল সুগভীর শ্রদ্ধা। তাঁর মতে উপনিষদের বাণী ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণী। বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য ভারতের এই অমর সংস্কৃতি সারা বিশ্বে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন—ইহা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে অনুভব করতেন। তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করে ভারতের সুমহান্ সংস্কৃতির কথা প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বসভায় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক দূত।

সমগ্র জাতি রবীন্দ্রনাথের নিকট এক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনে প্রেরণার প্রধানতম উৎস। তাই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তাঁকে 'গুরুদেব' আখ্যায় অভিহিত করতেন। তাছাড়া, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু, জওহরলাল প্রভৃতি দেশবরেণ্য মনীষী-লোকনায়কগণ সকলেই আজীবন কবিগুরুর নিকট অফুরন্ত প্রেরণা লাভ করেছেন। জাতীয় কোনো সমস্যা নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লে এঁরা সবাই ছুটে যেতেন শান্তিনিকেতনের এই ধ্যানগম্ভীর মনীষীর নিকট।

ভারতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো ক্ষমা করেন নি। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ব্রিটিশ বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ইংরেজের দেওয়া 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। ১৯৩১ সালে মেদিনীপুরের 'হিজলী ডিটেনসন ক্যাম্পে'র বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করলে, কলিকাতায় গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের তলায় যে বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই সভার সভাপতি হয়ে ভারতে ইংরেজ শাসনকে ধিক্কৃত করেছিলেন। জীবনের শেষ দিনে "সভ্যতার

সংকট" প্রবন্ধে সত্যদ্রষ্টা ঋষিকবি বলে গেলেন: "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন একী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে, সমগ্র মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।"

দেশদরদী বিজ্ঞানাচার্য
প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বাঙালী জাতিকে যিনি চেতনার চাবুক মেরে জাগিয়ে তুলেছিলেন, তিনি হচ্ছেন আজন্ম জ্ঞান-তাপস, ব্রহ্মচারী, বিজ্ঞান-সাধক, অকৃত্রিম দেশদরদী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৬১ সালের ২রা অগস্ট—যশোহর জেলার রাড়ুলি গ্রামে। বি.এ. পাস করে ১৮৮২ সালে তিনি বিলেত যান। সেখানে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন যে বিজ্ঞানসাধনা ব্যতিরেকে শুধু ইংরেজী সাহিত্য বা ইতিহাস পড়ার মধ্য দিয়ে ভারতের মুক্তি আসা অসম্ভব। তাই তিনি সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চা ছেড়ে বিজ্ঞান শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৮৫ ও ১৮৮৭ সালে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে যথাক্রমে বি. এস. সি. ও ডি. এস. সি. ডিগ্রি লাভ করলেন। বিলেতে অধ্যয়নকালে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে প্রফুল্লচন্দ্র 'India before and after mutiny' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত তীব্র-ভাষায় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বহু ত্রুটির নিন্দা করেছিলেন। প্রবন্ধটি বহু খ্যাতিমান রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নানা সাময়িক পত্রে উচ্চ প্রশংসিত হয়। এতে তাঁর স্বদেশপ্রেমের উজ্জল স্বাক্ষর বিদ্যমান।

১৮৮৮ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে দেশের তরুণ-তরুণীদের মনে বিজ্ঞান চর্চার আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত করায় ব্রতী হন। তাই তিনি পরবর্তী বছরের জুন মাস থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়ে অধ্যাপনার কাজ সুরু করলেন। ১৮৯৫ সালে প্রফুল্লচন্দ্র "মার্কিউরাস নাইট্রেট" আবিষ্কার করলেন। তাঁর এই অভাবনীয় আবিষ্কারে বিশ্বের বিজ্ঞানসভায় ভারতের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হল। জাতির জীবনে দেখা দিল বিজ্ঞান সাধনার সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। তাঁর এই আবিষ্কারে গভীর আনন্দ প্রকাশ করে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ ভি. এইচ. ভেলী প্রফুল্লচন্দ্রকে লিখেছিলেন, "আপনি সেই আর্যজাতির খ্যাতনামা প্রতিনিধি যে জাতি সভ্যতার উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়া এমন এক যুগে বহু রাসায়নিক সত্যের আবিষ্কার

করিয়াছিলেন, যখন এই দেশ (ইংলণ্ড) অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।" জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখায় সুসমৃদ্ধ প্রাচীন ভারতবর্ষ যে পরাধীন অবস্থায়ও তার মনীষা হারায় নি তা প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর একের পর এক মৌলিক আবিষ্কারের দ্বারা সপ্রমাণ করতে লাগলেন। বিজ্ঞান সাধনায় বিশেষ করে রসায়ন চর্চায় প্রফুল্লচন্দ্র এদেশে নবজাগরণের সূচনা করে গিয়েছেন।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জাতীয় উন্নতির মূলে যে বিজ্ঞানচর্চা এবং এ বিষয়ে ভারত যে কত অনুন্নত তা তিনি তাঁর ছাত্রদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। এবং চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে যে ভারত উন্নত শীর্ষে আরোহণ করতে পারে এ ধারণা ও বিশ্বাস তরুণদের অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ করতে চাইতেন। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, "যখন আমি এডিনবার্গে ছাত্র ছিলাম, সেই সময়ে আমি স্বপ্ন দেখিতাম— ভগবানের ইচ্ছায় এমন দিন আসিবে যেদিন বর্তমান ভারত জগতের বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে তাহার নিজস্ব বস্তু দান করিতে পারিবে!"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন ছাত্রদের পরম দরদী বন্ধু, উৎসাহ ও পরামর্শদাতা। পরবর্তীকালে তাঁর কয়েকজন ছাত্র বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকে পরিণত হন। এঁদের মধ্যে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি অন্যতম। এঁদের নানা চিন্তাশীল মৌলিক প্রবন্ধ যখন পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত হয়ে উচ্চ প্রশংসা লাভ করত, তখন প্রফুল্লচন্দ্রের আনন্দের সীমা থাকত না। বাঙালী তথা ভারতবাসীর গৌরবে তিনি অত্যন্ত গৌরববোধ করতেন। ছাত্রদের এক অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি আশা করি আমরা যে অগ্নি মৃদুভাবে প্রজ্বলিত কারিয়াছি, তাহা ছাত্র পরম্পরাক্রমে অধিকতর উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হইতে থাকিবে এবং অবশেষে উহা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে আলোকিত করিবে।"

তিনি ছিলেন চিরকুমার। কিন্তু তাঁর ছাত্রদের তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী এবং গৌরবে গৌরবান্বিত হতেন। আদর্শ কৃতী ছাত্র গঠনে তিনি তিলে তিলে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনপ্রণালী, ন্যায় ও কর্তব্যনিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রভৃতি গুণরাজি সারা ছাত্রসমাজ তথা দেশবাসীকে মহত্তর জীবন গঠনের আদর্শে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে। কলিকাতা মহানগরীর জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বাস করলেও তিনি থাকতেন সন্ন্যাসীর বেশে। তাঁকে দেখলেই মনে পড়ত তিনি যেন ভারতের কোনো বৃদ্ধ ঋষির নবীন মূর্তি। কি দেশের জাতীয় জাগরণে, কি বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, কি শিক্ষায়, কি শিল্পে, কি ব্যবসায়-বাণিজ্যে, কি সেবায়, কি ত্যাগে সর্ব-

ক্ষেত্রেই তিনি নতুন বলিষ্ঠ পথের নির্দেশ দিয়ে জাতির চিত্তে অফুরন্ত প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন। কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকে পেয়েছে। বস্তু জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন। কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়; কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়াপ্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

...তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি পূজিত হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হত না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবশক্তি। আচার্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য নিজের জয়কীর্তি নিজেই স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।"

প্রাচীন ভারতের রসায়ন চর্চার গৌরবময় ও ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র বহু পরিশ্রমে 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' প্রণয়ন করেন। চরক, সুশ্রুত, বাগভট্ট, চক্রপাণি দত্ত, নাগার্জুন, কনাদ, বরাহমিহির, গোবিন্দাচার্য প্রভৃতি রসায়ন শাস্ত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছিলেন তা তিনি এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করলেন। প্রাচীন ভারত শুধু দর্শন ও সাহিত্যেই বড় ছিল না, বিজ্ঞানেও যে যথেষ্ট উন্নত ছিল তা তিনি প্রমাণিত করলেন। এজন্য তিনি দেশে বিদেশে প্রভূত সম্মানিত হন। তাঁর অনলস বিজ্ঞান সাধনা ও আদর্শ জীবনের জন্য তিনি প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকদের শ্রদ্ধাভাজন হন এবং পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে বহুবার আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এইভাবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিদেশে ভারতের বিজ্ঞান সাধনার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে গেছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র শুধু বিজ্ঞান সাধকই ছিলেন না, বাংলা সাহিত্যেরও উন্নতিকামী সুহৃদ ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতি ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের পরিভাষা তৈরী এবং এই ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ লেখা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিল না। তিনি বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন,

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি সাহিত্য সমিতিসমূহের বহু অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন। সমাজ ও জাতির দোষত্রুটি প্রদর্শন করে তার উন্নতি বিধানের জন্য পথের নিশানা দিয়ে তিনি যে অসংখ্য প্রবন্ধাদি রচনা করে গিয়েছেন, তা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তিনি বলেছেন যে শুধু পদ্য, গল্প, উপন্যাস রচনাই বাংলা সাহিত্যের উন্নতির একমাত্র উপায় নয়, বাঙালী কর্তৃক মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহের ফল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে ভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। তিনি বলেছেন, "আমরা যতদিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না।" মাতৃভাষার ক্রমবর্ধমান উন্নতি দেখে আচার্যদেব অত্যন্ত পুলকিতস্বরে বললেন, "আজ আমরা নূতন জাতীয় জীবনের প্রাসাদের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান। পাঁচ বৎসর পূর্বে যে দেশে 'জাতীয় জীবন' ইত্যাদি আশা ও উৎসাহের কথা অলীক ও কবিকল্পনাপ্রসূত উন্মাদোক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত, যে দেশে, স্বদেশপ্রেম বলিয়া কথা বহু শতাব্দী যাবত বিস্মৃত ছিল, যে দেশে মাতৃভাষা ভুলিয়া এতদিন বৈদেশিক ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বার বিবেচনা করিত, সেই দেশে আজ কি এক অপূর্ব ভাব আসিয়া মৃত প্রাণকে কি এক অমৃত বারি সিঞ্চন করিয়া সঞ্জীবিত করিল।"

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার ক্রমোন্নতির যুগসন্ধিক্ষণে তাই তিনি সমগ্র দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানালেন, "বাঙলার এমন দীনহীন কাঙাল, হতভাগ্য কে আছে ভাই, যে আজ বিধাতার মঙ্গলময় আহ্বানে আহুত হইয়া মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার আরতির জন্য নৈবেদ্য উপচার লইয়া সমুপস্থিত না হইবে? ধনি! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, বলি! তুমি তোমার বল লইয়া, বিদ্বান! তুমি তোমার অর্জিত বিদ্যা লইয়া, সমবেত হও।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন আজীবন শিক্ষক। তাঁকে জাগরিত শিক্ষক বলা যায়। জাতির বিশেষ করে বাঙালী জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধোগতিতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হতেন এবং অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি নানা বাস্তব উপায় বাৎলে দিতেন। একদিকে বাঙালীর ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং অন্যদিকে তার শ্রমবিমুখতা, নিষ্ক্রিয়তা জাতীয় অবনতির সূচনারূপে দেখা দিয়েছিল। প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালীর অধোগতির কারণ বিশ্লেষণ করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করলেন।

ডিগ্রিধারী বাঙালী যুবকদের চাকরির মোহকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। কারণ, তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করেও চাকরি পায় না এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি বা

অন্য কোনো হাতের কাজ করতেও রাজি হয় না। ফলে তারা সমাজের ভারস্বরূপ হয়ে পড়ে। ডিগ্রি লাভের সঙ্গে জ্ঞানার্জনের কোনো সম্পর্ক নেই অথচ ডিগ্রির জন্য বৃথা দম্ভ করতেও তারা ছাড়ে না। তাঁর কথায়, "ডিগ্রি অজ্ঞতা ঢাকিবার আবরণ মাত্র।" তিনি বার বার বাঙালী যুবকদের শুনালেন যে চাকরি করে কোনো জাতি বড় হতে পারে না। তরুণদের শ্রমের মর্যাদা বোঝাতে গিয়ে দেশী বিদেশী বহু কৃতি ব্যক্তির জীবনেতিহাস·বর্ণনা করেছেন।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে বাঙালীর অন্ন সমস্যার বিষয় তিনি গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। এর মূলে যে বাঙালীর শ্রমবিমুখতা তা তিনি বহুবার উল্লেখ করেছেন। 'বাঙালীর শক্তি ও তার অপচয়' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "অন্ন সমস্যায় বাঙালীর জীবন আজ মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবন সংগ্রামের এই প্রতিযোগিতায় শুধু মাড়োয়ারী নয়, সকল অবাঙালীর নিকট বাঙালী পরাজিত হইতেছে। বাঙালী বুদ্ধিমান, বাঙালী চতুর, ইহাই শুনিতে পাই। কিন্তু যত চতুর, তত ফতুর। তাই ধনসম্পদে বাঙালী আজ ফতুর হইয়াছে।" তাই তিনি আহ্বান জানালেন, "আমি জীবনে কঠোরতার আশ্রয় নিয়ে বাঙালীকে বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষা করতে আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ, বাঁচতে হলে বাঙালীকে অন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে।" "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" এই চলতি প্রবাদ তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন। তাই তিনি আজীবন বাঙালীকে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন যে ব্যবসায় না করলে কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগতভাবে কোনো প্রকারেই সম্পদ বৃদ্ধি সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন, "অনেকের মুখে শুনিতে পাই অর্থের অভাবেই বাঙালীর ছেলেরা ব্যবসায় ক্ষেত্রে কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। কত অশিক্ষিত, কপর্দকশূন্য মাড়োয়ারী, বিহারী, পাঞ্জাবী এদেশে আসিয়া দিনান্তে মাত্র এক মুষ্টি ছাতু খাইয়া, কত কষ্ট করিয়া ক্রমে বড় বড় ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। এদেশের ছেলেদের চাই ব্যবসায়ে সেই আগ্রহ, যাহা সকল কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিবার ও জয়ী হইবার শক্তি দিতে পারে।"

অন্যত্র তিনি সখেদে বলেছেন, "হায় বাঙালী! তোমার মহিমা কীর্তনে আজ আমি বলিহারী যাই। তুমি দিন দিন দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতেছ, তবুও ইহাতে তোমার চৈতন্যোদয় হইতেছে না। আর তুমি কেবল বিদ্যালয়ের বড় বড় তকমা লইয়া বেকার সমস্যা বাড়াইতেছ এবং অনশনে বা অর্ধাশনে দিনাতিপাত করিতেছ। অথচ কবির মর্মস্পর্শী বাণী—'ভূষণ বলে পরব না আর গলার ফাঁসি'—এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে না।"

বিজ্ঞানে প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন রাসায়নিক। তাই বলে তাঁর কাজ কেবল গবেষণাগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর রসায়নের প্রয়োগবিদ্যা তিনি শিল্প জগতেও কার্যকরী করার প্রয়াস পেতেন। এ বিষয়ে তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি বেঙ্গল কেমিক্যাল। মাত্র আট শত টাকা মূলধন সম্বল করে এই কারখানার কাজ সুরু করেন। শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এ তাঁর এক দুঃসাহসিক অভিযান। অদম্য অধ্যবসায়, সততা, অসামান্য একনিষ্ঠতা, সর্বোপরি অসাধারণ দূরদৃষ্টির ফলে এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। বেঙ্গল কেমিক্যাল ছাড়া আরও বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন পরিচালক, পরামর্শদাতা বা উৎসাহদাতা হিসেবে। বাঙালী জাতিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী ও বিত্তশালী হবার জন্য তিনি শুধু বক্তৃতা দিয়ে বা প্রবন্ধ লিখেই যে তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার অন্য এক মহান উদ্দেশ্য ছিল রোগজীর্ণ দরিদ্র দেশবাসীদের অল্পমূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা। দেশীয় গাছগাছড়া থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভেষজ প্রস্তুতের সাধনায় তিনি অসামান্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতেন। 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' পরবর্তীকালে বাঙালীর শিল্প প্রতিষ্ঠায় অভূতপূর্ব উৎসাহ ও গভীর আত্মপ্রত্যয় জুগিয়েছে। তাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে বাংলায় শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রাণ-পুরুষ বলা যেতে পারে। বেঙ্গল কেমিক্যাল তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। ইহা বাংলা তথা ভারতের স্বাধীন শিল্প জাগরণের ইতিহাসে অগ্রদূত হিসেবে বহু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর প্রেরণাস্থল।

দেশের ছাত্র ও যুবসমাজের উপর প্রফুল্লচন্দ্র যথেষ্ট আশা রাখতেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, "আমার শেষ সময় উপস্থিত—হে আমার সাধের ছাত্রগণ, তোমাদের দিকে আগ্রহাকুল নয়নে আমি তাকিয়ে আছি। যদি দেখি তোমরা মানুষ হচ্ছ তবে ভাববো আমার জীবনব্রত সফল হল।...তোমরা মানুষ হও—নিজেরা আপন পায়ে ভর করে দাঁড়াও—দেশ আবার নিশ্চয়ই উঠবে।"

অতীত ঐতিহ্যের বৃথা দম্ভ পরিত্যাগ করে তিনি দেশবাসীকে বর্তমানে শ্রমশীল হতে বললেন: "অতীতের গৌরব কাহিনী নিয়ে থাকলে চলবে না। বর্তমানে আমাদের অবস্থা কতদূর হীন হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়; তাহার প্রতিকার সাধনকল্পে আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করা চাই। আমরা সর্বস্ব হারাতে বসেছি, ভিটেমাটি বিকিয়ে যেতে বসেছে। এখন শুধু আমরা অমুক রাজা উজিরের ছেলে ছিলাম বলে লোকের কাছে অসার আভিজাত্য-গৌরব রক্ষায় যত্নবান হলে কিছু ফল হবে না। অতীতের

কথা ভাবতে ভাবতে আমাদের জড়ভরত হলে চলবে না; আলস্য পরিত্যাগ করতেই হবে।"

প্রকৃত জ্ঞানোপার্জন কিভাবে করা যায় সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "শুধু কতকগুলি কেতাব মুখস্ত করলেই বিদ্যা হয় না।···জ্ঞানের জন্য বাজে বই অর্থাৎ পাঠ্যতালিকাভুক্ত পুস্তক ভিন্ন অন্য বই পড়। যারা আপন চেষ্টার বলে মানুষ হয় তারাই মানুষ। পুরুষকার আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আমার মনের দৃঢ়তা, আমার একনিষ্ঠতা, আমার অধ্যবসায়, উদ্যোগ ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। আমার সফলতা বা নিষ্ফলতার জন্য অপর কেহই দায়ী নহে—আমি নিজেই দায়ী। নিজের জীবনযাত্রাকে সফল করিতে হইলে নিজেই পথ দেখিয়া লইতে হইবে।" জাতীয় জাগরণের দিনে আচার্যদেবের এই বাণী দেশের তরুণসম্প্রদায়ের চিত্তকে উদ্বেলিত করেছিল।

দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌ হিসেবে যত না পরিচিত, তার চেয়ে বেশী পরিচিত একজন একনিষ্ঠ সমাজসেবকরূপে। মানুষের সেবাই ছিল তাঁর নিকট পরম ধর্ম। তিনি বলতেন, "মানুষ যদি মানুষকে মানুষ বলে না মানল, যদি তাকে প্রেমবন্ধনে না বাঁধল, যদি তার সেবা করে ধন্য না হল, তবে কি হবে বৃথা শুধু কতকগুলি গীতা উপনিষদের শুষ্ক কথা আওড়ে?" দেশের যেখানেই যখন বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদিতে গ্রামের সাধারণ মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তখনই এই জ্ঞানতপস্বী, বিজ্ঞানবীর গবেষণাগার ছেড়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

'বঙ্গীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতি'র মাধ্যমে অজস্র অর্থ, বস্ত্র, খাদ্যাদি সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে বিলিয়েছেন। আর্তপীড়িত সাধারণ মানুষের স্থায়ী অন্নসংস্থানের উপায়স্বরূপ খাদি ও অন্যান্য কুটিরশিল্পের তিনি প্রবর্তন করেছিলেন বহু স্থানে। তাঁর এই নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শে সমগ্র জাতি উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

প্রফুল্লচন্দ্রের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সমাজ-সংস্কার ছিল অন্যতম। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি যে সব দূষিত রীতি ও কুসংস্কার সমাজদেহকে কলাঙ্কত করেছিল, তার প্রতিকার নিরাকরণে তিনি ছিলেন অগ্রণী। বক্তৃতা প্রদান ও প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র এই সব কুপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতেন। তাঁর আপন ভাষায়, "বহুদিনের কুসংস্কাররাশি সমাজের দেহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে জরাগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আসিয়াছে এবং ইহার ফলে যে পাপ পুঞ্জীভূত হইয়া

উঠিয়াছে, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্তের দিন আসিয়াছে।...আজ আর ভাবিবার সময় নাই। আজ এই দিন হইতে সকলে প্রতিজ্ঞা কর যে, আমরা পুরাতন সংস্কার দূর করিয়া দিব। দিকে দিকে যে নূতনের হাওয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, প্রাণে যে আহ্বানের সাড়া পড়িয়াছে, তাহার সহিত অগ্রসর হইব।...প্রত্যেক মানুষের, প্রত্যেক জীবের সহিত প্রাণের, একটি দরদের সম্বন্ধ স্থাপন কর, দেখিবে জগতের সবই সুন্দর।"

স্বাধীনতার ও জাতীয় উন্নতির প্রচণ্ড পরিপন্থী জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারধ্বনি উচ্চারণ করে আচার্যদেব বললেন, "আমরা দেশকে মা বলি। যাঁহারা লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন, আমি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা যদি বাংলাকে মা বলেন, তবে সকলকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন, না মায়ের সন্তানকে পদাঘাত করিয়া দূরে ঠেলিয়া কি তাঁহারা অগ্রসর হইবেন? তবে তাঁহাদের কিসের মা বলা? সকলেই মায়ের সন্তান—সকলকে কোলে টানিয়া লইতে হইবে।"

বিজ্ঞানসাধক প্রফুল্লচন্দ্র রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না; কিন্তু জাতীয় সংকটের সময়ে তিনি রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হতে দ্বিধা করতেন না। সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারার তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী। ঐ সময়ে তিনি একাধিক প্রকাশ্য সভায় অভিভাষণ দিয়েছেন। স্বপক্ষে তিনি বলেছেন, আমি রাজনীতিবিদ্ নহি; কিন্তু জাতীয় সঙ্কটকালে বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাব্রতীকেও রাজনীতিক্ষেত্রে নামিতে হয়। বর্তমান সঙ্কট যে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। এই অবস্থায় কর্ম ও উপজীবিকা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই এই সঙ্কট অবসানের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য।"

যেদিন আলিপুর জেলে যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্রের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার হয়—সেইদিন দেশপ্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্র সভায় উপস্থিত হয়ে বললেন: "আমি কেমিস্ট। তবুও টেস্ট টিউব ফেলিয়া দেশভক্তের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে আসিয়াছি। আমি diarchy বা monarchy বুঝি না।"

জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার কথা বহু নেতাই বলেছেন; কিন্তু আচার্যদেবের মতো এমন বাস্তব ও আন্তরিক অনুভূতি খুব কম নেতারই থাকে। শুধু বক্তৃতা দিয়ে নয়, প্রত্যেকটি কাজ নিজে করে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে তিনি কর্মোদ্যমের নতুন প্রেরণা দিয়ে গেছেন। তাঁর সমস্ত সাধনা, চিন্তা-ভাবনা জাতীয় কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত ছিল।

ভারতাত্মার বাণীমূর্তি
বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

সন্ন্যাস-জীবনের সুরুতে স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল ঈশ্বর-দর্শন ও আত্ম মুক্তি। দীক্ষান্তে একদিন তিনি তাঁর গুরু পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে প্রার্থনা করলেন নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হবার মন্ত্র। তীব্র ভৎর্সনা করে উঠলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, "লজ্জা করে না তোর এ-কথা বলতে!—ভেবেছিলাম কোথায় একটা বিশাল বটবৃক্ষের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা নয়, তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস্।"

আত্ম-মুক্তির আশীর্বাদ চেয়েছিলেন বিবেকানন্দ গুরুর কাছ থেকে। পেলেন তার চেয়ে অনেক বড় জিনিস,—মানব-মুক্তির মহামন্ত্র। গুরুদত্ত এই মন্ত্র-সাধনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন নবীন সন্ন্যাসী পরিব্রাজকের বেশে। পদব্রজে পরিভ্রমণ করলেন আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারত ভূখণ্ড। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন কোটি কোটি ভারতবাসীর অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য ও দুর্গতি—ভারতের অগণিত মানুষ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, কুসংস্কার ও তামসিকতায় আচ্ছন্ন। তাদের ধর্ম নেই, আত্মপ্রত্যয় নেই, নেই স্বাজাত্যবোধ। তারা বিস্মৃত হয়েছে স্বদেশের সুমহান অতীত গৌরব। সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি স্বদেশ জননীর এই দীন-হীন অবস্থা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন বিবেকানন্দ। দুঃখে উদ্বেলিত হয়ে উঠল তাঁর মহান হৃদয়। কন্যাকুমারিকার সাগরতীরে শিলাসনে উপবিষ্ট হয়ে গভীরভাবে ধ্যান করলেন ভুবন-মনোমোহিনী স্বদেশ-জননীর। "মহাপুরুষের তপোমার্জিত নির্মল পবিত্র চিত্ত-দর্পণে মাতৃভূমির অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ চিত্রসমূহ একে একে প্রতিফলিত হতে লাগল। আশা-আনন্দ-উদ্বেগ-অমর্ষ-স্তম্ভিত-হৃদয় বীর সন্ন্যাসীর ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে 'বর্তমান ভারত' দেদীপ্যমান হয়ে উঠল। "এই আমার ভারতবর্ষ—আমার প্রিয় মাতৃভূমি। জননী, আমি মুক্তি চাই না; তোমার সেবাই

আমার জীবনের একমাত্র অবশিষ্ট কর্ম।" দরবিগলিত অশ্রুজলে অপূর্ব অর্ঘ্য রচনা করলেন দেশমাতৃকা-পূজার। সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন, "আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ হোক, মানুষের দুঃখকষ্ট নিবারণের জন্য প্রয়োজন হলে আমি লাখো নরকে যেতে

তাঁর দেশ ও মানবপ্রীতির এই মহান অনুভূতি সঞ্চারিত করে দিতে চাইলেন সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে। তিনি উদাত্তস্বরে আহ্বান জানালেন তাঁর স্বদেশবাসীকে,

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত"—"উঠ, জাগ, শ্রেয়কে লাভ কর।"

কিন্তু কী সেই 'শ্রেয়'? বিবেকানন্দের নিকট সেই শ্রেয় ছিল দেশ ও জাতির মুক্তি, মানুষের উন্নতি। তাঁর কাছে নরই নারায়ণ। তিনি বলতেন দরিদ্র, অজ্ঞ, অশিক্ষিত দেশবাসীর সেবাই ঈশ্বর সেবা। দেশ ও দশের মুক্তির মধ্যেই নিজের মুক্তি নিহিত।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

তাঁর এই নর-নারায়ণবাদ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নরনারীকে সম্মানের সিংহাসনে বসিয়েছে এবং অতি দীন হীন অবজ্ঞেয়, অস্পৃশ্য মানুষের মস্তকেও সম্ভ্রমের রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে। পরবর্তীকালে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে পতিতদের উদ্ধারের যে আন্দোলন চলে তা স্বামী বিবেকানন্দেরই প্রভাব। মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলনও বিবেকানন্দের নিকট ঋণী। যুবকদের মধ্যে যে সেবার ভাব প্রবল হয়ে উঠে তার প্রেরণার মূলে বিবেকানন্দের বাণী।

১৮৯৩ সালে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগদান করে স্বামীজী যে অভিভাষণ দিলেন তাতে ভারতের সুপ্রাচীন ও সুমহান সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হল। বিশ্বসভায় ভারত শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করল। ভারতবাসীর মনে আশা, উৎসাহ ও আত্মপ্রত্যয় জেগে উঠল। সর্বোপরি জাগল জাতীয় মর্যাদাবোধ।

স্বজাতি বা স্বদেশের নিন্দা স্বামীজী কখনো সহ্য করতে পারতেন না। যখন কোনো বিদেশী ভারতের সম্বন্ধে নিন্দাসূচক কোনো কথা বলত, তখন তিনি তেজোদ্দীপ্ত সিংহের মতো গ্রীবা উন্নত করে দাঁড়াতেন। তখন তাঁকে দেখে মনে হত যেন ইনি অভিমানশূন্য, উদাসীন সন্ন্যাসী নন, মধ্য যুগের কোনো গর্বিত জাত্যাভিমানী উদ্ধত অহঙ্কারী রাজপুত বীর। লণ্ডনে একবার এক সভায় স্বামীজী ভারতের গৌরব বর্ণনা করছিলেন, এমন সময় এক ইংরেজ সমালোচক প্রশ্ন করলেন, "ভারতের হিন্দুগণ

কি করিয়াছে—তাহারা এ পর্যন্ত একটি জাতিকে জয় করিতে পারে নাই।” বিবেকানন্দ গর্বভরে বললেন, “পারে নাই নয়—তাহারা করে নাই। আর ইহাই হিন্দুজাতির গৌরব যে, তাহারা কখনও ভিন্ন জাতির রক্তে ধরিত্রী রঞ্জিত করে নাই। কেন তাহারা পরদেশ অধিকার করবে? তুচ্ছ ধনের লালসায়? ভগবান চিরদিন ভারতকে দাতার মহিমময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহারা জগতের ধর্মগুরু, পরস্বাপহারী রক্তপিপাসু দস্যু ছিল না। আর সেই কারণেই আমি আমার পিতৃপুরুষদের গৌরবে গর্ব অনুভব করিয়া থাকি।”

চার বছর ধরে পাশ্চাত্ত্যের নানাদেশ পরিভ্রমণ করে এবং ভারতের সুমহান্ সভ্যতার বিজয় পতাকা উড়িয়ে ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে এলেন। এবার তাঁর কর্মক্ষেত্র হল নানা দুর্গতিপূর্ণ পরাধীন ভারতবর্ষ। তিনি বললেন, “আগামী পঞ্চাশ বৎসর জননী জন্মভূমি যেন আমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হন।” এই হল স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্র। পরবর্তীকালে এই মন্ত্রেই সহস্র সহস্র বাঙালী তথা ভারতীয় যুবক দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অনায়াসে প্রাণ উৎসর্গ করেছিল।

তিনি প্রথমেই দৃষ্টি দিলেন সমাজ সংগঠনের দিকে। প্রায় হাজার বছর ধরে ভারতের অগণিত নরনারী অন্ত্যজ, নিম্নবর্ণ ইত্যাদি আখ্যা পেয়ে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের দ্বারা অবহেলিত ও অত্যাচারিত হয়ে আসছিল। অথচ এই তথাকথিত নিম্নবর্ণেরাই সৃষ্টি করে এসেছে ভারতের সভ্যতার ইতিহাস। ভারতের প্রাণস্বরূপ এই কোটি কোটি নিম্নবর্ণের অধঃপতনেই ভারতের অধঃপতন, ভারত পরাধীন। তাই তিনি উচ্চ নীচ ভেদাভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তীব্র ধিক্কার দিলেন উচ্চ বর্ণীয়দের। আর উদাত্ত আহ্বান জানালেন ভারতের যুবসমাজকে উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে কাজ করার জন্য। “ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোনো বন্ধু নেই। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহাদের বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারা যে মানুষ তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে। ইহারই ফল দাসত্ব ও পশুত্ব।”

তিনি যুবকদের আর কালবিলম্ব না করে কাজে লেগে যেতে উৎসাহিত করলেন। “দেখছিস্ না, পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য উঠবার আর বিলম্ব নাই। তোরা এই সময় কোমর বেঁধে লেগে যা—সংসার ফংসার করে কি হবে? তোদের এখন কার্য হচ্ছে, দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি করে বসে থাকলে চলবে না; শিক্ষাহীন, ধর্মহীন, বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের

বুঝিয়ে বলগে—'ভাই সব উঠ, জাগ, কতদিন আর ঘুমুবে?'…আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর।…নতুবা তোদের লেখাপড়াকে ধিক্।…জগতে যখন এসেছিস্, তখন একটা দাগ রেখে যা।…সকলকে এই কথা শোনাগে—'তোমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি জাগিয়ে তোল।' নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তি কামনাও তো মহাস্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান—ফেলে দে মুক্তি ফুক্তি—আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।"

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নহে। আমাদের কার্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঐ দেখ ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুদিন নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। উঠ, তাঁহাকে জাগাও, আর নূতন জাগরণে নবপ্রাণে পূর্বাপেক্ষা মহাগৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে তাঁহার রত্ন-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা কর।"

"আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া তোমরা কেবলমাত্র স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির আরাধনা কর; অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয় বর্ষ ভুলিলেও কোনো ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতা নিদ্রিত। একমাত্র দেবতা—তোমার স্বজাতি; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্রই তাঁহার জাগ্রত কর্ণ, সকল ব্যাপিয়া আছেন। তোমরা কোন্ নিষ্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছ, আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না।…এই সব মানুষ, এই সব পশু ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য।… তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ কর,—যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।"

বিশেষ করে বাঙালী যুবকগণের নিকট তিনি মহাবলী প্রার্থনা করলেন। "আমার এই কার্যভার, হে বাঙালী যুবকগণ, তোমরা গ্রহণ কর। এই কার্যের উন্নতি ও বিস্তার আমার কল্পনাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হউক। আমি সূচনা মাত্র করিয়াছি, তোমরা সম্পূর্ণ কর। বর্তমান যুগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়া লও। আর কখনো কোনো দেশের যুবকদের স্কন্ধে এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় অতীত দশ বৎসর ধরিয়া সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, বাঙলার যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ পাইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবে।"

আজীবন স্বামীজী ছিলেন নির্যাতীতের অপরিসীম দরদী বন্ধু। তাই নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর ছিল অনলস বিদ্রোহ। আকুল আবেগভরা আহ্বান জানালেন দেশের অগণিত

নিপীড়িত জনগণকে, তাদের মধ্য থেকেই কামনা করলেন নব-ভারতের অভ্যুদয়।—"নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালী, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে। তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না।"

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত দেশের যুবকরা একদিন পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। দেশের যা কিছু সবই তাদের কাছে ছিল হেয় এবং পাশ্চাত্ত্যের সবই ছিল শ্রেয়। পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, আহার-পানীয়, ভাষা, ধর্ম সব ব্যাপারেই তারা ইউরোপীয়দের অনুকরণ করত। বিবেকানন্দ দেখলেন পরানুকরণে কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো নানা ঐতিহ্যবাহী দেশের পক্ষে পরানুকরণ পাপ। তাই তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন, "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষী, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল--ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'"

স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর ছত্রে ছত্রে জাতীয়তা তথা স্বাধীনতার কথা ধ্বনিত হয়েছে। ভারতের বন্ধন-মুক্তির মধ্যে তিনি কেবল ভারতবাসীরই মঙ্গল চিন্তা করেন নি, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ কামনায় ভারতের মুক্তি প্রার্থনা করতেন। উত্তরকালে তাঁর প্রচারিত জাতীয়তার মহামন্ত্রে:"সমগ্র দেশ জেগে উঠেছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ যুবক বিবেকানন্দের বাণী পাঠ করে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য জীবন আহুতি দিয়েছেন। বিপ্লব আন্দোলনে বিপ্লবীদের এক হাতে থাকত গীতা আর অন্য হাতে বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী। তাঁর তেজোদীপ্ত বাণী ছিল বিপ্লবীদের নিকট বিরাট প্রেরণার উৎস। দেশ-নায়করাও বিবেকানন্দের দ্বারা কম প্রভাবিত হন নি। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী থেকে সুরু করে জওহরলাল নেহরু, লোকমান্য তিলক, শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতো জননেতারাও স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। গান্ধীজীর নিজের ভাষায়—"আমি স্বামীজীর পুস্তকাবলী ভাল করিয়া সযত্নে পাঠ করিয়াছি। তাহার ফলে পূর্বে দেশের প্রতি আমার যে ভালবাসা ছিল, তাহা আরও অনেক বাড়িয়াছে।"

বিবেকানন্দের ভাবধারা, তাঁর সেবাধর্মের আদর্শ, তাঁর স্বদেশপ্রেম ভারতপুরুষ শ্রীঅরবিন্দের তরুণ চিত্তে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি লিখেছেন, "ভারতের বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করা যায়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ—নরকেশর। বিবেকানন্দ।···ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের মধ্যে নিহিত ছিল।···বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবন গঠনকর্তা। তিনিই ইহার প্রধান নেতা।···তাঁহার প্রভাব ভারত-আত্মাকে আলোড়িত করিয়াছে।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র আবাল্য বিবেকানন্দের ভাবধারায় প্রভাবিত। তিনি বলেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী, তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁর পুণ্যপ্রভাবে আমার জীবনের উন্মেষ।···স্বামীজীর বাণীর মধ্য দিয়াই বর্তমানের মুক্তি-আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে।"

জননায়ক জওহরলাল নেহরুর ভাষায়, "তিনি ভারতের বর্তমান জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম মহান্ প্রবর্তক ছিলেন। তিনি সমগ্র জাতির নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ইহার গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়াছিলেন।···প্রোজ্জ্বলমনা এই সন্ন্যাসীর মুখের বা লেখার প্রত্যেকটি কথা ছিল অগ্নিশিখার মতো।···তাঁহার বাণী ও কার্য লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল।

চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারীর বর্ণনায়, "স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত ঋণী ! ভারতের আত্মমহিমার দিকে ভারতের নয়ন তিনি উন্মীলিত ক'রয়া দিয়াছিলেন। তিনি রাজনীতির আধ্যাত্মিক ভিত্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা অন্ধ ছিলাম, তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়াছেন। তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক,—আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা।"

জাতীয়তার চারণ-কবি

দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উনিশ শতকের শেষপাদের একজন প্রতিভাধর খ্যাতনামা সাহিত্যিক। তিনি তাঁর রচিত কবিতাবলী ও নাটকের মধ্য দিয়ে সমগ্র বঙ্গবাসীকে স্বদেশ প্রেমে মাতিয়ে তুলেছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল মাতৃভাষার চর্চায় মনোনিবেশ করেন। শৈশব থেকে তিনি সুগায়কও ছিলেন। আবাল্য জননী ও জন্মভূমির প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভক্তি। মায়ের সঙ্গে দেওঘরে বেড়াতে গেলে, সেখানকার কোনো না কোনো পাহাড়ে বসে বসে গাইতেন স্বরচিত একটি গান, "জানি না জননী, কেন এত ভালবাসি তোরে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বার বছর থেকে সতের বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যে সব কবিতা লিখেছিলেন সেগুলি "আর্যগাথা" [প্রথমভাগ] গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ঐ সব কবিতাবলীর মধ্যে অনেকগুলি উচ্চশ্রেণীর স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাও ছিল। এই থেকেই বোঝা যায় সেই কৈশোরেই দেশপ্রেম কী গভীরভাবে তাঁর চিত্তকে অধিকার করেছিল। যে যুগে কবিতায় ও গানে প্রেমেরই প্রাধান্য ছিল, সেই যুগে একটি কিশোরের রচনাবলী স্বদেশপ্রেমের সুরে অনুরণিত হওয়া যথেষ্ট বিস্ময়ের বিষয়। গ্রন্থের ভূমিকায় বালক-কবি লিখেছিলেন, "যাঁহারা একমাত্র মনুষ্য-প্রেমগীতকেই গীত মনে করেন, 'আর্যগাথা' তাঁহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই এবং তাঁহাদের আদর প্রত্যাশা করে না।...যদি কাহার অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন কখন সিক্ত হইয়া থাকে, 'আর্যগাথা' তাঁহারই আদর চাহে। আদর পায়, আবার নূতন গীত শুনাইবে।" যিনি একদিন দেশাত্মবোধের মহামন্ত্রে স্বদেশবাসীর চিত্ত উদ্বোধিত ও উন্মথিত করবেন, তার সূচনা আভাষিত হয়েছিল এই 'আর্যগাথা' কাব্য গ্রন্থে। এই গ্রন্থের 'আর্যবীণা' অংশের দ্বিতীয় গানে দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল কঠোরভাবে বললেন, "যতদিন না দুঃখিনী মাতৃভূমির এই দুঃখ দৈন্য ও হীনতা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়, ততদিন

ভারতবাসীর মুখে প্রেম-সঙ্গীত ভাল দেখায় না।" 'আর্যগাথা'র 'উদ্বোধন' শীর্ষক সঙ্গীতে কিশোর কবি গাইলেন :

"গাইব প্রমত্ত হয়ে আইস সঙ্গীত মোর,
ঘুমায়েছে আর্যজাতি ভাঙ্গিব সে ঘুমঘোর।
জাতীয় অমৃত গানে, ঢালিব আর্যের কানে
উঠিবে অর্বুদ প্রাণ ঘোর নিদ্রা পরিহরি।"

'স্বদেশ-স্তোত্র' কবিতায় কবি গাইলেন :

"স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন,
তোমা সম রম্য ভূমি নয়নরঞ্জন।"

'ভারতমাতা' কবিতায় কবি মাতৃভূমির অপমানে দুঃখিত হয়েছেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগছে যে বিশকোটি ভারতবাসী থাকতে কবে মাতৃভূমির দুঃখ দূর হবে।

"কি দুখে কহ গো মাত সহ এত অপমান?
দেখিয়ে তোমার দুখ কাঁদে যে আমার প্রাণ।

কত বর্ষ হ'ল গত, আর মা কাঁদিবে কত?
হবে নাকি এ জীবনে দুখনিশি অবসান?
ধরেছ যে নিজোদরে, বিংশতি কোটি নরে,
সে কি কাঁদিবারে তরে রহিতে দাসী সমান?
কি দুখে কহ গো মাত সহ এত অপমান?

এইভাবে কবির কিশোর বয়সের রচনা 'আর্যগাথা' দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীতে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। ১৮৮২ সালে যে বছর তিনি বি. এ. পাস করেন, সেই বছরই 'আর্যগাথা' প্রকাশিত হয়। সে সময়ের সমস্ত প্রধান প্রধান পত্রপত্রিকায় এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান সংযোজন বলে উচ্চ প্রশংসিত হয়।

উচ্চ শিক্ষার জন্য কবি বিলেত গিয়েছিলেন। বিলেতে অবস্থানকালে স্বদেশ জননীর কথা তাঁর খুব বেশী মনে পড়ত : তাই প্রবাসে থেকে তিনি "জন্মভূমি" শীর্ষক কবিতায় লিখলেন :

"কি মাধুর্য জন্মভূমি জননি তোমার,
হেরিব কি তোমারে মা নয়নে আবার।
কতদিন আছি ছাড়ি,
তবু কি ভুলিতে পারি,
তবুও জাগিছ মাতঃ হৃদয়ে আমার।"

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন তেজস্বী, নির্ভীক ও চিরউন্নতশির। এমন কি বিদেশী সরকারের অধীনে চাকরি করেও তিনি কখনো তাঁর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব হারান নি। তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যত বড় ক্ষমতাশালী হউক না কেন, তিনি কখনো তাদের নিকট নতি স্বীকার করেন নি। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি ছোটলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। কিন্তু কথাবার্তার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনচিত্ততা এমন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে লাটসাহেব তাঁর প্রতি বিশেষ খুসী হতে পারেন নি। তাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদের বেশী আর কোনো উচ্চপদ তাঁকে দেওয়া হয় নি। কাজকর্ম ও আচার আচরণে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনোভাবের জন্য ক্ষমতাগর্বী ইংরেজরা দ্বিজেন্দ্রলালকে সহ্য করতে পারত না। তাঁর অনমনীয় মনোভাবের জন্য জীবনে তাঁর কখনো পদোন্নতি হয় নি।

বিদেশী শাসকের দুর্ব্যবহারে দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রলাল চাকরির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। নিজ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে পরাধীনতার গ্লানি তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বিদেশী শাসনের প্রতি বিরূপভাব তাঁর স্বদেশপ্রীতিকে আরও দৃঢ়তর করে তোলে। তাই তিনি তাঁর চাকরি জীবনের মধ্যেও জাতীয় ভাবোদ্দীপক অসংখ্য কবিতা ও গান রচনা করেন। জাতীয় আন্দোলনসমূহে এই সব কবিতা ও গান দেশবাসীর মধ্যে অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর আজও তাঁর রচিত বহু সঙ্গীতের প্রভাব জাতীয় জীবনে অক্ষুণ্ণ আছে। স্বদেশবন্দনায় এদের প্রেরণা অপরিসীম।

দ্বিজেন্দ্রলাল বিলেত থেকে কৃষি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে এসেছিলেন। কৃষকদের দুরবস্থার যাতে লাঘব হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখেই তিনি কৃষির উন্নতির জন্য সরকারের কাছে একটি সুন্দর ও বাস্তব পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। কিন্তু প্রজা-শোষক সরকার কিছুই করতে রাজী হয় নি। দেশের আত্মবিশ্বাসহীন, শোষিত দরিদ্র কৃষকদের কবি আশ্বাস দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে আহ্বান জানালেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধভাবে উন্নত শিরে রুখে দাঁড়াবার জন্য। তাঁর 'আলেখ্য' কাব্য 'গ্রন্থের ষোড়শ চিত্র'-এর কবিতা :

"ওরে ও ভাই চাষী! ওরে ও ভাই তাঁতি!
পড়িস নাক নুয়ে; জানিস্ এ সব ফাঁকি;
তোদের অন্নে পুষ্ট, তোদের বস্ত্র গায়ে,
কর্বে তোদের উপর রক্তবর্ণ-আঁখি?
সারিবদ্ধ হয়ে, একবার মাথা তুলে,
দাঁড়া দেখি তোরা সবাই সোজাভাবে ;—

দেখবি এই যে দম্ভ, দেখবি এই যে দর্প,
দেখ্‌বি এই যে স্পর্ধা,—চূর্ণ হয়ে যাবে।
উঠে দাঁড়া দেখি—মানুষ যদি তোরা—
এদের সামনে কেন মাথা নুয়ে যাবি ?
সমস্বরে বল্ 'এই সকলেরই মাটি,
কারো চেয়ে কারো বেশী নাই ক দাবী'।"

এইভাবে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মর্মন্তুদ বাস্তব ঘটনা কঠোর ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থাবলীতে।

দ্বিজেন্দ্রলাল সামাজিক ও রাজনৈতিক সকলপ্রকার ভণ্ডামির প্রবল বিরোধী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় তিনি ছিলেন মেকীর শত্রু। তিনি নিজে ছিলেন ন্যায়পরায়ণ বাস্তববাদী মানুষ। সেইজন্যই তিনি সর্বপ্রকার কৃত্রিমতাকে বিদ্রূপ করতেন। "কল্কি অবতার", "ত্র্যহস্পর্শ" প্রভৃতি ব্যঙ্গপ্রধান প্রহসন। এই সবের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন রক্ষণশীল সমাজকে আঘাত করেছেন, অন্যদিকে বিলাত-ফেরতা সমাজের অতিরিক্ত সাহেবিয়ানাকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনের গঙ্গারাম চরিত্র এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর গানগুলির মধ্যে সামাজিক ব্যঙ্গ বিদ্রূপের চূড়ান্ত পরিচয় বিদ্যমান। "আমরা বিলাত-ফের্তা ক'ভাই", "নূতন কিছু করো একটা নূতন কিছু করো," "কটি নবকুল কামিনী","চম্পটির দল আমরা সবে" প্রভৃতি গানগুলির মধ্য দিয়ে বিকৃত সমাজ ব্যবস্থাকে তীব্র কশাঘাত করা হয়েছে। হাসির গান, প্রহসন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপছলে জাতিকে অসাড়তা ও ক্লীবতা থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ।

জাতীয় জাগরণের আদিতে দেশকে জাগাবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সভাসমিতিতে খালি প্রস্তাব পাস এবং অন্তঃসারশূন্য বক্তৃতা হত। এ সব দিয়েও কবি ব্যঙ্গ কবিতা লিখলেন। তাঁর "আষাঢ়ে"র 'কলিযজ্ঞ' কবিতায় এই ব্যঙ্গ সুস্পষ্ট। 'তা সে হবে কেন' গানে বক্তৃতা-সর্বস্ব দেশপ্রেমিক, অপদার্থ হিন্দুধর্ম-ব্যাখ্যাতা, প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল ও নারীমুক্তি বিরোধীদের ব্যঙ্গ করেছেন। "হাসির গানে"র 'নন্দলাল' কবিতায় পোশাকী মেকী দেশপ্রেমিকতাকে তীব্র কশাঘাত করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রেম শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যেই নিঃশোষিত হয় নি। দেশের দুরবস্থায় ব্যথিত হয়ে দেশবাসীকে জাগাবার জন্য তিনি বহু স্বদেশপ্রেমমূলক রচনা সৃষ্টি করেন। সে সব রচনা নিছক ভাবপ্রবণ নয়; বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে জাতীয় জাগরণের এক বিরাট ঢেউ

এসেছিল। সেই সময় সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যাঁরা জাতির কর্ণকুহরে জাতীয়তা সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়েছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম বলিষ্ঠ পুরুষ। শুধু গান ও কবিতা নয় স্বদেশপ্রেমমূলক অসংখ্য নাটক রচনা করে তিনি বাংলার গ্রাম ও নগরকে দেশপ্রেমের বন্যায় প্লাবিত করেছিলেন। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে সাধারণ মানুষের মনে প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় ভাবধারা প্রচারের পক্ষে নাটকই শ্রেষ্ঠ উপায়। তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক নাটকগুলি প্রায় সবই ইতিহাস-ভিত্তিক। ভারতীয় ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়গুলির মাধ্যমে তিনি দেশবাসীকে মুক্তিমন্ত্রে উদ্দীপিত করে তুললেন। তাঁর দ্বিতীয় ইতিহাসাশ্রিত নাটক "রাণা প্রতাপসিংহ"। এই নাটকের মধ্যে তিনি দেশাত্মবোধের অভূতপূর্ব আদর্শ উদ্ঘাটিত করলেন। চিতোর উদ্ধারসাধনের জন্য প্রতাপসিংহের অসামান্য ত্যাগ, দৃঢ়তা, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি বীরোচিত মহৎ গুণাবলী বাঙালী জাতির সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। একে একে তাঁর 'দুর্গাদাস', 'তারাবাই', 'মেবার পতন', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'নূরজাহান', 'সিংহল বিজয়' প্রভৃতি নাটক প্রকাশিত হল। এবং এই সব নাটকের অধ্যায়ে অধ্যায়ে বর্ণিত স্বদেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, ন্যায়পরায়ণতা ও মনুষ্যত্ববোধ প্রভৃতির মহিমা শত শতাব্দীব্যাপী পরশাসনে নিপীড়িত দেশবাসীর মনে অফুরন্ত আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করল। "মেবার পতন" নাটকের একটি চারণ সঙ্গীত হতাশা-ক্লিষ্ট যে কোনো জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণার এক বিরাট উৎস :

"কিসের দুঃখ করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ' ॥
পরের পরে কেন এ রোষ,
নিজের যদি শত্রু হোস ?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ' ॥

তাঁর নাটকগুলির মধ্যে এইরূপ উদ্দীপনাময়ী বহু গান সংযোজিত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমমূলক এই সব রচনার জন্য এদেশের ইংরেজ শাসক তথা তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। তাঁর কোনো কোনো রচনার জন্য তাদের কাছে তাঁকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। কবির নিজের ভাষায়, "ক্রমাগত transfer (বদলি) আমাকে যথার্থই যেন অস্থির করে তুলেছে। এত বদলি করছে কেন জান ? আমার বিশ্বাস স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান, আর ঐ প্রতাপসিংহ নাটকই তার মূল। কিন্তু কি বুদ্ধি! এমনি একটু হয়রান করলেই বুঝি আমি অমনি আমার সব মত ও বিশ্বাসকে বর্জন করব ?"

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রীতির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "তিনি স্বজাতিকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি দেশের দৈন্য দূর করতে হয়, তার জন্য আমাদের মনে ও চরিত্রে যোগ্য হতে হবে, সরল হতে হবে। আমার বিশ্বাস, তাঁর দেশপ্রীতির চরম বাণী এই যে 'আবার তোরা মানুষ হ'।"

১৯০৫ সালের 'স্বদেশী আন্দোলনে' দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে একাধিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রাণের আবেগে তিনি মাঝে মাঝে শোভাযাত্রায় যোগদান করে স্বরচিত স্বদেশী সংগীত গাইতেন। 'রাখীবন্ধনে'র দিন তিনি জনতার সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে টাউন হলের এক সভায় 'স্বদেশী' ব্রতের এক সংকল্প গ্রহণ করা হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ সময় কলকাতায় ছিলেন। তিনি এই সংকল্প গ্রহণের সংবাদে আনন্দে অধীর হয়ে পড়েন। এই ঘটনার বিষয় উল্লেখ করে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "আজ নবজীবনের উন্মাদনায় আমরা আত্মহারা ও তন্ময় হইয়া গিয়াছি। বাংলার জীবনে আজ একি অপূর্ব অমৃতের আস্বাদ। যাহা স্বপ্নের অগোচর, কল্পনার অতীত ছিল, আজ সেই বিচিত্র স্বর্গীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন আমার ধন্য, সার্থক হইল। প্রাণ আমার স্নিগ্ধ শীতল হইয়া জুড়াইয়া গেল।...ধন্য সুরেন্দ্রনাথ।"

'স্বদেশী আন্দোলনে'র স্বরূপ দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বদেশপ্রেম যাতে মানুষের মনে অন্তঃসারশূন্য বুলিতে পরিণত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেছিলেন, "স্বাভাবিক মনের আবেগে যদি আমার মাকে 'মা' বলিয়া পূজা না করি, যদি পরের দ্বারা আহত না হইলে আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া মাকে মর্যাদা দিতে না চাই, যদি অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসার টানেই মার দৈন্য ক্লেশ দূর করিতে না পারি, তবে তো ভয় হয়—বুঝিবা আমাদের পূজা আন্তরিক নহে।"

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হতেন। একবার দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠে তাঁর "মেবার পাহাড়" গানটি শুনে বলেছিলেন, আপনার এ গানে আমরা কবিত্ব উপভোগ করতে পারি, কিন্তু যদি আমি মেবারের লোক হতেম তাহলে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটিত। তাই আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি এমন একটি গান লিখুন যাতে বাংলার বিষয় ও ঘটনা—বাঙালীর বিষয় ও ঘটনা থাকে।" বিজ্ঞানাচার্যের এই অনুরোধে অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত মাতৃবন্দনার মহান সঙ্গীত 'আমার দেশ' :

"বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!

কেন গো মা তোর ধূলায়-আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ।
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে "আমার দেশ"—

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ।"

... ...

আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য! মানুষ আমরা নহি ত মেষ!
দেবি আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ।"

কবির নিজের কাছে এই গানটি অতি প্রিয় ছিল। তিনি প্রায়ই এই গানটি গাইতেন। একদিন লোকেন্দ্রনাথ পালিত মশাই দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে এই গান শুনে বিস্ময়ে, আনন্দে, অপূর্ব গর্বে ও অকৃত্রিম দেশভক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি কবির দু'টি হাত সবেগে ধারণ করে বললেন, "আহা কি অপূর্ব! কি সুন্দর! ভাই দ্বিজু, আমি আজ পর্যন্ত জীবনে যত জাতীয় সঙ্গীত শুনেছি এটি তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ও মহত্তম।" বাংলার অতীত ঐতিহ্য-গৌরবে গানটি সমৃদ্ধ। ঐ সুমহান ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে নিজে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছেন, দেশকেও উদ্‌বুদ্ধ করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশমাতৃকা ভারতবন্দনামূলক কবিতাগুলি ভাবে ও ছন্দে অপূর্ব। এইসব কবিতার আবৃত্তিতে হৃদয় মন দেশপ্রেমের পবিত্রতায় ভরপুর হয়ে ওঠে।

(১) "যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ।
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
সে দিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সব "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ।"

(২) "ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।

... ...

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী?
কর্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।"

চির-গরীয়সী স্বদেশজননীকে উদ্দেশ্য করে কবি লিখলেন:

"তুমি ত মা সেই তুমি ত মা সেই চির-গরীয়সী ধন্যা অয়ি মা!
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন, হারায়েছি সব বিভব, গরিমা;
তুমি ত মা আছ তেমতি উচ্চ, আমরা শুধুই হয়েছি তুচ্ছ,
তোমারি অঙ্কে লভিয়া জনম, জানি না কি পাপে এ তাপ সহি মা!
... ...
তোমার বিভব পূর্ণ বিশ্ব, আমরা দুঃখী আমরা নিঃস্ব,
তুমি কি করিবে তুমি ত মা সেই মহিমা-গরিমা-পুণ্যময়ী মা!"

আর একটি সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল কল্যাণময়ী ভারত জননীর এক অপূর্ব মূর্তি অঙ্কিত করলেন, যাকে সেদিন দেশবাসী ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে ভক্তিভরে বন্দনা ক'রেছিল। আজও আমাদের জাতীয় জীবনে গানটির প্রভাব অসামান্য।

"ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা;—
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি।
... ...
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ!
—ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—"

দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশ-স্তোত্র রচনার সঙ্গে সঙ্গে দু-একটি সমর সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। এমন একটি সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করা গেল যার আবেদন চিরকালের।

ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে—গাও উচ্চে রণজয় গাথা।
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে—শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।
... ...
সাজ সাজ সকলে রণসাজে, শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে।
চল সমরে—দিব জীবন ঢালি—জয় মা ভারত জয় মা কালী!"

রবীন্দ্র-গীতি-প্লাবনে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল, তখনই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সৃষ্টি-গৌরবে বাঙালীর হৃদয় যেভাবে অধিকার করেছিলেন, তাতেই তাঁর সৃজনী প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। "তাঁর জাতীয় সঙ্গীতগুলি বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারের মহার্ঘ রত্ন। মৌলিকতার হিসাবে এবং প্রকাশের ধরনে,—সরল, সতেজ ও সুস্পষ্ট ভাব-

বিন্যাসে—এ সকল সঙ্গীতের যে একটা অপূর্ব বৈচিত্র্য আছে তাহা প্রকৃতই অতুলনীয়।”

‘সাহিত্য’-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ভাষায়, “দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি নন, হাস্য রস-সমুজ্জ্বল মধুর গানের রচয়িতা নন, তিনি আমাদের জাতীয়তার পুরোহিত। তিনি বাঙালীর পথ-প্রদর্শক। তিনি স্বদেশী-তন্ত্রের কবি। তিনি একনিষ্ঠ ভগীরথের মতো বাঙালীর অবদান-হিমাচলে অধিষ্ঠিত দেশাত্মবোধ-মহাদেবের জটাজট-হইতে দেশভক্তি-ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ আনিয়া কোটি কোটি ভারত সন্তানের জীবমুক্তির সাধন করিয়া গিয়াছেন। এ ঋণ কি জাতি কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে।”

জাতির শিক্ষাগুরু

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

উনিশ শতকের প্রথম পাদে এদেশে আধুনিক শিক্ষার উদ্বোধন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর এবং মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁদের অসাধারণ প্রতিভাবলে ও সুকঠোর পরিশ্রমে জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করে যান। বিশ শতকের প্রারম্ভে আবির্ভূত হন পুরুষসিংহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যিনি পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শিক্ষাকে জাতির জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

আশুতোষের ছিল এক অনন্যসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত গৌরবময় ছাত্রজীবন। তাঁর সেই জীবনকাহিনী দেশের ছাত্রসমাজের নিকট আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং উৎসাহ, উদ্দীপনার চিরন্তন উৎস হয়ে আছে। ছাত্রজীবনেই আশুতোষ দেশের দুঃখ, দারিদ্র্য ও পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতার দ্বারা দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে মাতিয়ে তুলেছিলেন। আশুতোষও ঐ সময় তাঁর ছাত্রজীবনে একবার রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর ন্যায় প্রতিভাধর পুরুষ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করলে যে দেশের একজন খ্যাতনামা নেতা হতেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু স্থিতধী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আশুতোষ সহজ খ্যাতির সে পথ পরিহার করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন যে সমগ্র দেশ যেখানে মধ্যযুগীয় নানা কুসংস্কার ও অশিক্ষা-অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, সেখানে জাতীয় চিত্তকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করতে না পারলে স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করা হবে নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। আর তিনি এও বুঝেছিলেন যে শিক্ষাক্ষেত্রকে বিদেশী শাসকের হাত থেকে স্বদেশের করায়ত্ত করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় জাগরণ সম্ভব নয়। তাই তিনি শিক্ষাকে জাতীয় মুক্তির অপরিহার্য বিষয় মনে করে একে সর্বব্যাপক করে তুলতে চেয়েছিলেন। "আশুতোষ জানতেন যে উপযুক্তরূপে বারুদ প্রস্তুত করে, যথাসময়ে অগ্নি প্রয়োগ করতে পারলে ভীষণ অগ্ন্যুদ্গম অবশ্যম্ভাবী।

তাঁর এ ধারণাও ছিল যে জাতীয় জীবনের প্রকৃষ্ট বারুদ তৈরীর প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র বিদ্যাপীঠ এবং তার উপাদান তরুণ জীবন। আশুতোষ এই দুই ক্ষেত্র ও উৎপাদনকে উপযুক্তরূপে তৈরী করতে লাগলেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই আশুতোষ শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের স্বপ্ন দেখতেন। কলেজে অধ্যয়নের সময়ই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুনের পুস্তক-পুস্তিকা সংগ্রহ করে পড়তেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হতে ভালবাসতেন। ১৮৮৯ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সে আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য হন। এই সময় থেকে তাঁর সতত প্রয়াস ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন-ভার বিদেশী ইংরেজ শাসকদের হাত থেকে স্বদেশীয়দের করায়ত্ত করা। কারণ, এছাড়া শিক্ষা সংস্কারের কোনো উপায় ছিল না। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে যে সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন তা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চালিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন যখন বুঝলেন যে পাশ্চাত্ত্যের উচ্চশিক্ষা ক্রমে ভারতবাসীদের জাতীয় ভাবাপন্ন করে তুলছে, তখন তিনি এদেশে উচ্চশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করে শিক্ষা সংকোচ করতে চাইলেন। আশুতোষ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তখন তাঁকে হাত করার জন্য হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত করলেন। এর পূর্বে আশুতোষ স্বাধীন ওকালতি ব্যবসায় প্রচুর অর্থোপার্জন করছিলেন। কিন্তু তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম করার সময়ের বড় অভাব হত। তাই তিনি বিচারকের পদ গ্রহণ করেন। এতে অন্যান্য কাজ করবার যথেষ্ট সময় পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া, তিনি বুঝেছিলেন যে ইংরেজ এদেশের শাসক, তাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ না করতে পারলে তাঁর বহু-আশাঙ্ক্ষিত শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাবলে তিনি ইংরেজের একান্ত বশংবদ ছিলেন, একথা মনে করলে সম্পূর্ণ ভুল হবে। বরং দেখা গেছে সামান্যতম কোনো কারণে শাসকদের সঙ্গে মতভেদ হলে তিনি অত্যন্ত নির্ভীক হৃদয়ে তার তীব্র প্রতিবাদ করতেন। তাঁর ন্যায় এমন নির্ভীক তেজস্বী পুরুষ পৃথিবীতেই খুব কম দেখা যায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী। যত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাজপুরুষই হোন না কেন, আশুতোষের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ থেকে কারুর নিস্তার ছিল না। বড়লাটের সঙ্গেও তাঁর বহুবার নানা বাক্‌বিতণ্ডা হয়েছে। এই তেজস্বী কর্মবীরের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একবার বলেছিলেন, "মরণের পরপারে যাইয়া যদি আমাদের চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করে—যে কি দেখিয়া আসিলে ? তখন বলিব একজন কর্মবীর দেখিয়া আসিয়াছি। অধীন জাতিতেও একজন স্বাধীন-স্বরূপ দেখিয়া আসিয়াছি।"

১৯০৪-২৩ সাল পর্যন্ত আশুতোষ হাইকোর্টের বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২০ সালে একবার কয়েক মাসের জন্য প্রধান বিচারপতির কাজও করেছিলেন। তিনি যে নির্ভীকতা, নিরপেক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন, তা দেশী-বিদেশী সকলের নিকটই পরম বিস্ময়ের বস্তু ছিল। জজের পদে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে পরিপূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯০৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা 'ভাইস্ চ্যান্সেলার' নিযুক্ত হন এবং ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এ পদে ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে হাত দিয়ে আশুতোষের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হল দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি বললেন যে তিনি বাংলার ঘরে ঘরে স্নাতক সৃষ্টি করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং পরীক্ষার নিয়ম-কানুন এমনভাবে তৈরী করলেন, যার ফলে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার অনেক বেড়ে গেল। অথচ শিক্ষার মানের কোনো অবনতি ঘটল না। তাঁর অন্তরের ইচ্ছা ছিল যে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়লেই, তা। দেশের পরাধীনতাজনিত দুরবস্থার কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারবে এবং তখন দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙবার জন্য তাদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগবে। পরবর্তীকালে তাঁর এ চিন্তা সত্য হয়েছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিরাই দেশের মুক্তিসংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম হয়েছে।

স্যর আশুতোষের সর্বপ্রধান কীর্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বা পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের সৃষ্টি ও উন্নয়ন করে এদেশে উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করেন। ১৯০৪ সালের পূর্বে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি পরীক্ষাশালা মাত্র। আশুতোষ কলা ও বিজ্ঞানের বহু বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণী খুললেন। শুধু তাই নয় প্রত্যেকটি বিষয়ে গবেষণা করারও ব্যবস্থা করলেন।

"যে ভারতবর্ষ চিরকাল জগদ্গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া জ্ঞান-রাজ্যে কর্তৃত্ব করিবার অধিকারের দাবী রাখিয়াছে, সেই ভারতবর্ষ এখন হৃত-সর্বস্ব হইয়া পশ্চিমের দুয়ারে চিরকাল কাঙালের বেশে শিষ্যত্ব করিয়া বেড়াইবে, এই হীনতা তাঁহার কাছে দুঃসহ বোধ হইয়াছিল। তিনি এই দেশকে আবার জ্ঞান-রাজ্যের অধীশ্বরের আসন দিবেন—এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। জগতের চক্ষে আবার ভারতবাসী বড় হইবে, পাশ্চাত্ত্য মনস্বীদের পার্শ্বে গুরুর বেশে না হউক, অন্ততঃ সমকক্ষতা করিয়া গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইবে,—এই সঙ্কল্প লইয়া তিনি কর্ম-ক্ষেত্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্য-জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা-কেন্দ্ররূপে—পাশ্চাত্ত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বোচ্চ আসন না হউক—একাসন লাভ করিবে, ইহাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য।"

স্নাতকোত্তর ও গবেষণা বিভাগগুলিকে উন্নত করে তোলার জন্য আশুতোষ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃতি সন্তানদের অনুসন্ধান করে এনে এক একটি বিভাগে নিযুক্ত করলেন। তাছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণী মনীষীদের নিমন্ত্রণ করে এনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়াতেন। অনেককে অধ্যাপক পদেও নিযুক্ত করেছিলেন। এইভাবে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি চেয়েছিলেন দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণীজনের সমাবেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হোক। লর্ড রোনাল্ড্‌সে বলেছিলেন—"হিউয়েন সাং লিখিয়া গিয়াছেন,—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০,০০০ ছাত্র বাস করিয়া অধ্যয়ন করিত। পৃথিবীর দূর-দূরান্তর হইতে অজস্র জল-প্রবাহের ন্যায় শিক্ষার্থীরা 'নালন্দায় তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে উপস্থিত হইত। বহু শিক্ষার্থী দ্বার-পণ্ডিতের নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইত। প্রতি দশজন প্রার্থীর মধ্যে ২।৩ জন মাত্র গৃহীত হইত, অপর সকলের দাবী গ্রাহ্য হইত না। আশুবাবুর গঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই নালন্দার আদর্শ লক্ষ্য করিতেছে।"

স্যর আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নানা বিদ্যাচর্চার এক মহাসমারোহপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। এদেশের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে ইহা তিনি জাতীয় অগৌরবের বিষয় বলে মনে করতেন। তাই তিনি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ঐশ্‌লামিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রাচীন কীর্তি উদ্ধার ও প্রাচ্য ভাষাসমূহের অনুশীলনের জন্য দেশবিদেশের বহু শিক্ষাব্রতীকে আহ্বান করেছিলেন। বিজ্ঞানের নানা শাখায়ও গবেষণার ব্যবস্থা করে দিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র, সি. ভি. রমণ, প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিক যে বিশ্ব-বিজ্ঞান সভায় ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, তার মূলে রয়েছে আশুতোষের অবদান। ভাষাবিদ্‌ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখানে আজকাল যে এত বেশী বিষয় আলোচনার সুযোগ হয়েছে, এ কেবল তাঁরই সাধনায়, আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে জগৎকে নানা বিষয়ে কিছু না কিছু নূতন কথা শোনাতে পেরেছে এ তো তাঁরই শুভেচ্ছায়—তাঁরই প্রেরণায়।"

স্যর আশুতোষের ছিল বিরাট এক গ্রন্থাগার। এত বড় ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার পৃথিবীতে বোধ হয় আর কারুর ছিল না। ঐ গ্রন্থাগারে তিনি পৃথিবীর নানা বিদ্যার গ্রন্থ সংগ্রহ

করেছিলেন। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর বাস্তব জ্ঞান ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যখন যা করতে চাইতেন, তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন। মনীষী দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায়, "তিনি প্রকৃত যোগীর ন্যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা তাঁহার ধ্যানের মধ্যেই পাইয়াছিলেন। অন্য লোকের সঙ্গে তাঁহার এই প্রভেদ ছিল যে, যাঁহারা 'স্বপ্নদ্রষ্টা', তাঁহারা প্রায়ই কবির মতো কল্পনা-বিলাসী হইয়া থাকেন, কর্ম-ক্ষেত্রে তাঁহারা কোনো পরিচয় দিতে পারেন না। কিন্তু আশুবাবু মনে মনে যে বৃহৎ কল্পনা গড়িয়া তুলিতেন, সেই গড়নটি তিনি কর্মক্ষেত্রে ফলপ্রদ করিতে শক্তি রাখিতেন। তাঁহার বিশাল মস্তিষ্কে যাহা আদর্শরূপে গঠিত হইত, তাঁহার বিশাল বাহু তাহা কার্যক্ষেত্রে রূপদান করিতে পারিত।"

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে আর একটি কাজ করেছিলেন। সেটি হচ্ছে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ। ভূর্জপত্র ও প্রাচীন কাগজে লিখিত প্রায় দশ হাজার পুথি তিনি সংগ্রহ করিয়েছিলেন। অসংখ্য তিব্বতীয় পুথি, জাপানী পুথি এবং প্রায় ৭৭০০ বাংলা প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হয়েছিল। এই সব পুথি দেশ, ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পুনর্লিখনে প্রভূত সাহায্য করেছে। এই সব পুথির সাহায্যে দেশ ও জাতির নানা গৌরবময় অধ্যায় লিখিত হয়েছে।

১৯০৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারকল্পে আইন প্রণয়নের জন্য যে কমিটি গঠিত হয় আশুতোষ তার সদস্য ছিলেন। এবং তাঁরই নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা নতুন আইন তৈরী হয়েছিল। তিনি তাঁর অপূর্ব প্রতিভাবলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্রমে ক্রমে একটি স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুমুখী বিরাট কর্মকাণ্ডের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। এজন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের উপর বিশ্ববিদ্যালয়কে বহুলাংশে নির্ভর করতে হত। বিদেশী ইংরেজ সরকারও অধিকতর অর্থ সাহায্যের প্রলোভন দেখিয়ে বা সাহায্য বন্ধের হুমকি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন কর্মধারার উপর কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ আশুতোষ অর্থের বিনিময়ে মাতৃরূপী বিশ্ববিদ্যালয়কে দাসত্বের বেড়ী পরাবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি একবার বলেছিলেন,

'...যে পর্যন্ত আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকবে, সে পর্যন্ত আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবমাননার সহযোগিতা করব না। আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলাম তৈরী করবার যন্ত্র-শালায় পরিণত হতে দেব না। আমরণ সত্যের প্রতি অনুরাগ দেখাব, স্বাধীন মনোবৃত্তি শিক্ষা দেব। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যাতে উচ্চ ভাব ও উচ্চ

আদর্শের প্রেরণা লাভ করতে পারে, আমরা সেইরূপ শিক্ষা দেব; কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয়কে সেক্রেটারীদের দপ্তরের আত্মসাৎ হতে দেব না।...যদি আমার এক হস্তে অর্থ এবং অপর হস্তে দাসত্ব দেওয়া হয়, তবে আমি সেই অর্থ ঘৃণা করব।...বরঞ্চ দেশের লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করব ও দেশে যে আত্মশক্তি-বোধ নিদ্রিত হয়ে আছে, তা জাগিয়ে দেশবাসীর বর্তমান সময়ে দায়িত্ব কি, তা বুঝাতে চেষ্টা করব।"

সরকারের দুরভিসন্ধির বিষয় বুঝতে পেরে আশুতোষ তাদের সাহায্যের আর মুখাপেক্ষী হলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তিনি যখন দেশবাসীর নিকট আবেদন জানালেন, তখন অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। দেশের চারিদিক থেকে অজস্রধারে লক্ষ লক্ষ টাকা দান হিসাবে আসতে লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগগুলি দেশের জনসাধারণের দানেই বিরাট আকারে গড়ে উঠেছে।

ইংরেজ সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিতে শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। একে করায়ত্ত করতে না পেরে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে তিন হাজার ছাত্র পড়াশুনা করে সেখানে সরকারী সাহায্য পেল মাত্র এক লক্ষ টাকা, আর ঢাকায় যেখানে ছাত্র সংখ্যা এক হাজার, সেখানে সাহায্য পেল ন'লক্ষ টাকা। আশুতোষ এতে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এবং ক্ষোভে বাংলার তৎকালীন ছোট লাট লর্ড লিটনের নিকট পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেছিলেন।

স্যর আশুতোষের জাতীয়তাবোধের আর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় মাতৃভাষা বাংলার প্রতিষ্ঠা। তিনি বাল্যে লক্ষ্য করেছিলেন যে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা মাতৃভাষার চর্চায় বিমুখ। তারা মাতৃভাষা না-জানা গৌরবের বিষয় বলেই মনে করে। 'মাতৃসম মাতৃভাষা'র প্রতি শিক্ষিত সমাজের এরূপ উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের ভাব দেখে আশুতোষ অত্যন্ত ব্যথিত হন। অথচ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে জাতীয় জাগরণ ও জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি সেই ছাত্রজীবনেই সঙ্কল্প করেছিলেন যে বড় হয়ে তিনি বাংলাভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। আশুতোষের আপন ভাষায়, "প্রথম যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন ক্রমে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়। আমার

মাতৃভাষাকে যদি কোনো মতে সম্পত্তিশালিনী করিতে পারি, আমার জীবন ধন্য হইবে।"

সিণ্ডিকেটের সদস্য হয়ে ১৮৯১ সালের ১লা মার্চ আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি প্রস্তাব করলেন যে এন্ট্রান্স থেকে এম. এ. পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষাতেই বাংলা ভাষার একটি বিশেষ পরীক্ষা প্রবর্তিত হোক। এই প্রস্তাব বিবেচনা করবার জন্য চার মাস পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় আশুতোষ তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করলে উমেশচন্দ্র দত্ত উহা সমর্থন করেন। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে ইংরেজদের সঙ্গে অনেক বাঙালীও ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এমন কি তাঁরা আশুতোষকে নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং পরিহাসও করেছিলেন। তাঁরা বললেন, "বাংলা ভাষা কি আর একটা ভাষার মধ্যে গণ্য। বাংলা ভাষায় কি এমন পুস্তক আছে বা হইতে পারে যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার যোগ্য। এ কি আবার একটা সমীচীন প্রস্তাব, আর বাঙলা ভাষায় পরীক্ষাই বা কি হইবে?" এইভাবে নানা দিক থেকে নানা আপত্তি উঠতে লাগল। সমস্ত বিদ্রূপ, আপত্তি উপেক্ষা করে আশুতোষ এক ঘণ্টা ধরে জ্বালাময়ী ভাষায় মাতৃভাষা প্রবর্তনের স্বপক্ষে বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু এবারে তাঁকে পরাজিত হতে হল। তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, আনন্দমোহন বসু এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিগণ। পরাজিত হলেও তাঁর বক্তৃতা অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়েছিল। বিরোধী পক্ষও তাঁর বক্তৃতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলেও দৃঢ়মনা আশুতোষ নিরুৎসাহিত হলেন না। তিনি ধীরে ধীরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিছু কাল পরে সভ্যরা অনেকেই আশুতোষের মহৎ উদ্দেশ্যের বিষয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। এবং যথা সময়ে তাঁর প্রস্তাব অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হওয়ায় বাংলা ভাষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান লাভ করল। ফলে এন্ট্রান্স থেকে বি.এ. পরীক্ষা সমূহে বাংলা আবশ্যিক পাঠ্য হল। এর পরে বাংলা ভাষায় এম.এ. পরীক্ষার প্রবর্তনও করেছিলেন আশুতোষ। পরাধীন ভারতে পর্বত প্রমাণ বাধা অতিক্রম করে আশুতোষ বিশ্বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার আসন যে ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও কর্ম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন, "আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথা যখনই ভাবি তখনই মনে হয় যে, ইনি যদি কোনো স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, একজন ক্লামাঁসো হইতে পারিতেন, কেন না বাঙালির ক্ষুদ্রতর কর্মক্ষেত্রে ইনি তাঁহারই মতো তীক্ষ্ন বুদ্ধি,

অসাধারণ বীর্য ও অক্লান্ত শ্রম সহিষ্ণুতার উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ...বাস্তবিক আমার মনে হয়, বাঙালি জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো পুরুষ আশুতোষ ছাড়া আর দেখা যায় নাই। এই জাতির উত্থান আশুতোষের মতো জন কয়েক নির্ভীক, একাগ্রপরায়ণ, কৃতবিদ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে সাধক পুরুষের আবির্ভাবে দেখা যায় ও এই জাতির জীবন শক্তির ক্রমোন্নতির উজ্জ্বল উদাহরণ পাওয়া যায়।...পর-পদ-লেহন না করিয়া কেবল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া একজন বাঙালিও একটা মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে, আশুতোষের ন্যায় জীবন তাহা প্রমাণ করিয়াছে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিজ পুরুষকার দ্বারা ইহার এতটা উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন যে ইহা ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।”

আশুতোষ শুধু বাংলা ভাষারই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি চান নি, ভারতের প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও পরস্পরের সংযোগসাধন কামনা করেছিলেন। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে ভারতের জাতীয় সংহতি গড়ে উঠবে। তাই তিনি বলেছেন, “অন্যের যাহা ভাল, তাহা আমাকে লইতে হইবে; আমার যদি কিছু ভাল থাকে, তাহা অন্যকে অঞ্জলি পুরিয়া দিতে হইবে। এইরূপ আদান-প্রদান ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা নাই, পূর্ণত্ব-লাভের সম্ভাবনা নাই। এমন একটি সাধারণ উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহার আশ্রয়ে বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, গুর্জর, রাজপুতানা, গান্ধার, পাঞ্জাব—সব এক সূত্রে গ্রথিত ও সাহিত্যের এক সমতটে সমবেত হইতে পারে... যদি এমনই সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারি, সমগ্র ভারত যাহাকে নিজের বুকে তুলিয়া লইবে—যদি এমনই রত্ন উদ্ধার করিতে পারি. তবেই তো মায়ের প্রকৃত পূজা করিলাম,—অন্যথা মায়ের অবমাননা মাত্র। এস সাহিত্যিক, এস বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক, এস ভাই বাঙালী, এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমরা ভারতবর্ষের খণ্ড খণ্ড সাহিত্য-রাজ্যগুলি এক করিয়া, এক বিরাট সাহিত্য-সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। এ জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। আমি একা আমি দুর্বল, আমি অসহায়, এই সকল মনুষ্যত্ব-ঘাতী চিন্তা পরিহার করিয়া সিংহবিক্রমে কার্যে প্রবৃত্ত হও, সিদ্ধি নিশ্চিত।”

আশুতোষ তাঁর এই কল্পনাকে রূপ দিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। তিনি সেখানে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে মারাঠী, গুজরাটী, ওড়িয়া, উর্দু, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম্ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, "ভারতের সাহিত্যিক একতার সমাধান যদি করিতেই হয়, তবে তাহা যতদূর সম্ভব ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যেই করিতে হইবে।"

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আশুতোষ ইংরেজীর পরিবর্তে যে ভারতীয় ভাষার প্রচলনের অতিশয় প্রয়াসী ছিলেন, তার কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "জাতীয় ভাব বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় ভাষার সেবা আবশ্যক। বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য-গঠনের চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য। দশভুজার পাদপদ্মে রক্ত জবার অর্ঘ্যই মানায়, গোলাপ শত সুন্দর হইলেও মাতৃপদের অযোগ্য।"

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে আশুতোষ 'ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' ও 'বঙ্গীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও প্রেরণাদায়ক। এই সব অভিভাষণে তিনি দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পথ-নির্দেশ করেছিলেন। দেশবাসীকে আত্মবিশ্বাস আশা আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত করে বলেছিলেন, "ভারতবাসীর একাগ্রতা, ও অধ্যবসায় ও আত্ম-সমর্পণের কথা যখন মনে করি, তখন আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, ভারতবাসীরা কোনো কাজে অসমর্থ,—তা সে কাজ যতই দুষ্কর বা আয়াসসাধ্য হউক না কেন। পারঞ্জোপে, গোখ্‌লে, রাণাডে, রামমোহন, রবীন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, প্রফুল্ল-জগদীশ-রাসবিহারী, বিবেকানন্দ-সুরেন্দ্রনাথ-সুব্রহ্মণ্য প্রভৃতির দিকে যখন তাকাই, তখন আশায় আমি উৎফুল্ল হই। এ পর্যন্ত এমন কোনও কাজ তো দেখিলাম না, যাহা কঠোর বা অসাধ্য বলিয়া ভারতবাসী ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং আমাদের নিরাশ বা ভগ্নোদ্যম হইবার কোনো কারণ নাই। কাজ করিতে আসিয়াছি, করিয়া যাইব। সঙ্কল্পে যদি দোষ না থাকে, মনে যদি কলঙ্ক না থাকে, শত সহস্র মত্ত ঐরাবতেও আমাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিবে না, মানুষ তো কোন্ ছার। এ সংসারে কেহ কাহাকেও কিছু করিয়া দেয় না, প্রকৃতপক্ষে দিতে পারে না।...'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—সত্য কথা। শুধু দৈহিক বল নহে,—দৈহিক বলের সামর্থ্য অতি অল্প—মানসিক বল চাই। মনের বলে বলীয়ান্ হও, দেখিবে বিশ্ব তোমার সমক্ষে অবনত। একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া সিংহের ন্যায় দাঁড়াও, দেখিবে জগৎ তোমার বশংবদ।"

প্রাচীনকাল থেকে ভারত যে বাহুবলে নয় জ্ঞানবলেই প্রাধান্য লাভ করে এসেছে সেই প্রসঙ্গে আশুতোষ বলেছেন, "ভারতবর্ষের স্মরণাতীত কাল হইতে জগতে যে প্রাধান্য, বাহুবল তাহার কারণ নহে, জ্ঞানবল তাহার কারণ। দুঃখিনী ভারতভূমির সে শিক্ষা-দীক্ষা ক্রমে মন্দীভূত হইতেছে,—মায়ের আমার অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। এখনও রোগের প্রতিকারের সময় আছে, বদ্ধপরিকর হইয়া আবার

ভারতভূমিকে সেই বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানললামে বিভূষিত করুন।...তখন আবার নবীন উষার বর্ণচ্ছটায় ভারত রঞ্জিত হইবে, অজ্ঞান-অবিদ্যার অবসাদ কাটিয়া যাইবে।"

শুধু গল্প, উপন্যাস নয়, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি যে সাহিত্যের সমৃদ্ধির অপরিহার্য অঙ্গ এ বিষয় আশুতোষ উপলব্ধি করে বলেছিলেন, "আমাদের সুন্দরী মাতৃভাষা কি উপায়ে সুন্দরীতমা হইতে পারে, তাহাও ভাবিতে হইবে। কেবল গীতিকাব্য, মহাকাব্য বা গল্পগুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট সৌধের চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, বার্তাশাস্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি—সর্বপ্রকার রত্নের সমাবেশ আবশ্যক। সর্ববিধ কলার বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিলসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা তাহাকে 'জাতীয় সাহিত্য' বলা যায় না।" শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আশুতোষ বলেছেন, "যে যে গুণ থাকিলে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতগণকে সেই সেই গুণে সম্পন্ন হইতে হইবে। দয়া, সমবেদনা, পরদুঃখকাতরতা, সত্যপ্রিয়তা, বিনীতভাব প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে হৃদয়কে সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার ফল ফলিয়াছে, বলা যাইতে পারে। অন্যথা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্যতাকেই শিক্ষার চরম ফল-প্রাপ্তি বলিতে পারি না।"

বাঙালীকে আশুতোষ উদাত্তকণ্ঠে ডাক দিয়ে বললেন, "একবার সাতকোটি বাঙালী সমস্বরে বঙ্গভারতীকে 'মা' বলিয়া ডাক,—দেখিবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সে ডাকে চমকিয়া উঠিবে। আকাশের গায়ে, সমুদ্রের বক্ষে, পর্বতের উত্তুঙ্গ শিখরে সে ডাকের সাড়া পৌছিবে। বঙ্গভারতী বিশ্বভারতীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন।" আশুতোষের প্রয়াস এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হয়েছে। বাংলা ভাষা আজ বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত।

আশুতোষের অসাধারণ মাতৃভক্তি ও নির্ভীকতার একটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করা যাক। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে লর্ড কার্জন কলকাতা মহানগরীর প্রতিনিধিরূপে আশুতোষকে বিলেত যাবার আমন্ত্রণ-লিপি পাঠান। কিন্তু বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে আশুতোষের মায়ের ঘোরতর আপত্তি থাকায় তিনি বড়লাট কার্জনের নিমন্ত্রণ রক্ষায় অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তখন বড়লাট বললেন—"আপনার মাতাকে যাইয়া বলুন যে, ভারত-সম্রাটের প্রতিনিধি, সপরিষদ গভর্নর-জেনারেল তাঁহাকে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। তখন আশুতোষ ভারতের সর্বপ্রধান রাজপুরুষের মুখের উপর বলেছিলেন, "আমার মাতা কি উত্তর দিবেন, তাহা আমি বলিতে পারি। তিনি বলিবেন—আশুতোষের জননী একথা স্বীকার করেন না যে, তাঁহার পুত্রকে তিনি

ছাড়া আর কাহারও আদেশ দেওয়ার অধিকার আছে।" তাঁর নির্ভীকতার জন্ম তাঁকে 'বাংলার বাঘ' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

আশুতোষের নৈতিক চরিত্র ছিল অত্যন্ত উন্নত। তিনি সহজ সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। বিচারপতি হিসাবে একমাত্র হাইকোর্টেই তিনি বিজাতীয় পোশাকে ভূষিত হতেন। অন্যথায় আমাদের অত্যন্ত সাধারণ দেশী পোশাক ধুতি জামাতেই তিনি সর্বত্র যাতায়াত করতেন। এমন কি স্যাড্‌লার কমিশনে যখন তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখনো তিনি ধুতি জামাতেই পরিশোভিত ছিলেন। দেশীয় পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ তাঁর কাছে অতি পবিত্র ছিল। ছাত্রদের তিনি ছিলেন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি তাদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। তাদের তিনি দেশের ভবিষ্যৎ আশা-স্থল বলে মনে করতেন। কখনো কখনো ছাত্রদের সস্নেহ উপদেশ দিয়ে তিনি বলতেন, "যদিও তোমরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া আছ, তথাপি ভারতের সমুন্নত চিন্তা, ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি এবং এদেশের আচার-ব্যবহারের মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, তাহার প্রতি বিরূপ হইও না। পাশ্চাত্ত্য প্রখর আলোতে অন্ধ হইয়া এতদ্দেশের যে অমূল্য সম্পদ তোমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছ, তৎপ্রতি উপেক্ষাশীল হইও না। তোমরা পাশ্চাত্ত্য জগতের যাহা কিছু ভাল, তৎপ্রতি শ্রদ্ধাশীল অবশ্যই হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের জাতীয়তা ত্যাগ করিও না। তোমরা খাঁটি ভারতীয় লোক, একথা সর্বদা স্বীকার করিতে দ্বিধা করিও না এবং পোশাক ও রুচির অভিমানের ক্ষুদ্রত্ব হইতে নিজদিগকে সর্বদা রক্ষা করিও। সর্বাপেক্ষা বড় কথা, তোমাদের দেশের ভাষা যত্নের সহিত অনুশীলন করিবে, কারণ দেশীয় ভাষার সাহায্যেই তোমরা এদেশের জন সাধারণের মন ছুঁইতে পারিবে এবং পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার রত্নরাজি তাহাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষের বিরাট কর্মশক্তির পরিচায়ক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বললে আশুতোষকে এবং আশুতোষের নাম করলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝায়। এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের দরবারে ভারতের গৌরব সমধিক বর্ধিত করেছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে পুরুষ-সিংহ আশুতোষের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অন্যান্যসাধারণ প্রতিভায়।

"আশুতোষ ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর মহাপণ্ডিত। নিজে গবেষণা করলে বিশ্বে অক্ষয় যশের অধিকারী হতে পারতেন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট কর্মক্ষেত্রে ব্যাপৃত থেকে জাতিগঠনে আত্মোৎসর্গ করায় তাহা আর কখনো সম্ভব হয়নি। নিজের গবেষণা হল না বটে; কিন্তু আজ যে বাঙালী জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়

মৌলিক গবেষণার দ্বারা নূতন নূতন আবিষ্কার করে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করছে, তার প্রেরণার ও প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল স্যার আশুতোষের অফুরন্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা।"

প্রখ্যাত সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ভাষায়, "অক্লান্ত কর্মী আশুতোষ, তেজস্বী মহাপণ্ডিত আশুতোষ, অশেষ কীর্তিমান আশুতোষের নানা অদ্ভূত কীর্তির কথা চিরদিনই লোকে নানা ছন্দে গাহিবে। কিন্তু বিশ্বের পণ্ডিত সমাজে নিজের চিরস্থায়ী যশের সম্ভাবনা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁর দেশবাসী সকল পণ্ডিতের সেই যশ অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ভিতর যে সুমহান সুকরুণ ত্যাগ ও আত্মবিলুপ্তি আছে এই ত্যাগের স্মৃতিই আমার চিত্তে তাঁর সকল মহীয়সী স্মৃতির শিরোমণি হইয়া থাকিবে। দধিচি আপনার অস্থি দিয়া দেবগণকে অজেয় করিয়া গিয়াছিলেন, স্যর আশুতোষ তাঁর প্রিয় জন্মভূমির অক্ষয় যশের জন্য আপনার পঞ্জরাস্থির চেয়ে অধিক প্রিয় বিশ্ব-বিজ্ঞান পরিষদে অক্ষয় যশের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। স্যর আশুতোষকে বিশ্বের বিজ্ঞান পরিষদের কেহ বেশী দিন স্মরণ করিবেন না, কিন্তু বাঙালীর অন্তর-মন্দিরে তাঁর এই ত্যাগ চিরদিন অক্ষয় প্রীতির এক মহা সৌধ গড়িয়া তুলিবে।"

সাহিত্যাচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

উনিশ শতকের শেষপাদে বাংলার নব জাগরণের পুণ্যলগ্নে যাঁরা নিজ নিজ জীবন সাধনার দ্বারা জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একজন অনন্যসাধারণ পুরুষ। শিক্ষার মান-উন্নয়ন ও বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি বাঙালী জাতির মনে আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন। ১৮৬৪ সালের ২০শে অগস্ট রামেন্দ্রসুন্দর মুর্শিদাবাদ জেলার জেমো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আবাল্য তিনি অত্যন্ত কৃতি ছাত্র ছিলেন। তাঁর জীবনে তাঁর পিতা গোবিন্দসুন্দরের প্রভাব অপরিসীম। তাঁর দেশপ্রেমের দীক্ষা হয়েছিল পিতা গোবিন্দসুন্দরের নিকটই। রামেন্দ্রসুন্দরের নিজের ভাষায়, "পিতৃদেব পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেন···সেই সঙ্গে স্বধর্মের প্রতি, স্বদেশের প্রতি ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগও সেই বয়সে পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল।" আমৃত্যু সমগ্র জীবনব্যাপী রামেন্দ্রসুন্দর পিতার প্রেরণা অনুভব করতেন। তাই তিনি অন্যত্র বলেছেন, "শৈশবেই আমি জননী জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলিয়া জানিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলাম। সে মন্ত্রে দীক্ষা সে বয়সে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি কোথা হইতে আজিও আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার দিব্য দৃষ্টি অতিক্রম করা আমার সাধ্য নহে। আমার শক্তি ছিল না, কিন্তু সেই দিব্য নেত্রের প্রেরণা ছিল; আমার জীবনে যদি কিছু সার্থকতা থাকে, তাহা সেই প্রেরণার ফল।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করেই রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এক বছর পরে তিনি ঐ কলেজে অধ্যক্ষ হন। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। তাঁর সহজ সরল জীবন ও জ্ঞানানুশীলন তৎকালীন ছাত্রসমাজ ও শিক্ষকমণ্ডলীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাঙালীর পরিচ্ছদ ধুতি, চাদরই তিনি পরিধান করতেন। জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর ছাত্র ও যুবসমাজ

যাতে জ্ঞানে ও চরিত্রে মহৎ হতে পারে সেদিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে, জাতি জ্ঞানবান ও চরিত্রবান না হলে জাতির মুক্তি আসা অসম্ভব। ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে এবং বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেও তিনি সম্পূর্ণ স্বদেশী ছিলেন। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদকের কথায়, "তাঁহার শিক্ষা ছিল বিদেশী, কিন্তু দীক্ষা ছিল স্বদেশী। বিদেশের জ্ঞানে বিজ্ঞানে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়াও রামেন্দ্রসুন্দর কখনও স্বাদেশিকতায় বঞ্চিত হন নাই। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিশেষত্ব।...ডিরোজিও-যুগের দেশহিতৈষণা, 'গণে'র কল্যাণ-কামনা, দেশহিতব্রতে অদম্য উৎসাহ রামেন্দ্রসুন্দরে পূর্ণভাবে বিকশিত হইলেও, সে যুগের কোনো অসংযম, কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার জীবন ও চরিত্র দূরে থাক, তাঁহার চিন্তা বা কোনো সংকল্পকেও স্পর্শ করিতে পারে নাই।...এক্ষেত্রে তিনি ভাবী শিক্ষিত বাঙালীর আদর্শ।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কারের জন্য যে 'স্যাডলার কমিশন' বসে, রামেন্দ্রসুন্দর তার সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। কমিশনের নিকট তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তা যেমন যুক্তিপূর্ণ তেমনি স্বদেশপ্রীতিতে ভরা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার যথেষ্ট উপযোগিতার কথা স্বীকার করেও তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "এই শিক্ষার নিকট আমরা বলি দিয়াছি আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী—বিসর্জন দিয়াছি আত্মসম্মান জ্ঞান—হারাইয়াছি আমাদের পরস্পরের প্রতি ভক্তি ও সহানুভূতি—বিনষ্ট করিয়াছি জীবনের গৌরব ও মহত্ত্ব। যাহা গিয়াছে তাহা পুনরুদ্ধার করিতে গেলে চাই সংযম, চাই সাধনা, চাই অকৃত্রিম দেশানুরাগ।" তিনি চেয়েছিলেন একদিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য এবং অপরদিকে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাধারার সমন্বয়। কমিশন তাঁর শিক্ষা-প্রস্তাবের অজস্র প্রশংসা করে কিছু কিছু শিক্ষাদর্শ গ্রহণও করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দরের দান অসামান্য। বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম অতি সহজ সরল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করে বিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। বাংলা ভাষায় রচিত এমন সুললিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি মাতৃভাষানুশীলনকারী যে-কোনো পাঠককে বিজ্ঞানানুশীলনে প্রভূত উৎসাহিত করে। তাঁর জিজ্ঞাসা, প্রকৃতি, জগৎকথা, বিচিত্র জগৎ প্রভৃতি বিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধগুলি বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বিজ্ঞান ছাড়াও আরও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর রচিত অসংখ্য প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক ছয়টি বৃহৎখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের অগাধ ভক্তি। তাঁরই আপ্রাণ চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে যুগে বাংলায় কথা

বলা শিক্ষিত সমাজের পক্ষে যখন অগৌরবের বিষয় ছিল, তখনই রামেন্দ্রসুন্দর ক্লাসের ছাত্রদের বাংলাতেই পড়াতেন। এমনকি বিজ্ঞানের মতো দুরূহ বিষয়ও বাংলায় বোঝাতেন। অথচ আজও বহু শিক্ষক ইংরেজীতেই বক্তৃতা দেন, এমন কি ক্লাসের বাইরে ছাত্রদের সঙ্গে ইংরেজীতেই কথাবার্তা বলেন।

মাতৃভাষার উপাসক, সাহিত্য সাধক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের প্রধান কীর্তি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রসার ও উন্নয়ন। পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায়, "রামেন্দ্র দেশহিতের জন্য তিনটি অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। একটি সাহিত্য-পরিষৎ, একটি সাহিত্য সম্মেলন, আর একটি সাহিত্য পরিষদের মন্দির।" প্রথমে সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব কোনো বাড়ী ছিল না। ভাড়া বাড়ীতেই পরিষদের কাজ চলত। রামেন্দ্রসুন্দরের একান্ত চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিষদের জায়গা সংগৃহীত ও বাড়ী তৈরী হয়। তাঁরই প্রাণপাত পরিশ্রমে পরিষদের সমৃদ্ধিশালী গ্রন্থাগার ও পুরাবস্তু সমন্বিত একটি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে সাহিত্য পরিষৎ বর্তমান অবস্থায় আসত কিনা সন্দেহ। সাহিত্য সেবা এবং সাহিত্য পরিষৎ সংগঠনের মূলে ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের প্রগাঢ় দেশপ্রীতি। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে জাতিকে সাহিত্য ও ইতিহাস সচেতন করতে পারলেই সমগ্র জাতিকে জাতীয়তার নব মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করা সহজ হবে। তাই রাজনীতির কোলাহলের মধ্যে না গিয়ে তিনি নীরবে নিরালায় সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর সাহিত্য পরিষৎকে তিনি জাতির মাতৃমন্দিরে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাই পরিষৎ মন্দিরের উদ্বোধন সভায় তিনি বলেছিলেন, "এই মন্দিরকেই আমি মাতৃমন্দির নাম দিতে পারি ও এ মন্দির মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারকে আমি মাতৃ-প্রতিমা নাম দিতে পারি।" এবং পরিষদের নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন, "সাহিত্য পরিষদের নূতন মন্দির বঙ্গের সাহিত্য সেবকগণের সম্মিলনের কেন্দ্র-স্বরূপ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা এই কেন্দ্রস্থলে সমবেত হইয়া সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আলাপ ও পরামর্শ করিবার ও পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবেন। জ্ঞানান্বেষিগণ এই মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া নব নব তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত রহিবেন এবং দেশমধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা স্বদেশকে উন্নতিমার্গে প্রেরণ করিবেন। অতীতকালের মহাপুরুষগণের স্মরণ-নিদর্শন সগৌরবে বহন করিয়া এই মন্দির বঙ্গবাসী মাত্রের তীর্থস্বরূপে পরিণত হইবে। অনাগত ভবিষ্যতে পরিষদের এই সকল ও অন্যান্য উচ্চ আশা যে পূর্ণ হইবে, পরিষদ এখন তাহার স্বপ্ন দেখিতেছেন। বাংলা সাহিত্য বর্তমানকালে বাঙালীর একমাত্র গৌরবের বস্তু। এই পতিত

জাতির যদি উদ্ধার-সাধন হয়, তাহা সাহিত্যের বলেই হইবে, একথা ধ্রুব সত্য।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গঠনে রামেন্দ্রসুন্দরের অসামান্য অবদানের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেছেন, "রামেন্দ্রসুন্দরের বুকের রক্তে পরিষদ-মন্দিরের ইঁটের পর ইঁট গাথা হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যে পরিষদে আত্মদান, ইহার মূলেও তাঁহার দেশাত্মবোধ। দেশাত্মবোধের সাধনার জন্যই রামেন্দ্রসুন্দর এই দেশমাতৃকার মন্দির গড়িয়াছিলেন। কলেজে, পরিষদে, সাহিত্যে—জীবনের সকল ক্ষেত্রে মাতৃপূজাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

…বাংলার প্রাচীন সাহিত্য, বাংলার পুরাতত্ত্ব, বাংলার ইতিহাস, বাংলার পুরাবস্তু, বাংলার অবদান,—এককথায় বাঙালীর প্রাণ তাঁহার ধ্যানের বস্তু ছিল। জাতীয়তার এমন একনিষ্ঠ, আত্মমগ্ন, প্রচ্ছন্ন উপাসক আমি জীবনে অতি অল্প দেখিয়াছি।"

সাহিত্য পরিষদের সেবক হিসাবে কাজ করতেই রামেন্দ্রসুন্দর অধিক পছন্দ করতেন; কখনো কোনো উচ্চ পদ লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন না। ১৩২১ সালে পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলে তিনি লিখেছিলেন, "আমি চিরজীবন পরিষদের সেবকের কার্য করিয়া যাইব, ইহাই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা—পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ আমার কাজ নহে। কার্য-নির্বাহক-সমিতি আমার এই চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবে নাকি?" এমন নির্লোভ, নিঃস্বার্থ নিরহঙ্কার সাহিত্য-সেবক সাধারণত দেখা যায় না।

রামেন্দ্রসুন্দরের বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। পরিষদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন কবিবর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তিনি উদাত্ত ভাষায় বলেছিলেন, "হে মিত্র, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গ সাহিত্যের মধ্য গগনে আরোহণ করিয়াছ—আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।…তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নব-প্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর আহ্বান করিতেছি।

সাহিত্য পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয় পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ

করিয়াছ। বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ।"

সেদিনের এই অবৈজ্ঞানিক দেশে বিজ্ঞানের বিষয় যেরূপ প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য ভাষায় রামেন্দ্রসুন্দর প্রকাশ করে গেছেন, তা আজও বাংলা ভাষার আদর্শস্থানীয়। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি নিছক তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ নয়; সেগুলির সাহিত্যিক এবং দার্শনিক মূল্যও যথেষ্ট। তাঁর 'আকাশ-তরঙ্গ', 'নিয়মের রাজত্ব' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি। সেদিন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মশাই ঠিকই বলেছিলেন, "দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা—মানব-চিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্রসঙ্গমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছে।" এই জন্যই তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি এমন সরস ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথ সুগম করার জন্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর রাসায়নিক পরিভাষা, বৈদ্যক পরিভাষা এবং শরীর-বিজ্ঞান পরিভাষাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। তাছাড়া, পরে আরও পরিভাষা সৃষ্টির পথ-নির্দেশকারীরূপে তিনি পরিভাষা বিষয়ক চারটি প্রবন্ধ লিখে গিয়েছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বাংলা ভাষায় আজও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অত্যন্ত দুর্বল। বাংলা ভাষায় পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "পাশ্চাত্ত্য জাতির উপার্জিত জ্ঞানরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাদিগকে পাশ্চাত্ত্য ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে। কিন্তু ঐ বিজাতীয় ভাষা কখনো আমাদের আপনার ভাষা হইবে না, কখনো আমরা অন্তরের কথা ঐ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। যদি আমাদের স্বজাতিকে ও আমাদের আত্মীয়বর্গকে পাশ্চাত্ত্য জাতির উপার্জিত জ্ঞান-সম্পত্তির অধিকারী করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভাষাকে এইরূপে সংস্কৃত ও মার্জিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে সেই মাতৃভাষা এই জ্ঞানবিস্তার কর্মের ও জ্ঞান প্রচার কর্মের যোগ্য হয়। এই বঙ্গ-ভাষারই অঙ্গে নূতন রক্ত সঞ্চালিত করিয়া তাহাকে পুষ্ট সমর্থ পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। এই কার্য সম্পাদন এখন কৃতি বাঙালীর অন্যতম কার্য।"

তাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সপ্তম অধিবেশনের বিজ্ঞান শাখায় সভাপতির অভিভাষণে রামেন্দ্রসুন্দর বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের মাতৃভাষার মাধ্যমে গ্রন্থ-প্রণয়নের অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন:

"আপনারা কৃতবিদ্য, আপনারা জ্ঞানী, আপনারা মনস্বী, আপনারা যশস্বী, আপনাদের চেষ্টায় বঙ্গের নব জাগরণ আরব্ধ হইয়াছে। জননী বঙ্গভূমির কীর্তিধ্বজা আপনাদের

হস্তে ধৃত হইয়াছে। আপনাদের নিজের যশোরশ্মি দেশে-বিদেশে ব্যাপ্ত হইতেছে। কিন্তু বঙ্গজননী আপনাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, বঙ্গভাষা আপনাদের স্নেহ প্রার্থনা করিতেছে, বঙ্গ সাহিত্য আপনাদের করুণাপ্রার্থী, বঙ্গের জনসাধারণ আপনাদিগের অন্তেবাসী। আপনাদের সম্মুখে এই বিশাল কর্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে, এক্ষণে আপনারা অবতরণ করুন।"

রামেন্দ্রসুন্দর মাতৃভাষার অবমাননা কোনোক্রমেই সহ্য করতে পারতেন না। আজীবন তিনি বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কয়েকবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করার কোনো সুযোগ না থাকায় তিনি সেই সব নিমন্ত্রণ বার বার প্রত্যাখ্যান করেন। পরে মহামহোপাধ্যায় দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী যখন ভাইস্ চ্যান্সেলার হন, তখন তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে বাংলা বক্তৃতা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর সেই পঠিত প্রবন্ধগুলি পরে "যজ্ঞ কথা" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর ইংরেজী ভাষায় অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর গবেষণা ও চিন্তামূলক বিষয়গুলি ইংরেজীতে লিখে দেশে বিদেশে যথেষ্ট যশঃ ও খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ, স্বদেশপ্রেমিক রামেন্দ্রসুন্দরের মাতৃসমা মাতৃভাষার উন্নতি ছাড়া আর কিছুই কাম্য ছিল না। বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য নিজেই শুধু রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখে ক্ষান্ত ছিলেন না। ছাত্র, অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানবিদ্‌রা যাতে মাতৃভাষার চর্চা করেন, সেজন্য তিনি প্রচুর উৎসাহ দিতেন। ভূবিদ্যা, অন্তরীক্ষবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রাসায়নিক বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র প্রভৃতিতে যাতে সুচিন্তিত মৌলিক প্রবন্ধাদি রচিত হয়, সেজন্য বৈজ্ঞানিকদের অনুরোধ করতেন। তাঁর এই আবেদন নিষ্ফল যায় নি। অনেকেই তাঁর উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করেছেন। তাঁর ছাত্রদের তিনি প্রায়ই মাতৃভাষার অনুশীলনের উপদেশ দিতেন, এবং সাহিত্য পরিষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে বলতেন। তিনি বলতেন, "উহা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) আমাদিগের মাতৃমন্দির, আমরা ওখানে বঙ্গবাণীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছি—যাহার যতটুকু শক্তি, মার পূজার দ্রব্যসম্ভার লইয়া উপস্থিত হও।"

মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত অভিভাষণে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন, "যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবী, আমরাও আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব।"

তারপর তিনি সর্বশ্রেণীর লেখক গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "সাহিত্য সেবার মধ্যে কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞান প্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তিপথের উপদেষ্টা, কেহ কর্মমার্গের প্রদর্শক। কিন্তু আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্য-সেবীর এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না। যিনি যে কামনা করিয়া কর্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্মফল অর্পণ করিতে হইবে। যিনি যে ফুল আহরণ করিবেন, সে সকল ফুল সেই রাঙা চরণের রক্ত জবার সহিত মিশাইতে হইবে।"

পূর্বেই বলেছি রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যপ্রীতির মূলে ছিল তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রীতি। ভারতের আকাশ, বাতাস, আলো, মাটি, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন সর্বোপরি নরনারীকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন। দেশের গৌরবে তিনি গৌরববোধ করতেন এবং অধঃপতনে বেদনা পেতেন। দেশের গুণীজনের সম্বর্ধনায় তিনি ছিলেন অগ্রণী। এদেশের কোনো গুণীব্যক্তি পাশ্চাত্ত্য জগৎ কর্তৃক স্বকৃতি না পেলে তাঁর সমাদর হত না। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথের এদেশে বিশেষ সমাদর হয় নি। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি পাশ্চাত্ত্য জগৎ কর্তৃক স্বীকৃত পাওয়ার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথকে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা জানিয়ে জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর স্বদেশানুরাগের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন যা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন :

"মূলে স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকিলে স্বদেশের উন্নতিচেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম; এবং যে জাতির আপনার পুরাতন কাহিনী জানিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহার স্বদেশানুরাগের আস্ফালন সর্বতোভাবে উপহাস্য। স্বদেশের উন্নতির জন্য এ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্প-শিক্ষার প্রচার, বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার, শিল্পসমিতি স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উদ্যম দেখা যাইতেছে; কিন্তু সকল উদ্যমই ব্যর্থ ও বন্ধ্যা হয়। তাহার মূল কারণ এক। আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশ-প্রিয়তার স্পর্ধা না করে; আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন না করে।"

সর্বক্ষণ সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত থাকলেও জাতির সঙ্কটে জাতীয় আন্দোলনের সময় তিনি নিশ্চেষ্ট থাকতে পারতেন না। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রামেন্দ্রসুন্দর পরিকল্পনা, পরামর্শাদি দিয়ে জাতীয় জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন 'রাখীবন্ধন' উৎসব উদ্বোধনের দ্বারা উভয় বঙ্গের মিলনসেতু তৈরী করেন, রামেন্দ্রসুন্দর সেইরূপ 'অরন্ধন' পালনের দ্বারা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

প্রকাশের নির্দেশ দেন। বাংলার নারীসমাজকেও জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করাবার জন্য তিনি এই সময় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করেছিলেন। অপূর্ব জাতীয় ভাবোদ্দীপক ভাষায় রচিত এই ব্রতকথা অরন্ধনের দিন ঘরে ঘরে পঠিত হত।

"বন্দে মাতরম্! বাংলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হয়ে মা পূর্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলাদেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি হল। লোকে পরমসুখে বাস করতে লাগল।"

'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র এই কয়েকটি পঙক্তির মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর স্বাধীন বাংলার সুখের দিনগুলির বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর কালের কুটিল গতিতে সেই সুখী বাংলাদেশ পরাধীন হয়ে দারিদ্র্যের নিদারুণ নিষ্পেষণে জর্জরিত হতে লাগল। অবশেষে ভারতের বিদেশী ব্রিটিশ শাসক বঙ্গদেশকে দ্বিধাবিভক্ত করতে চাইলে সারা দেশে বিক্ষোভের ঝড় উঠল। রামেন্দ্রসুন্দর বাংলার গৃহলক্ষ্মীদের মুখ দিয়ে ব্রত গ্রহণ করালেন:

"মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। ভিক্ষার ধন হাতে তুলবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাঙলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।"

ভাষার সরসতা ও সরলতায় এবং দেশপ্রেমের গভীরতায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। 'স্বদেশী আন্দোলনে' ইহা স্বদেশানুরাগের অফুরন্ত উৎস ছিল।

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলাদেশে নবজাগরণ সুরু হয়। এই নবজাগরণ থেকেই শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙালীর মনে মাতৃভূমির বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠে। এজন্য বাঙালীর মধ্যে যে অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য দেখা যায়, তাতে এদেশের ব্রিটিশ শাসকসম্প্রদায় অত্যন্ত ভীত ও চকিত হয়ে উঠে। তারা তখন বাঙালীর এই জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করার জন্য বাংলাদেশকে দ্বিধা-বিভক্ত করতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে বিজাতি ব্রিটিশ শাসকের এই বর্বর অভিসন্ধির বিরুদ্ধে সমগ্র বঙ্গদেশ গর্জে উঠল। আরম্ভ হল বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন। বিপ্লবের পদধ্বনি উত্থিত হল। স্থির হল বিলিতি দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করা হবে। বয়কটের মধ্যে কাপড়ই হল প্রধান। কিন্তু চরখায় প্রস্তুত দেশী মোটা কাপড় পরতে অনেকেরই দ্বিধা দেখা গেল। ঠিক সময় দেশবাসীকে তার পবিত্র সংকল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের মনে আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনার জন্য কান্তকবি রজনীকান্ত লেখনী ধারণ করে লিখলেন :

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই ;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই ;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দ্বারে ভিক্ষা চাই।

ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
তবু, তাই বে'চে কাচ, সাবান, মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা কর্‌ব ভাই ;
পরের জিনিস কিন্‌ব না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।"

এই কবিতাটির নাম 'সংকল্প'। বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও স্বদেশী বস্ত্র তা যতই মোটা হউক না কেন, তা পরিধানের জন্য স্বদেশ-প্রেমিক কবি রজনীকান্ত দেশবাসীকে সংকল্পবদ্ধ হতে আহ্বান জানালেন। কবিতাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালীর হৃদয় জয় করে নিল। এই সঙ্গীতটি দেশবাসীর মনে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। এই একটিমাত্র গানেই তিনি শিক্ষিত অশিক্ষিত আপামর বাঙালী জনসাধারণের নিকট অসামান্যভাবে পরিচিত হয়ে উঠলেন। গ্রামে, গ্রামে, শহরে, শহরে বাংলাদেশের সর্বত্র এই অতি সহজ, সরল ও সুমধুর সুর-বিশিষ্ট গানটি প্রচারিত হয়েছিল। তখন প্রায় প্রত্যেক বাঙালীর মুখে এই গানটি শোনা যেত। তৎকালে বহু খ্যাতনামা কবি বহু স্বদেশী সংগীত রচনা করেছিলেন। কিন্তু অন্য কোনো স্বদেশী সংগীতই এত জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। আজও কবিতাটি প্রবন্ধ কাব্যের মতো হয়ে রয়েছে বাঙালীর মনে। এই গানটি রচনার একটি ইতিহাস আছে। সে বিষয়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক খ্যাতনামা সাহিত্যিক জলধর সেন লিখেছেন, "একদিন মধ্যাহ্নে একটার সময় আমি 'বসুমতী' অফিসে বসিয়া আছি, এমন সময় রজনী এবং রাজসাহীর খ্যাতনামা আমার পরম শ্রদ্ধেয় হরকুমার সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার সরকার অফিসে আসিয়া উপস্থিত। রজনী সেই দিনই দার্জিলিং মেলে বেলা এগারটার সময় কলিকাতায় পৌছিয়া অক্ষয়কুমারের মেসে উঠিয়াছিল। মেসের ছেলেরা তখন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, একটা গান বাঁধিয়া দিতে হইবে। গানের নামে রজনী পাগল। তখনই গান লিখিতে বসিয়াছে। গানের একটা অন্তরা লিখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই গানের জন্য উৎসুক। সে বলিল, 'এই তো গান হইয়াছে, চল জল'দার ওখানে যাই। একদিকে গান কম্পোজ হউক, আর একদিকে লেখা হউক। এইজন্য তাহারা সেই বেলা একটার সময় আসিয়া উপস্থিত। অক্ষ কুমার আমাকে গানের কথা বলিলে—রজনী গানটি বাহির করিল। আমি বলিলাম আর

কৈ রজনী ? সে বলিল, 'এইটুকু কম্পোজ করিতে দাও, ইহারই মধ্যে বাকিটুকু হইয়া যাইবে।' সত্য সত্যই কম্পোজ আরম্ভ করিতে না করিতেই গান শেষ হইয়া গেল। আমরা দুজনে তখন সুর দিলাম। গান ছাপা আরম্ভ হইল। রজনী ও অক্ষয় ৩০।৪০ খানা গানের কাগজ লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর তাহাদের দলের অন্যান্য ছেলেরা আসিয়া ক্রমে (ছাপা) কাগজ লইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় আমি সুকবি শ্রীযুত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীর উপরের বারান্দায় প্রমথবাবু ও আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত উপবিষ্ট আছি, এমন সময় দূরে গানের শব্দ শুনিতে পাইলাম। গানের দল ক্রমে নিকটবর্তী হইল। তখন আমরা শুনিলাম, ছেলেরা গাহিতেছে—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।' এই রজনীকান্তের সেই গান—আমি যাহা কয়েক ঘণ্টা আগে ছাপিয়া দিয়াছিলাম। গান শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিয়াছিল ; তাহার পর ঘাটে, মাঠে পথে, নৌকায়, দেশ-বিদেশে কত জনের মুখে শুনিয়াছি,—'মায়ের দেওয়া…'।

রজনীকান্তের এই সংগীতটি সেই সময়ে বাংলার বহু মনীষীকেও বিচলিত ও উদ্দীপিত করেছিল। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই গান শুনে লিখেছিলেন, "গান শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়'ছিল।"

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ভাষায়, "কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সঙ্গীত-সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে সকল গান ক্ষুদ্র-প্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুল-বাগানে প্রাতঃসূর্যের মৃদু কিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যে গান দৈববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মত সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে,—নিয়তির বিধান আছে। সে অশ্রু পুরুষের অশ্রু—বিলাসিনীর নহে। সে আদেশ যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাকেই পাগল হইতে হইয়াছে। স্বদেশী যুগের বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোন গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য ও সফলতায় এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে নির্দেশ করি।"

বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখলেন, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" এই উন্মাদক ধ্বনি প্রথম যেদিন আমার কানে প্রবেশ করিল, সেই দিন হইতেই গীত রচয়িতার সঙ্গে পরিচিত হইবার ইচ্ছা মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল।"

রজনীকান্ত তাঁর রোজনামচায় ১৩১৭ সালের ১৮ই বৈশাখ তারিখে লিখলেন, "স্কুলের

ছেলেরা আমাকে বড় ভালবাসে। আমি 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে'র কবি বলে তারা আমাকে ভালবাসে।" ২১শে বৈশাখ ব্রজেন্দ্রনাথ বক্সীকে তিনি লিখলেন, "আমার মনে পড়ে যে দিন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান লিখে দিলাম, আর এই কলিকাতার ছেলেরা আমাকে আগে করে (শোভাযাত্রা) বের করে এই গান গাইতে গাইতে গেল, সে দিনের কথা মনে করে আমার আজও চক্ষে জল আসে।" গানটির সার্বজনীন সমাদর দেখে বলা যেতে পারে যে ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'ই ছিল একটি মাত্র জাতীয় মন্ত্র।—স্বাদেশিকতার সংকল্প বাক্য।

রজনীকান্ত সেন ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের ২৬শে জুলাই পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থা থেকেই রজনীকান্তের কবিতা ও সঙ্গীতের প্রতি অসামান্য আকর্ষণ ছিল। মাত্র চার বছর বয়সেই তিনি এমন সুন্দর আবৃত্তি করতে ও গান গাইতে পারতেন যে সবাই বিস্মিত হতেন। যে কোনো বিষয় একবার মাত্র শুনেই তিনি হুবহু আবৃত্তি করতে পারতেন। ছাত্রজীবনেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। ছাত্রজীবনে একবার কোনো গান শুনলেই তার সুর আয়ত্ব করে গাইতে পারতেন। পরে অপরের রচিত গান গাইতে তাঁর ভাল লাগত না। তাই তিনি গাইবার জন্য নিজেই গান রচনা করতেন। বি. এল. পাস করে তিনি রাজসাহীতে ওকালতি করতে আরম্ভ করেন। আইন ব্যবসায় গ্রহণ করলেও সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চা তাঁর অব্যাহত ছিল। গান গেয়ে ও গান রচনা করে তিনি রাজসাহীতে "কলকণ্ঠ কোকিল" নামে পরিচিত হয়েছিলেন। রাজসাহীর যে কোনো সভাসমিতিতে রজনীকান্তের গান ছাড়া চলত না। এর ফলে তিনি বহু গান রচনা করেছিলেন। তখনকার কোনো এক মহাশয়ের মতে, "ব্রজে যেমন কানু ছাড়া গীত নাই, তেমনি রজনীকান্ত ছাড়া রাজসাহীর আনন্দোৎসব পূর্ণ হইত না।" আইন ব্যবসায় বেশী দিন রজনীকান্তের ভাল লাগল না। তাই তিনি একবার অত্যন্ত দুঃখ করে বলেছিলেন, "আমি আইন ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।" কারণ, তিনি প্রচলিত ওকালতি ব্যবসায়কে বিবেকহীন সমাজবিধ্বংসী কাজ বলে মনে করতেন। তাঁর রচিত 'জুনিয়র উকিল', 'সরকারী ওকালতির আকর্ষণ', 'কথার মূল্য' প্রভৃতি নানা ব্যঙ্গ ও হাস্য রসিকতামূলক রচনার মধ্য দিয়ে এই বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রোজনামচায় একটা গল্প আছে—"একটা রাখাল দু'টো গরু নিয়ে যাচ্ছিল—তার

একটা খুব মোটা, আর একটা রোগা। একজন উকিল সেই পথে যান। তিনি রাখালকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর ও গরুটা অত মোটা কেন, আর এটা অত হালকা কেন, এটাকে খেতে দিস না নাকি," রাখাল উকিলকে চিনত; বল্লে—"আজ্ঞে না। মোটাটা উকিল, আর সরুটা মক্কেল,—রাগ করবেন না।"

ছাত্রাবস্থা থেকেই রজনীকান্ত পল্লীর উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ছুটির সময় তিনি নিজ গ্রাম ভাঙাবাড়ী গিয়ে আহার ও পাঠের সময় ছাড়া বাকি সমস্ত সময় গ্রামের উন্নতির জন্য কাজ করতেন। মাতৃভূমির দুর্দশায় রজনীকান্তের হৃদয় কাঁদত। তিনি বহু স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা ও গান লিখেছিলেন। এই সব গানের অধিকাংশই তাঁর "বাণী" গ্রন্থে বিবৃত। 'জন্মভূমি' কবিতায় কবি গাইলেন :

জয় জয় জন্মভূমি জননি!
যাঁর, স্তন্য সুধাময় শোণিত ধমনী;
কীর্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ এই সুবিপুল ধরণী!

কবি দেশবাসীকে 'জন্মভূমি'র দুর্দশা দূর করার জন্য প্রাণোৎসর্গের নির্দেশ দিলেন :

জননী-তুল্য তব কে মর-জগতে?
কোটি কণ্ঠে কহ, "জয় মা! বরদে।"
দীর্ণ বক্ষ হ'তে তপ্ত রক্ত তুলি'
দেহ পদে, তবে ধন্য গণি?

অতীতে ভারতবর্ষ সর্ববিষয়ে উন্নত ছিল। কিন্তু তার বর্তমান দুরবস্থায় কবি আক্ষেপ করে বলেছেন :

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ?

শুধু নিরাশার কথাই কবি দেশবাসীকে শোনান নি, তিনি তাদের আশার কথাও শুনিয়েছেন :

"ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব গগনে,
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি, ডাকিছে
সুপ্তি-মগনে;

নিদ্রালস নয়নে, এখনও রবে কি শয়নে?
জাগাও বিশ্ব পুলক-পরশে,
বক্ষে তরুণ ভরসা।"

তারপর দেশপ্রেমিক কবি দেশমাতৃকার 'উদ্বোধন' সঙ্গীত গাইলেন:

"ঐ অভ্রভেদি-ধবল শৃঙ্গে ফুটায়ে পদ্মরাগ,—
তাতে চরণযুগল রাখ।
শুভ্র সুষমা চাহি না—ভীম ভৈরব-রূপে জাগ,
অঙ্গে বিভূতি মাখ, ভৈরব রবে ডাক্,
ঐ হিমগিরি ফেটে যাক্।"

কবি বহু দিন থেকেই জাতীয়তার গান গেয়ে আসছিলেন। যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সুরু হল, যখন বাংলা দেশ জেগে উঠল তখনো তার মধ্যে যেটুকু দ্বিধা ছিল তা নির্ভয়ে কাটিয়ে উঠবার জন্য কবি "মাভৈঃ" মন্ত্র উচ্চারণ করলেন:

"আর, কিসের শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা,
প্রেমের গঙ্গা বো'ক্;
মায়েরি রাজ্যে, মায়েরি কার্যে,
ফুটেছে আজ যে চোখ্।

তারপর কবি আশায় উদ্দীপনায় স্বদেশবাসীকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্য আহ্বান জানালেন:

"তোরা আয় রে ছুটে আয়,
ঘুমের মা আজ জে'গে উঠে ছেলে দেখতে চায়।
সরা' ফুল বেলের পাতা, নোয়া' সাতকোটি মাথা,
প্রাণের ভক্তি, দেহের শক্তি,
ঢাল্‌রে মায়ের পায়।"

শতাব্দীর অবসাদ, দৈন্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সমগ্র দেশ পূর্ণোদ্যমে জেগে উঠেছে। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে হতাশা ও অবিশ্বাস এসে সংগ্রামীদের পিছু টানছে। কবি তাদের অভয়মন্ত্রে অনুপ্রাণিত ক'রে বলছেন:

"আর কি ভাবিস্ মাঝি বসে?
এই বাতাসে পা'ল তুলে দিয়ে,
হাল ধরে থাক্ ক'সে।

এই হাওয়া পড়ে গেলে,
স্রোতে যে ভাই নেবে ঠেলে,
কূল পাবিনে, ভেসে যাবি,
মরবি রে মনের আপশোষে।”

স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে দেশবাসীকে দেশী জিনিস ব্যবহারের জন্য অনুপ্রাণিত করে কবি লিখলেন :

“তাই ভালো, মোদের
মায়ের ঘরের শুধু ভাত ;
মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব,
মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান ;
মোটা হোক্, সে সোনা মোদের
মায়ের ক্ষেতের ধান !
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান !

পূর্ববঙ্গে ঋষি বঙ্কিম বিরচিত ‘বন্দেমাতরম্’ সঙ্গীতটি গাওয়া বে-আইনী ঘোষিত হলে, রজনীকান্ত এই অন্যায় আদেশের প্রতিবাদে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে গাইলেন ;

“মা ব’লে ভাই ডাক্‌লে মাকে,
ধরবে টিপে’গলা ;
তবে কি ভাই বাংলা হ’তে
উঠবে রে ‘মা’ বলা ?
… … …
—মায়ে কি আর ‘মা’ ডাক ছাড়্‌তে পারি ?
হাজার মার, ‘মা’ বলা ভাই কেমন ক’রে ছাড়ি ?”

রজনীকান্তের “কেমন বিচার কচ্ছে গোরা”, ফুলার কল্লে হুকুম ভারি” প্রভৃতি গান পূর্ব-বাংলায় অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল।

নানা ব্যঙ্গ ও হাসির কবিতার মধ্য দিয়ে কবি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে তীব্র কষাঘাত করে তার জাতীয় চেতনা ও মনুষ্যত্ব বোধ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। ‘ঔদরিক’, ‘বরের দর’, ‘বেহায়া বেয়াই’, ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ প্রভৃতিতে তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে।

রজনীকান্ত অত্যন্ত সহজ, সরল, আনড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তাঁর ন্যায় এমন মনে-প্রাণে দেশপ্রেমিক খুব কম দেখা যায়। দেশের দুর্দশার কথা ভেবে তিনি অত্যন্ত বেদনাবোধ করতেন। দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমারকে কবি তাঁর 'অমৃত' নামক কবিতার বই উপহার দিবার সময় লিখেছিলেন:

"ধর দীন উপহার; এই মোর শেষ;
কুমার! করুণানিধে! দে'খো র'ল দেশ।"

বিদ্রোহিনী মহীয়সী
ভগিনী নিবেদিতা

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতায় আকৃষ্ট হয়ে বহু বিদেশী জ্ঞানী গুণী মনীষী ভারতে এসেছেন এবং অবশেষে ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে তার সেবায় ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আয়ার্ল্যাণ্ড-দুহিতা মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল এরূপ একজন বিদুষী মহিলা যিনি বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দের মুখে ভারত-কথা শুনে ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি ভারতে পদার্পণ করেন। সভ্যতার লীলাভূমি এই ভারতবর্ষকে তিনি মাতৃভূমিরূপে বরণ করে নেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের নিকট দীক্ষালাভান্তে ভারতকন্যারূপে তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা। ভারতের এক চরম দুর্গতির দিনে বিদেশিনী এই ভগিনী ভারতে এসেছিলেন এবং পরম শ্রদ্ধায় বরণীয় এই মাতৃভূমির মুক্তির উদগ্র কামনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে যেরূপ গভীরভাবে ভারতকে ভাল বেসেছিলেন, অন্য কোনো বিদেশীর কথা দূরে থাক, খুব কম ভারত সন্তানই স্বদেশকে এরূপ ভালবেসেছেন। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের এক ক্যাথলিক পরিবারে জন্ম হয় কুমারী মার্গারেটের। আবাল্য ধর্মপ্রবণ হলেও তিনি প্রচলিত খৃস্টধর্মের সমর্থক ছিলেন না। চার্চের কঠোরতা, বিধিনিষেধ, পরধর্মের প্রতি ঘৃণা ও অনুদারতা তাঁর মনকে ব্যথিত করত। প্রথম থেকেই তিনি সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার বিরোধী ছিলেন। ক্রমে খৃস্টধর্মের প্রতি তাঁর সংশয় জন্মে। তিনি গির্জায় যাওয়া প্রায় বন্ধ করেন। কিন্তু সত্যের সন্ধানে তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠে। গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তার মধ্য দিয়ে তাঁর সময় কাটতে লাগল। হঠাৎ একদিন এড্‌ইন আর্নল্ডের গৌতম বুদ্ধের কাব্য জীবনী 'Light of Asia' তাঁর হাতে এল। এটি পড়ে তিনি বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। বুদ্ধ-বাণী খৃস্ট-বাণী অপেক্ষা তাঁর নিকট মহত্তর অনুভূত হল। জীবনের নানা দ্বন্দ্ব সংশয়ের এই সন্ধিক্ষণে লণ্ডনে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্য লাভ করলেন।

স্বামীজীর তেজোদীপ্ত বেদান্ত ভাষ্য তাঁকে গভীরভাবে উদ্‌বুদ্ধ করে। তখন তিনি বেদান্ত ও বিবেকানন্দের জন্মভূমি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ক্রমে ভারতবর্ষ হয়ে উঠল তাঁর অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত দেশ। এমন সময় একদিন ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বললেন যে তিনি ভারতে নারীজাতির উন্নতির জন্য কাজ সুরু করতে চান। মার্গারেট যদি এ বিষয়ে তাঁকে সহায়তা করেন ভাল হয়। গুরুর আহ্বানে মার্গারেটের জীবনের মোড় সম্পূর্ণ বদলে গেল। তিনি ভারতে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তখন থেকেই তিনি ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে ধারণা করতে লাগলেন। ভারতে আসার আকুলতা দেখে স্বামীজী মার্গারেটকে স্বাগত জানিয়ে পত্র লিখলেন : "ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারী সমাজের জন্য, পুরুষ অপেক্ষা নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী নারীর জন্মদান করিতে পারিতেছে না। তাই অন্য জাতি হইতে তাহাকে ধার করিতে হইবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করিয়াছে।"

অবশেষে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল বাংলার বন্দর কলকাতায় পদার্পণ করলেন। বিবেকানন্দ তাঁকে দীক্ষা প্রদান করে তাঁর নূতন নামকরণ করলেন 'নিবেদিতা'। মার্গারেটের জন্মান্তর ঘটল। এখন থেকে তিনি হলেন বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভারত-কন্যা। বিবেকানন্দ কর্তৃক মার্গারেটের 'নিবেদিতা' নাম সর্বাংশে সার্থক হয়েছিল। কুমারী মার্গারেট সত্যই ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নিজেকে নিবেদিতা করে গুরুদত্ত নাম সফল করেছিলেন।

দীক্ষানুষ্ঠান উপলক্ষে নিবেদিতাকে উদ্দেশ্য করে স্বামীজী একটি ইংরেজী কবিতা রচনা করেছিলেন। তার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :

"মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়,
দখিণের সমীরণে যে মাধুরী বয়,
বীর্যময় পুণ্যকান্তি যে অনল জ্বলে
অবন্ধন শিখা মেলি তার বেদীতলে :
এসব তোমারই হ'ক আরো ইহা ছাড়া
অতীতের কল্পনায় ভাসে নাই যারা।
অনাগত ভারতের যে-মহামানব,
সেবিকা বান্ধবী মাতা—তুমি তার সব।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য ক্ষমতা আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের মধ্যে যেন কোনো বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগ স্বীকারের অভাব—কিছুই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।"

দীক্ষালাভের পর নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে প্রায় ছ'মাসের অধিককাল ভারতের নানাস্থান পর্যটন করে এ-দেশ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর কলকাতায় বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে বিবেকানন্দ একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। নিবেদিতা হলেন তার প্রধানা পরিচালিকা। বাড়ী বাড়ী গিয়ে তিনি ছাত্রী সংগ্রহ করে আনতেন। ছাত্রীদের তিনি আপন সন্তানের ন্যায় যত্ন করতেন।. তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শেই নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়েদের মহান্ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের আদর্শ নারী—গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, পদ্মিনী, রানী ভবানী, গান্ধারী, অহল্যা, সংঘমিত্রা প্রভৃতির অপরূপ জীবন কাহিনী বর্ণনা করতেন। স্বামীজীর দেহাবসানের পরে জাতীয়তার মন্ত্র প্রচারে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করায় বিদ্যালয় পরিচালনার ভার নিবেদিতা ভগিনী খৃষ্টীনের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। তবুও স্বামীজীর নির্দেশ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তিনি অবসর মতো নিয়মিতভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিদর্শন করতেন। এদেশে প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে এ শিক্ষায় কেবল আক্ষরিক জ্ঞান জন্মে, এতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। তাই তিনি বলেছিলেন, "কেবল শুদ্ধ পুঁথিগত বিদ্যা ও ঘটনাপুঞ্জ দ্বারা বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করা চলে না। শুধু বুদ্ধির উৎকর্ষ দ্বারা যে শিক্ষা মানুষকে কেবল ধূর্ত বা চতুর করে,—যাহা শুধু জীবন-নির্বাহের পাথেয় সংগ্রহের উপায়মাত্র হইয়া দাঁড়ায়,—তাহাদ্বারা অনুকরণপ্রিয় একটি মর্কট গড়িয়া উঠিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা মানুষকে যথার্থ মানুষ করে না, তাহার অন্তর্নিহিত শৌর্য ও মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করে না।"

ভারতে একটি আদর্শ জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য নিবেদিতা গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তাঁর এই চিন্তা-প্রসূত বহু মূল্যবান প্রবন্ধ "Hints on National Education in India" নামক গ্রন্থে বিধৃত। ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলতেন, "হায় শিক্ষাই তো ভারতের সমস্যা। কেমন করে প্রকৃত শিক্ষা—জাতীয় শিক্ষার

ব্যবস্থা করা যেতে পারে, য়ুরোপের নিকট অনুকরণের পরিবর্তে, ভারতবর্ষের প্রকৃত সন্তানরূপে তোমাদের গঠন করতে পারা যায়, তাই সমস্যা। তোমাদেব শিক্ষা হবে হৃদয়ের, আত্মার এবং মস্তিষ্কের উন্নতি-সাধন। তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে, পরস্পরের মধ্যে এবং অতীত ও বর্তমান জগতের মধ্যে সাক্ষাৎ যোগ-সূত্র স্থাপন।"

এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়েই নিবেদিতা সর্বাধিক উদ্যোগী ছিলেন। তিনি বলতেন, "আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে; বিদেশী শিক্ষার অনুকরণ দ্বারা শিক্ষার যথার্থ ফললাভ অসম্ভব। অতীতের হিন্দু নারীগণ কি আমাদের লজ্জার কারণ ছিলেন যে, তাঁহাদের প্রাচীন সৌন্দর্য ও মাধুর্য, তাঁহাদের নম্রতা ও ধর্মভাব, তাঁহাদের সহিষ্ণুতা এবং প্রেম ও করুণার শিশুসুলভ গভীরতা বর্জন করিয়া আমরা পাশ্চাত্ত্যের বিবিধ তথ্য সংগ্রহ—সামাজিক উদ্দামতার যাহা প্রথম অপরিণত ফল, তাহাই গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইব?…যে শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষসাধন করিতে যাইয়া নম্রতা ও কমনীয়তা বিনষ্ট করে, তাহা প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না।…সুতরাং ভারতীয় নারীগণের জন্য এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন, যাহার লক্ষ্য হইবে—মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির পরস্পরের সহযোগিতায় বিকাশ-সাধন।"

ভারতের নারী-শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে নিবেদিতা বলেছিলেন, "অন্তত: এই আদর্শ নির্বাচনে বোধ হয় জগতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য অধিক। অপর সকল দেশ অপেক্ষা ভারতই বিশেষভাবে মহীয়সী নারীকুলের জন্মদাত্রী। ইতিহাস, সাহিত্য, যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সর্বত্র তাঁহাদের মহিমময় মূর্তি উদ্ভাসিত।… ভারতের ইতিহাস এবং সাহিত্যে নারীত্বের যে জাতীয় আদর্শ বিরাজমান, যে শিক্ষা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সেই আদর্শকে উচ্চ স্থান প্রদান না করে, তাহা কখনই ভায়তীয় নারীগণের প্রকৃত শিক্ষারূপে পরিগণিত হইতে পারে না।"

•

নিবেদিতা এদেশের সমগ্র শিক্ষাকে ভারতীয় জাতীয়তার আদর্শে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে যে শিক্ষা জাতির গঠনমূলক কার্যের সহায়ক, তাহাই জাতীয় শিক্ষা। যে শিক্ষার মাধ্যমে দেশ ও দেশবাসীর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে, তার ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতির পরিচয় হয় তাহাই জাতীয় শিক্ষা। এই ধারণা তিনি এদেশীয়দের অন্তরে দৃঢ়মূল করিতে চেয়েছিলেন।

বাগবাজারের বোস পাড়ার এই বালিকা বিদ্যালয়টি নিবেদিতার বাসভবনে পরিণত

হয়েছিল। তিনি এই গৃহেই অবস্থান করতেন। তিনি বলতেন, "এই গলিটি আমাকে আপন করে নিয়েছে, এস্থান ছেড়ে আমি অন্য কোথাও থাকতে পারব না।" পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয় গৃহ নিবেদিতার সমস্ত কর্মের প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে এই বিদ্যালয় 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত ও পরিচালিত।

স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ নির্দেশাদিকে নিবেদিতা ঈশ্বরাদেশ বলে মনে করতেন। এবং তাঁর কথা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তিনি আচার-আচরণে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হিন্দু ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করতেন। বিবেকানন্দের সেবার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তিনি রোগাক্রান্ত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় দরিদ্র মানুষদের সেবা করতেন। একবার কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হলে নিবেদিতা প্লেগরোগাক্রান্ত রোগীদের সেবার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি তিনি নিজে পার্শ্ববর্তী রাস্তাঘাট সাফ করতেন।

কিছুদিন ধরে গঠনমূলক কাজ করার পর নিবেদিতার মনে ভাবান্তর দেখা দিল। তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত কোনো উন্নয়নমূলক কাজই সম্ভব নয়। কয়েকটি মেয়েকে শিক্ষা দিয়ে বা কিছুটা জনসেবার কাজ করে একটি অধঃপতিত জাতিকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। বিবেকানন্দ নিবেদিতার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন সুস্পষ্টভাবে। তিনিই তো তাঁর মানস কন্যাকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন এই আশায় যে নিবেদিতাই পরবর্তীকালে ভারতে জাতীয়তার মন্ত্র প্রচারের ভার গ্রহণ করবেন। তাই মৃত্যুর পূর্বেই তিনি নিবেদিতাকে স্বাধীনভাবে কাজ করবার অনুমতি দিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯০২ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবসানের পর নিবেদিতা তাঁর চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়ে গভীর বেদনাহতচিত্তে কঠোর সংকল্প গ্রহণ করলেন স্বামীজীর অসমাপ্ত কার্য সুসম্পন্ন করার জন্য। সে সংকল্প ধর্ম প্রচারের নয়, ভারতে জাতীয়তামন্ত্র প্রচারের। কারণ, অতীতে উচ্চারিত স্বামীজীর কথা নিবেদিতার মনে পড়ল, "আমি স্বদেশবাসীর উন্নতিকল্পে যে কাজে হস্তক্ষেপ করেছি, তা সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন হলে দু'শবার জন্মগ্রহণ করব।" তাছাড়া, স্বামীজীর আর একদিনের কথা তাঁর স্মরণপথে এল, "আমার উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ নয়, বেদান্ত নয়, আমার উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্ব আনা।" মৃত্যুর এক বছর পূর্বে স্বামীজীর লেখা একটি চিঠি পড়ল নিবেদিতার হাতে। তাতে তিনি নিবেদিতাকে লিখেছিলেন, "আমার অনন্ত আশীর্বাদ জানিবে। কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো না।...ক্ষত্রিয় শোণিতে তোমার জন্ম,আমাদের অঙ্গের গৈরিক বাস তো

যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যু সজ্জা। ব্রত উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নহে।" বিবেকানন্দের এই সব তেজোদৃপ্ত বাণী স্মরণ করে নিবেদিতা অনুভব করলেন যে ধর্ম স্বামীজীর কাছে একটা আবরণমাত্র আসলে তাঁর অন্তরে ছিল স্বাধীনতার উদগ্র কামনা। বিবেকানন্দ ছিলেন জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে নিবেদিতা আবিষ্কার করেছিলেন বিরাট এক বিপ্লবী বিবেকানন্দকে। কলকাতার এক জনসভায় নিবেদিতা বলেছিলেন, "স্বামীজীই আমার ধর্ম, আমার দেশহিতৈষণা সব......স্বামীজী আমাদের মহান্ জাতীয় নেতা।" স্বামীজী একবার নিবেদিতাকে নিজের একটি ফটো দিয়ে বলেছিলেন, "ভারতের পুনরুত্থানকল্পে তোমার সেবা যেন সার্থক হয়।"

গুরু-স্মরণ করে সত্বর নিবেদিতা বেরিয়ে পড়লেন বিবেকানন্দের বাণী—ভারতীয় জাতীয়তার অগ্নিগর্ভ মন্ত্র প্রচারে। বরণীয় মাতৃভূমি ভারতভূমির পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিলেন ভারতের মুক্তির কামনায়। খ্যাতনামা জাপানী চিত্রশিল্পী ভারতপ্রেমিক কাকুজা ওকাকুরা সেই সময় ভারতবাসীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "যদিও বিবেকানন্দের মৃত্যু হইয়াছে, তথাপি তিনি তাঁহার মানসকন্যা নিবেদিতাকে রাখিয়া গিয়াছেন তোমাদিগকে পরিচালনা করিবার জন্য। তোমরা অবশ্যই তাঁহার কথা শুনিবে। তাঁহার চারিদিকে আসিয়া দলে দলে সঙ্ঘবদ্ধ হইবে।" সেই সঙ্গে নিবেদিতাও ঘোষণা করলেন—"আমার জীবনের ব্রত এই জাতিকে জাগ্রত করা।"

প্রথমে নিবেদিতা কলকাতা ও বাংলার নানাস্থানে সভাসমিতি করলেন। তারপর ভারত ভ্রমণে বার হলেন। একে একে তিনি লাহোর, বোম্বে, পুনা, গুজরাট, সুরাট, আমেদাবাদ, বরোদা, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করে অসংখ্য সভাসমিতিতে অগ্নিময়ী বক্তৃতা দিলেন। জনসাধারণ, নারী ও ছাত্র সমাজ সবারই নিকট তাঁর সেই একই সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল: 'জাতীয় মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হও, ভারতের মুক্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ কর।' পথে অজন্তা ও ইলোরার প্রাচীন ভাস্কর্যগুলি পরিদর্শন করে তিনি অভিভূত হন এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যে বিশেষ গর্ব অনুভব করেন। এই সময় বরোদায় অরবিন্দ ঘোষ এবং নাগপুরের বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

কয়েক মাস পরে কলিকাতায় ফিরে এসে তিনি দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করলেন। মাদ্রাজে প্রায় এক মাস কাল অবস্থান করে তিনি নানা সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিলেন। এক মহিলা-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পুরুষ অপেক্ষা নারীর উপরই যে জাতি গঠনের দায়িত্ব

অধিক স্মরণ একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, "আজ আমাদের দেশ এবং ধর্ম দারুণ দুর্দশায় এসে পড়েছে। ভারতমাতা এই মুহূর্তে তাঁর মেয়েদের বিশেষভাবে আহ্বান করছেন—তাঁরা যেন প্রাচীন কালের মতো শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন। কী করে তা সম্ভব হবে? আমাদের সকলেরই এই প্রশ্ন। প্রথমতঃ, হিন্দু মাতা তাঁর ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের তৃষ্ণা ফের জাগিয়ে তুলুন। এছাড়া জাতির পক্ষে তার প্রাচীন বীর্যলাভ সম্ভব নয়। ভারত ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও ছাত্রজীবনের এমন মহান আদর্শ নেই; যদি এখানেই তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে আর কোথায় তাকে রক্ষা করবার আশা করা যেতে পারে? ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও মহত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রত্যেক জননী যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁর সন্তানেরা মহৎ হবে।
দ্বিতীয়তঃ, আমরা কি নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে পরদুঃখকাতরতা ফুটিয়ে তুলতে পারি না? এই পরদুঃখকাতরতা সকল মানুষের দুঃখ, দেশের দুরবস্থা এবং বর্তমানে ধর্ম কত বিপদগ্রস্ত তা জানতে আগ্রহ জাগাবে। এই জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বহু শক্তিশালী কর্মী জন্মাবে, যারা কর্মের জন্যই কর্ম করবে এবং স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সেবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকবে। এই স্বদেশের কাছ থেকেই আমরা সব পেয়েছি—জীবন, আহার, বন্ধু, পরিজন ও শ্রদ্ধা। এই দেশই কি আমাদের প্রকৃত জননী নন? আবার কি তাঁকে মহাভারতরূপে দেখবার আকাঙ্খা আমরা পোষণ করব না?"

কিছুদিন পরে নিবেদিতা দক্ষিণ ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করে উত্তর ভারত যাত্রা করলেন। পাটনায় এক ছাত্রসভায় তিনি বললেন, "আমাদের দরকার শক্তিশালী যুবকবৃন্দ। পড়াশোনাতেই সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ না হয়। তোমাদের লক্ষ্য হোক মাতৃভূমির কল্যাণ। সর্বদা মনে রেখো, সমগ্র ভারতই তোমার দেশ, আর এই দেশের বর্তমান প্রয়োজন কর্ম। জ্ঞান, শক্তি, সুখ ও ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য চেষ্টা কর। ঐগুলিই যেন তোমাদের লক্ষ্য হয়। আর যখন সংগ্রামের আহ্বান আসবে, তখন যেন তোমরা নিদ্রায় মগ্ন থেকো না।" এইভাবে বারাণসী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি উত্তর ভারতের বহুস্থানে ভাষণ দিয়ে দেশবাসীকে জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করে তুললেন।

১৯০২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণদান কালে বড়লাট লর্ড কার্জন ভারতবাসীদের মিথ্যাবাদী বলে নিন্দিত করেন। নিবেদিতা এতে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন এবং অমৃতবাজার পত্রিকার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে কার্জনকেই মিথ্যাবাদী প্রমাণ করেন। ১৯০৩ সালে ইউনিভারসিটি বিল পাস হওয়ায় শিক্ষার উপর কুঠারাঘাত

করা হয়েছে দেখে নিবেদিতা এর তীব্র প্রতিবাদ করে এক পত্র লিখলেন, "ভারতের উপর বহু অবিচার হইতেছে। ভারতের ভারত হইবার, নিজের জন্য চিন্তা করিবার ও জ্ঞানার্জনের অধিবার নাই, এই অবিচারই আমার মনে জ্বালা সৃষ্টি করে।"

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে নিবেদিতার প্রভাব অসামান্য। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষও তাঁর নিকট কম ঋণী ছিলেন না। অরবিন্দের নিজের কথায়, "বাংলায় আমার রাজনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টায় আমাকে যিনি সবচেয়ে বেশী সহায়তা করিয়াছেন এবং নানাভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্যা শিষ্যা—মহীয়সী নিবেদিতা।" বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে অরবিন্দ ছিলেন দীক্ষাগুরু আর নিবেদিতা ছিলেন শিক্ষাগুরু। বিপ্লবীদের সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'তে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বোস পাড়ায় তাঁর বাসভবনটিও সন্ত্রাসবাদীদের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়ে উঠল। এখানে আগত তরুণদের নিবেদিতা প্রাণভরে ভালবাসতেন, নানা শিক্ষাপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের কর্ণকুহরে বিবেকানন্দের একটি বাণী উচ্চারণ করতেন প্রায়ই, "তোমার দেবতা আজ চায় তোমার জীবন বলি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তোমার সামনে তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা সে তোমার জননী জন্মভূমি।"

তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরির প্রায় দু'শ বিপ্লবী গ্রন্থ তিনি বিপ্লবীদের দান করেছিলেন। সমগ্র বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করে তিনি গুপ্ত সমিতির তরুণ সদস্যদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর প্রথম ছাত্র অরবিন্দ-ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তারপর দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মারাঠী সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রভৃতি এসে জোটেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলনে নিবেদিতার দান অপরিসীম। তাঁর এক চরিতকার বলেছেন, "যেমন চালচিত্রের উপর দুর্গা প্রতিমা, তেমনি আন্দোলনের পটভূমিকার উপর ভগিনী নিবেদিতার চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। বাঙালীর এই স্বদেশীযুগের সহিত ভগিনী নিবেদিতার জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নিবেদিতার জীবন-ইতিহাস বাদ দিয়া স্বদেশী যুগের ইতিহাস লেখা যায় না।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিংসা অহিংসার প্রশ্ন উঠলে নিবেদিতা বলতেন, "দেশের ক্লীবত্ব ঘুচাইবার জন্য হিংসা আর বিপ্লবকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করাই এখন কর্তব্য; আমি শুধু এই বুঝি।...বুকের রক্তে যেন কাপুরুষতার সকল অপবাদ ধুইয়া মুছিয়া যায়।" কোনো কোনো জাতীয়তাবাদী নেতা বোমা ফাটাইবার প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন তোলায় নিবেদিতা বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই আছে। বোমা না ফাটাইলে ইংরেজ এক কণিকাও দিবে না।...ভারতের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত—ইহা শুধু মুখে বলিলে চলিবে না; অস্ত্র

ধরিতে হইবে, গুলি ছুঁড়িতে হইবে, শত্রুকে আঘাত হানিতে হইবে, তবেই না ইংরেজ আমাদের সম্মান করিবে।"

১৯০৭ সালে বাংলায় বিপ্লব আন্দোলন দমন করার জন্য ইংরেজ শাসন কর্তারা মরিয়া হয়ে উঠল। পুলিশ বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করল এবং তাঁর এক বছর জেল হল। এই সময় ভগিনী নিবেদিতার উপর পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি পড়ল। তিনি কারারুদ্ধ হলে আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার আশঙ্কা দেখে বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে তিনি বিলেত যাত্রা করলেন, যাতে ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও প্রেরণা যোগাতে পারেন। বিদেশ যাত্রার পূর্বে নিবেদিতা অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, "মনে রাখবেন, বিধাতা আপনার দক্ষিণ হস্তে কঠোর আদরে দুঃখের যে দারুণ দীপ দিয়াছেন—দেশের অন্ধকারে বিদ্ধ করিয়া ধ্রুবতারার মত সেই আলো আজ জ্বলিয়াছে। আপনি বিপ্লবের অগ্রদূত। দেখিবেন সে আলো যেন নিভিয়া না যায়। সাগরপার হইতে আমি যেন আপনার জয়শঙ্খ শুনিতে পাই।" আর তাঁর বাগবাজারের বাস ভবনে তরুণ বিপ্লবীদের ডেকে বললেন, "তোমাদের একজন সহকর্মী জেলে গিয়েছে। তার শূন্যস্থান পূর্ণ করতে হবে। তোমরা জেনো, কালের ভেরী বেজেছে, রুদ্রের আহ্বান এসেছে। আমি দেখেছি, দেশজননী তোমাদের ললাটে রক্ত-তিলক পরিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের সামনে অগ্নিপরীক্ষা। এই রুদ্রযজ্ঞে হয়ত তোমাদের কয়েকজনকে জীবনাহুতি দিতে হবে। তোমাদের এক হাতে অরবিন্দ তুলে দিয়েছেন গীতা আর অন্য হাতে আমি দিয়েছি বোমা। আমি যেন ফিরে এসে দেখি, তপ্ত রৌদ্রদাহ উপেক্ষা করে বিপ্লবের পথে তোমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছ।"

১৯০৫ সালে বারাণসী কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি গোখ্‌লে কর্তৃক নিবেদিতা বিশেষভাবে আহুত হয়ে যোগদান করেছিলেন। কংগ্রেসে বাংলার 'বয়কট আন্দোলন' পাস করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। পাঞ্জাব আর মহারাষ্ট্র ছাড়া আর কোনো প্রদেশই এ আন্দোলনের সমর্থক ছিল না। কিন্তু অবশেষে নিবেদিতার আশ্চর্য প্রভাবে গোখ্‌লে উহা সমর্থন করে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সময় নিবেদিতা কংগ্রেসের নীতি ও কর্তব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ ও কর্মতৎপর করিয়া তুলিতে হইবে, আর হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা, ওদিকে মণিপুর হইতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট দেশের অগণ্য অধিবাসীদের মনে আত্মীয়তা ও জাতীয়তার বোধকে উজ্জ্বল করাই মহাসভার কর্তব্য।"

নিবেদিতার বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সারা ভারত পরিভ্রমণ করে তিনি যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। একবার নিবেদিতা

কলিকাতার টাউনহলে একটি ভাষণ দেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, "মঞ্চের উপর বহু ইউরোপীয় নরনারী উপস্থিত ছিলেন, এবং হলঘরটি বহু বাঙালী যুবকের সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল—ডাইনামিক রিলিজান, অন্য কথায় বলতে গেলে 'স্বাদেশিকতা'। প্রায় দেড় ঘণ্টা ভাষণ দেন। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসেছিলেন। তাঁর কথার সারমর্ম ছিল, "আর বৃথা বাক্য ব্যয় নয়, এখন কাজ চাই—কাজ—কাজ।" বাগ্মীপ্রবর বিপিনচন্দ্রপাল ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ইহা ডাইনামিক রিলিজান নয়, ডিনামাইট (অর্থাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরক)।"

কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন বা বিপ্লববাদ প্রচারের মধ্যেই নিবেদিতা ভারতে তাঁর জাতীয় জাগরণের কাজ সীমাবদ্ধ রাখেন নি। স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে থেকে তিনি ভারতের প্রাচীন শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অপূর্ব সৃষ্টির পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে অতীত ভারতের এই গৌরবময় শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ের উপরই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আশা নিহিত, এই সব জাতীয় চেতনা ও জাতীয় ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীদের নিবেদিতা নানাভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। চিত্রাঙ্কনে এঁরা প্রথমে পাশ্চাত্ত্য ভাবের অনুকরণ করতেন। নিবেদিতাই এঁদের ভারতীয় পদ্ধতি অবলম্বনের প্রেরণা প্রদান করেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে ভারতীয় চিত্রকলা ও প্রাচ্য সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টার পশ্চাতে ছিল নিবেদিতার প্রেরণা। অসিতকুমার হালদার বলেছেন, "আমাদের ছিল তখন দেশী শিল্পের গবেষণা-কাল···ভগিনী নিবেদিতা সর্বদা আমাদের এই জাতীয় জাগৃতি প্রীতির চক্ষে দেখতেন।···আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আর্টের নবজাগরণ নির্ভর করছে—সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন।···আমাদের বারবার উপদেশ দিতেন, জাতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যকে জাগিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আপ্রাণ কাজ করতে।" কলিকাতা আর্ট স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিঃ ই. বি. হ্যাভেলকেও তিনি সাহায্য করেছিলেন। মডার্ন রিভিয়ুতে অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতিদের চিত্র ছাপা হলে নিবেদিতা প্রবন্ধ লিখে তার পরিচয় করিয়ে দিতেন। আর্ট স্কুলেও তিনি বহু বক্তৃতা দিয়েছেন। তাছাড়া, 'জাতীয়তা গঠনে আর্টের কাজ', 'আর্টের বাণী' প্রভৃতি বহু প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন। এক কথায় ভগিনী নিবেদিতাকে ভারতীয় চিত্রের ধাত্রী বলা যেতে পারে।

এদেশে বিজ্ঞান, ইতিহাস চর্চায়ও তিনি সমানে উৎসাহ প্রদান করতেন। বিজ্ঞান সাধনার জন্য তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। নানা প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করতে করতে জগদীশচন্দ্র যখন হতাশ হয়ে পড়তেন, নিবেদিতাই তাঁকে উৎসাহ দিয়ে আবার সবল করে তুলতেন। বাগবাজার বিদ্যালয় থেকে নিবেদিতা প্রতিদিন জগদীশচন্দ্রের বাড়ী গিয়ে তাঁর গবেষণার খোঁজ খবর নিতেন। জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি বিজ্ঞান-গ্রন্থ প্রণয়নে নিবেদিতার সক্রিয় সাহায্য ছিল। বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার মূলেও আছে ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণা ও আদর্শ। ভারতের জাতীয় ইতিহাস গবেষণার কাজে নিবেদিতা আচার্য যদুনাথ সরকার, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ তারকনাথ দাস প্রভৃতিকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। আচার্য যদুনাথ বলেছেন, "ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে একটি জিনিস আমি শিক্ষা করিয়াছি। তাহা হইল আত্মমর্যাদাবোধ। আমাকে ইতিহাস-গবেষণার কার্যে প্রেরণা দিবার কালে একটি কথা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'কখনও বিদেশীর নিকট আপনার পতাকা অবনত করিবেন না।'—তাঁহার সেই উপদেশ আমি জীবনে ভুলি নাই।"

বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতেও নিবেদিতার সক্রিয় সাহায্য ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্য তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে শ্রদ্ধা করতেন এবং গ্রন্থ রচনায় উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন। তিনি দীনেশচন্দ্র রচিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"র ইংরেজী সংস্করণের ভুল সংশোধন করে দিয়েছিলেন। বাংলার গ্রাম্য ছড়া ও পল্লী-গাথার সম্বন্ধে নিবেদিতা অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। দীনেশচন্দ্র তাঁর 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন, "গ্রাম্য ছড়াগুলি সম্বন্ধে যদি আমি হেলায় অশ্রদ্ধার কথা বলিয়াছি, তবে নিবেদিতার নিকট গালমন্দ খাইয়াছি। তিনি বলিতেন, বড় বড় লম্বা শব্দ লাগাইয়া যাঁহারা মহাকবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অমার্জিত ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাঁহাদের অপেক্ষা ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে। আপনি কৃষকগণের গান অবজ্ঞা করিবেন না, তাহাদের মেঠো সুরে রাগিণী না থাকিলেও করুণা আছে,—তাঁহাদের সকল কথায় আভিধানিক জ্ঞান না থাকিলেও প্রাণ আছে,—আর তাঁদের কুড়ে ঘরে সোনারূপার দাম না থাকিলেও আঙিনায় শিউলি ও মল্লিকা ফুলের গাছ আছে।"

বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিপ্লবী, সাংবাদিক, দেশসেবক—সকল শ্রেণীর জ্ঞানী গুণী মনীষীর মনে তিনি প্রেরণার সঞ্চার করেছেন। বাংলা তথা ভারতের সমস্ত মনীষীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। যাঁরা দেশকে ভালবাসতেন তাঁদের তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যার

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ডঃ নীলরতন সরকার, স্যার যদুনাথ সরকার, তারকনাথ পালিত, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, ডাঃ কুমার স্বামী, মিঃ নটেশন, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সরোজিনী নাইডু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ছিলেন তাঁর একান্ত গুণমুগ্ধ। বাগবাজারের বোস পাড়া লেনের নিবেদিতার সেই ছোট্ট ঘরটিতে এঁদের যাতায়াত ছিল। এঁরা সবাই বলেছেন যে নিবেদিতার কাছে গেলে মনে যথেষ্ট বল পেতেন। আলিপুর বোমা মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের মোকর্দমা পরিচালনা করায় নিবেদিতা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। অরবিন্দ মুক্তি পেলে নিবেদিতা চিত্তরঞ্জনের কোটের বোতামে একটি গোলাপ ফুল লাগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "আমি জানি আপনি মহৎ, কিন্তু আপনি যে এত মহৎ তা জানতাম না।" নিবেদিতার আলাপ-আলোচনা ছিল অত্যন্ত নির্ভীক, দৃঢ়, তেজোদীপ্ত ও উৎসাহব্যঞ্জক। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার যথার্থই বলেছেন, "বাংলার মাটিতে হল কর্ষণের পর, যখন নবজীবনের বীজবপন ও বারিসেচন আরম্ভ হইয়াছে, তখন দিকে দিকে কত অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল ; তাহারই মধ্যে এই আর একটি বীজ যেন সকলের দূরে, এক কোণে—নিজেকেই ফলে পুষ্পে বিকশিত করিবার জন্য নয়—অপরগুলির সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য, এমন ফসলের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, যাহা বাজার পর্যন্ত পেঁছায় না : সে কেবল সার হইবার ফসল। বাংলার মাটিতে তাহা মিলাইয়া গিয়াছে ; সেই কালের অব্যবহিত পরে আমরা বাংলার উদ্যানে ফলফুলের যে আকস্মিক বাসন্তীশোভা দেখিয়াছিলাম, ভগিনী নিবেদিতার এই নীরব আত্মোৎসর্গ তাহার মৃত্তিকাতলে কোন্ রসধারা গোপনে সঞ্চারিত করিয়াছিল,—তাহা নির্ণয় করিবে কে ?" স্যর রাসবিহারী ঘোষ বলেছিলেন, "যদি আজ শুষ্ক অস্থিপঞ্জরে জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে, তবে তাহার কারণ— ভগিনী নিবেদিতা ইহাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন।"

ভগিনী নিবেদিতা ভারতের একটি জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে বজ্রচিহ্নিত একটি পতাকাকে জাতীয় পতাকারূপে প্রদর্শন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত জাতীয় পতাকার পরিকল্পনাটি এইরূপ : গাঢ় রক্তবর্ণের জমির উপর সোনালী সুতোর বজ্র এবং তার উভয় পার্শ্বে লেখা বন্দেমাতরম্।

নিবেদিতা বলতেন, "আমরা আশা করব না, নিরাশও হব না, আমরা দৃঢ়নিশ্চয়— আমরা অগ্রগামী মরিয়া দল (Band of despair)। আমরা নিজেদের শরীর দিয়ে সেতু প্রস্তুত করব, পরবর্তী সৈন্যদল সেই সেতুর ওপর দিয়ে পার হয়ে যাবে।"

তৎকালীন শিক্ষিত ভারতীয়দের পাশ্চাত্য-অনুকরণকে তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তিনি মনে করতেন যে যে-দেশের সভ্যতা এত প্রাচীন ও মহান্ তার পক্ষে পাশ্চাত্ত্যের প্রতি অন্ধ-প্রবণতা দাসসুলভ মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। একজন পাশ্চাত্ত্য রমণীর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি এমন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি বলতেন, "আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, আমার যাত্রার আরম্ভ ভারতবর্ষে, আর ভারতবর্ষেই তার পরিসমাপ্তি। তার ইচ্ছা হলে সে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে।" মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন, "নিবেদিতা ভারতবর্ষকে যেরূপ ভালবাসিতেন, ভারতবাসীরাও ততটা ভালবাসিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।" অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, "ভারতবর্ষকে বিদেশীরা যাঁরা সত্যই ভাল বেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সব চেয়ে বড়।"

নিবেদিতা ভারতবর্ষের অখণ্ডতা, জাতীয়তা ও তার গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন। তিনি বলতেন,

"আমি বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরেই জাতীয় ঐক্য গঠিত।

আমি বিশ্বাস করি বেদ ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম ও সাম্রাজ্যসমূহের সংগঠনে, মনীষীবৃন্দের বিদ্যাচর্চায় ও মহাপুরুষগণের ধ্যানে যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই আর একবার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে এবং আজিকার দিনে উহারই নাম জাতীয়তা।

আমি বিশ্বাস করি ভারতের বর্তমান তাহার অতীতের সহিত দৃঢ় সংবদ্ধ, আর তাহার সামনে জলজল করিতেছে এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ।

হে জাতীয়তা, সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান, যে বেশে ইচ্ছা আমার নিকট আইস। আমাকে বরণ করিয়া লও।"

নিবেদিতার কাজ কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতের বাইরে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহও তিনি পরিভ্রমণ করে ভারতের সভ্যতা ও সাংস্কৃতির বিষয় প্রচার করেছিলেন। ভারতবর্ষকে বিশ্বের চোখে শ্রদ্ধেয় ও গৌরবময় করে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপরে তিনি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দেশবিদেশের বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বিদেশীয় মিশনারী ও স্বার্থবাদীরা ভারতের ইতিহাস ও সমাজের নানা বিকৃত বর্ণনা দিয়ে ভারতবর্ষকে বিদেশীদের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করে তুলেছিল। কিন্তু নিবেদিতার রচনাবলী ছিল তার শ্রেষ্ঠ জবাব। তাঁর লেখা পড়ে

পাশ্চাত্ত্যবাসীদের মনে ভারতের প্রতি সমীহ জাগে। 'দি সানডে' পত্রিকায় হেনরী মারী লিখেছিলেন, "মিস্ নোব্‌ল আমাদের যে ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচিত করিয়াছেন, তাহা অর্ম, অথবা মিল, বা কর্ণেল টেলর, বা মিঃ রাডিয়ার্ড কিপলিঙ্, কিংবা মিসেস স্টীলের ভারতবর্ষ নহে। তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া আমরা প্রকৃত ভারতবর্ষকে চিনিলাম।" ভারতের পারিবারিক ও নারীজীবনের বর্ণনায় মুগ্ধ হয়ে লেডি হেনরী সমারসেট 'ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষের পারিবারিক জীবনে নারীগণের স্থান সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমাদের সমুদয় জ্ঞান মিশনারীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। জনৈকা ইংরেজ মহিলা, মিস্ নোব্‌ল তাঁহাদের জীবনযাত্রার এবং চরিত্রের যে উচ্চ আদর্শ, মহত্ত্ব, সৌন্দর্য প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন, তাহা পাঠে আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে নূতন এবং যথার্থ জ্ঞান আহরণ করিলাম।"

ভারতবর্ষের প্রতি অসম্মানসূচক কেউ কোনো কথা বললে নিবেদিতা তা সহ্য করতে পারতেন না। একবার ইংলণ্ডে এক সভায় ভারতীয় নারীদের চরিত্র সম্বন্ধে একটি ইংরেজ মহিলা কটূক্তি করলে নিবেদিতা তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জর্জরিত করে তুলেন। অবশেষে মহিলাটি ক্ষমা প্রার্থনা করে রেহাই পান।

ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-কামনায় কঠোর পরিশ্রমের ফলে নিবেদিতার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৯১১ সালের ৩রা অক্টোবর তিনি দার্জিলিং-এ দেহত্যাগ করেন। ভারতের জাতীয় অভ্যুদয়ের ইতিহাসে নিবেদিতার নাম চিরস্মরণীয় হতে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন 'লোকমাতা', আর ঋষি অরবিন্দ বলেছিলেন 'শিখাময়ী'। নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড় জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি।...মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতই ভালবাসতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই পিপ্‌লকে—এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন লোকমাতা।"

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ সম্পর্কে আরও বলেছেন, "শিবের প্রতিই সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশন অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্তায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই

সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছিলেন, ..আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না ; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।"

"ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহাজীবন··· আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন।···নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই।"

স্বদেশহিতে সর্বত্যাগী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে দেশমাতৃকার মুক্তির মহাযজ্ঞে যিনি রাজা হরিশ্চন্দ্র ও দধিচির ন্যায় ধন ও আত্মদান করে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে মহান ত্যাগব্রতে ও জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন—তিনিই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। অতি সার্থক এই নাম চিত্তরঞ্জন। তিনি স্বীয় সুমহান্ জীবনাদর্শে দেশবাসীর চিত্তকে যথার্থই রঞ্জিত করে দেশবন্ধু হয়েছিলেন। বাস্তবিকই দেশের এমন অকৃত্রিম দরদী বন্ধু ও মানবপ্রেমিক জগতে দুর্লভ।

১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অধ্যয়নশীল প্রতিভাধর ছাত্র। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে একটা সহজাত নেতৃত্বের ভাব দেখা যেত। ছাত্রজীবনেই তাঁর বাগ্মিতাশক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পাস করে তিনি বিলেত যান আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে। তাঁর বিলেতে অধ্যয়নকালে ভারতের স্বরাজমন্ত্রের অন্যতম গুরু দাদাভাই নৌরজী বিলেতের পার্লামেন্টে সদস্যপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে চিত্তরঞ্জন তাঁর পক্ষাবলম্বন করে প্রচার কার্য চালান। বিলেতের বহু রাজনৈতিক সভায় চিত্তরঞ্জন নির্ভীকভাবে ভারতের অভাব অভিযোগ এবং ইংরেজ শাসনের দোষত্রুটি দেখিয়ে বক্তৃতা করেন। এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে যাতে তাঁর সুপ্ত স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয়ে উঠে। জেমস্ ম্যাকলীন নামে পার্লামেন্টের এক সদস্য ভারতবাসী সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন উক্তি করেন। তিনি বলেন যে ভারত দাসের জাতি, সেখানে নীতিধর্মের কোনো বালাই নেই। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি এই হীনতাব্যঞ্জক অপমানজনক উক্তিতে জাতীয়-মর্যাদাবোধে সম্পূর্ণ সচেতন চিত্তরঞ্জনের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তিনি ইংলণ্ডে অবস্থানকারী সমস্ত প্রবাসী ভারতবাসীদের নিয়ে বিরাট এক জনসভা আহ্বান করে মিথ্যাবাদী অশিষ্ট ম্যাকলীনের অশালীন উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তাঁর বক্তৃতা

বিলেতের সমস্ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ও সমালোচিত হয়। তখন লিবারেল সদস্য মিঃ লি একটি প্রকাশ্য সভার অধিবেশন ডেকে চিত্তরঞ্জনকে অভিভাষণ দিতে আহ্বান করেন। তাঁর নানা যুক্তিপূর্ণ জ্বালাময়ী বক্তৃতার ফলে ভারত-নিন্দুক ম্যাক্লীন প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শুধু এতেই শেষ নয়, পার্লামেন্টে তাঁর সদস্যপদও বাতিল হয়!

এরপর চিত্তরঞ্জনের খ্যাতি চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই তরুণ আই. সি. এস. পরীক্ষার্থীর উগ্র স্বদেশপ্রীতি কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখলেন না। ফলে যথেষ্ট ভাল লিখেও তাঁর পক্ষে আই সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হল না। এতে কিছুমাত্র হতাশ না হয়ে চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টারী পরীক্ষা দিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন।

দেশে ফিরে চিত্তরঞ্জন ব্যারিস্টারী সুরু করলেন। ১৯০৫ সালে সুরু হল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় গড়ে উঠল শক্তিশালী বিপ্লবী দল, অরবিন্দ ঘোষ হলেন তার নেতা। ১৯০৮ সালে অরবিন্দসহ বিপ্লবী দলের সমস্ত নামকরা সদস্যরা ধৃত ও কারারুদ্ধ হলেন। ইহাই আলিপুরের বোমা মামলা নামে খ্যাত। চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষে এই মামলা পরিচালনা করেন। দীর্ঘ ছ'মাস এই মামলা চলে। এতে তিনি যে সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছিলেন, তা অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর। এই মামলায় তাঁর বাগ্মিতারও অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। মামলায় অরবিন্দ মুক্তিলাভ করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের নামও সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টাররূপে গণ্য হন। এরপর তিনি দু'হাতে টাকা রোজগার করতে থাকেন এবং দানও করতে থাকেন দু'হাতে।

১৯১৭ সাল থেকেই চিত্তরঞ্জন প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগদান করেন। তার পূর্বে বহুদিন থেকে পরোক্ষভাবে তিনি এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, যেন অলক্ষ্যে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন যার সুরু আলিপুর বোমা মামলা থেকে। ১৯১৭ সালের ২০শে অগস্ট তদানীন্তন ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগুর শাসন-সংস্কারের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হলে, এই সংস্কারের অসারতা প্রতিপন্ন করা এবং দেশবাসীর প্রাণে যথার্থ জাতীয়তা ও স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলার জন্য চিত্তরঞ্জন নিজের প্রভূত অর্থোপার্জনের প্রলোভন উপেক্ষা করে দেশের সর্বত্র স্বরাজের বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে আন্দোলন পরিচালনার জন্য মাদ্রাজ সরকার শ্রীমতী এনি বেসান্তকে ১৯১৭ সালের ১৬ই জুলাই অন্তরীণ করলে সমগ্র দেশ উত্তেজিত হয়ে উঠে। ঐ সময় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক সভায় চিত্তরঞ্জন এই অন্যায় অন্তরীণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, "আমি মনে করি না যে মনুষ্যত্বের ভগবান একবার

মাত্র ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল। শয়তান ও নিপীড়করা মনুষ্যত্বকে বারবার ক্রুশবিদ্ধ করেছে। মনুষ্যত্বের উপর যে-কোনো রকমের অপমান মানুষের পবিত্র দেহের উপর নূতন করে পেরেক সঞ্চালন।"

১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন বললেন, "একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, অন্ততঃ পনের বছরের মধ্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতেই হবে।" ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন 'ডিফেন্স অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' এবং 'রৌলট অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। ১৯১৯ সালে এই দুই আইনের বিরুদ্ধে সারা ভারতে তুমুল আন্দোলন সুরু হল। গান্ধীজী এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করলেন। ৬ই এপ্রিল কলিকাতার গড়ের মাঠে মনুমেন্টের নীচে অনুষ্ঠিত এক বিরাট প্রতিবাদ সভায় চিত্তরঞ্জন 'সত্যাগ্রহে'র শপথ নিলেন। ২৩শে এপ্রিল কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর চিত্তরঞ্জন ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বললেন, "না, বৃটিশ গভর্নমেন্টের স্পর্ধা ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর প্রকটা উপায় করতেই হবে।"

বৃটিশের বর্বরতায় অহিংসা মন্ত্রের উপাসক মহাত্মা গান্ধীরও চিত্ত বিচলিত হল। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে গান্ধীজী 'অসহযোগ আন্দোলনে'র প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব গৃহীত হবার পর চিত্তরঞ্জন কলকাতায় ফিরে এসে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। অনেক দিন থেকেই আইন ব্যবসায়ের প্রতি তিনি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। মাঝে মাঝে বলতেন, "এ ব্যবসায় আমার আর ভাল লাগে না, সত্য মিথ্যার সাগরসঙ্গমে এমন নিত্য স্নান আর আমার পোষাচ্ছে না।" একদিন স্ত্রী বাসন্তী দেবী এবং ছেলে চিররঞ্জনের সামনে বললেন, "জানি তোমাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে, কিন্তু কি করব? আমি যে আর এর মধ্যে থাকতে পারছি না।" বাসন্তী দেবী উৎসাহ দিয়ে বললেন, "অর্থকে পৃথিবীর বড় সম্পদ বলে আমি মনে করি না, তা তো তুমি জান। তোমার এই সংকল্পে আমিও তোমার পাশেই রয়েছি। দৈহিক আরাম যদি তুমি ছেড়ে দিতে পার, তোমার স্ত্রী হয়ে কি আমি তা পারবো না?" ছেলে বললেন, "বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কাজ কর—আমাদের জন্য কিছু ভেবো না, তোমার যা কিছু আছে সব দেশের জন্য ব্যয় কর; আমরা যথেষ্ট বড় হয়েছি, বিলাসিতা করতে না পেলেও আমাদের কোনো দুঃখ নেই—নিজেদের সংস্থান নিজেরাই করে নেব। আমাদের জন্য তুমি ভেবো না।" স্ত্রী ও ছেলের কথায় দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে চিত্তরঞ্জন দীনা, পরাধীনা, শৃঙ্খলিতা স্বদেশ-

জননীর বন্ধন মোচনের জন্য সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করলেন। ষাট ইঞ্চি বহরের ফরমাইসি ঢাকাই ধুতি ছাড়া যিনি কিছুই পরতেন না, তিনি এখন থেকে মোটা খদ্দরের ধুতি ও ফতুয়া পরে স্বদেশী প্রচারে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

অসহযোগ আন্দোলনে চিত্তরঞ্জন প্রথমেই আহ্বান করলেন দেশের ছাত্র ও যুবসমাজকে। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন তরুণরাই দেশের মুক্তি আন্দোলনের উপযুক্ত সৈন্যবাহিনী। তিনি উদাত্তকণ্ঠে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরাই তো দেশের একমাত্র আশা। তোমরা যদি বাস্তবিকই মানুষ হও, যদি মনুষ্যত্বের আত্মা তোমাদের হৃদয়ে থাকে, যদি মানুষের রক্ত তোমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়, তবে স্বরাজ সংগ্রামে কেন তোমরা পরাঙ্মুখ? জানিও, স্বরাজলাভের ব্রতে যদি তোমরা প্রতিবন্ধক হও, যদি তোমাদের ঔদাসীন্যে আমরা স্বরাজলাভে বঞ্চিত হই, তোমাদের এই কাপুরুষের বৃত্তি-কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিবে। আর তর্ক করিও না, মুক্তি চাও তো আর যুক্তি চাহিও না, গোলামখানা ছাড়িয়া এসো, মুক্তির সন্ধানে অগ্রসর হও।"

এক ছাত্রসভায় প্রদত্ত অভিভাষণে তিনি বললেন, "জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাইবে প্রচুর স্বার্থত্যাগ ব্যতীত স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন জাতিই জয়লাভ করিতে পারে না।... যে শিক্ষায় তোমাদের দাসত্ব-বন্ধন আরও দৃঢ় করে, আমি চাই সে কুশিক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দাও। ওঠ, জাগ, আর মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিও না। পরাধীনতার দুর্দশা একবার ভাবিয়া দেখ। আর স্বাধীনতার পথ সুগম করিয়া দৃঢ়ভাবে তাহা সুরক্ষিত কর।"

চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে হাজার হাজার ছাত্র স্কুল-কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিল। বহু উকিল, ব্যারিস্টার নিজ নিজ বৃত্তি বর্জন করলেন। অনেক সরকারী কর্মচারীও চাকরি ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। আর সারা দেশের সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বন্দী স্বেচ্ছাসেবকে দেশের কারাগার-সমূহ ভর্তি হয়ে গেল। দেশের এই অভূতপূর্ব জাগরণে বৃটিশ সরকার ভয় পেয়ে গেল।

"আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাবে"—এই আদর্শ ছিল দেশবন্ধুর জীবনে। তাই তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্ত্রী, পুত্র, ভগিনীকে সত্যাগ্রহ করতে পাঠালেন। তাঁরা সবাই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। অনেকে একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনকে সত্যাগ্রহে পাঠাতে নিষেধ করলে চিত্তরঞ্জন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বলেছিলেন, "তোমরা কি বোঝ না যে বাংলার যুবককে ডাকিবার পূর্বে, আমার ছেলেকে সর্বাগ্রে পাঠানো চাই।" পরিবারের প্রায় সকলকে সত্যাগ্রহে পাঠিয়ে শেষে নিজে একটি

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালনা করে কারারুদ্ধ হন। বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে চিত্তরঞ্জনকে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করলে, চিত্তরঞ্জন বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠে বলেছিলেন, "আমি প্রায় বৃদ্ধ হইয়াছি, কিন্তু এই ধর্মযুদ্ধে যদি আমায় মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে হয়, আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব।"

অসহযোগ আন্দোলনের সময় চিত্তরঞ্জনের অকৃত্রিম দেশ ও মানবপ্রীতির পরিচয় পেয়ে দেশবাসী তাঁকে 'দেশবন্ধু' আখ্যায় ভূষিত করেন। তখন কেউ কেউ বলেছিলেন দেশবন্ধু শব্দের অর্থ তো চণ্ডাল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি তো চণ্ডালই। পরাধীনতার শৃঙ্খলনিপীড়িত ব্যক্তি চণ্ডালেরও অধম।"

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের এক স্মরণীয় ঘটনা হল দেশবন্ধুর নিকট সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণ। তরুণদের নিকট দেশবন্ধু ছিলেন প্রেরণার উৎসস্বরূপ। তাই সুভাষচন্দ্র তাঁকে তরুণের রাজা বলে অভিহিত করেছেন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ। চিত্তরঞ্জনের শৌর্যবীর্য, স্বদেশপ্রীতি ও রণচাতুর্য সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু "বাংলার কথা" নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় বাংলার প্রাণের কথা, মর্মের ব্যথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হত, যা পাঠ করে সারা বাংলাদেশ স্বদেশপ্রেমে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল।

পল্লী বাংলার কথা চিত্তরঞ্জন গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তাই সর্বপ্রকার কাজের মধ্যে পল্লী-সংগঠন হয়েছিল তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান। তাই তিনি এক সময় বলেছিলেন, "আজ জীবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আমি স্থির বুঝিয়াছি পল্লীসমাজেই ভারতের জীবন, পল্লীসংগঠনেই ভারতের মুক্তি।" একবার তাঁর এক আবেগময়ী অভিভাষণে তিনি পাঠ করেছিলেন, "আমার বাংলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। যৌবনের সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাংলার যে মূর্তি তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস-মন্দিরে সেই মোহিনী মূর্তি আরও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

দেশবন্ধু জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন, "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল, মাহিষ্য, পোদ, মুচি, মেথর সমস্তকে লইয়া দেশ। একা শিক্ষিতের দেশ নয়।' সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি বিশেষ দরদবশতঃ বলতেন, "পরজন্মে যেন চণ্ডালের ঘরে জন্মি।" সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি বলতেন, "প্রত্যেক হিন্দু

মুসলমানের জন্য নগরে, কাননে, প্রান্তরে, পল্লীতে, গ্রামে প্রতিবাদ সভা আহূত হউক এবং রোষে, অত্যাচারে সমগ্র ভারত যেন সমস্বরে বলিতে পারে, ভারতের হিন্দু মুসলমান আমরা সকলে এক।···হিন্দু মুসলমান লইয়াই বাঙালী জাতি। সুদৃঢ়রূপে এই সমগ্র বাঙালী জাতি একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া জাতীয়তার গৌরবে মণ্ডিত হইয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে দাঁড়াইবে, তাহাই আমাদের লক্ষ্য।"

স্বরাজ বলতে চিত্তরঞ্জন জনগণের স্বরাজই বুঝতেন। ভারতের কোটি কোটি মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে, অশিক্ষায়, স্বাস্থ্যহীনতায়, বস্ত্রাভাবে জঘন্য জীবন যাপন করছে। তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যই তিনি সত্বর স্বরাজলাভের অদম্য বাসনা অন্তরে পোষণ করতেন। তাই তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমি বুর্জোয়াদের জন্য স্বরাজ চাই না, সংখ্যায় তারা কজন? আমি অগণন জনসাধারণের জন্য স্বরাজ চাই। তারাই স্বরাজ অর্জন করবে।"

১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, "আমরা এখন হইতে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ভারতবর্ষের প্রতি পল্লীতে এই কথা প্রচার করিতে থাকিব যে, যতক্ষণ জনসাধারণের হস্তে দেশের শাসনভার সমর্পিত না হইতেছে, ততক্ষণ আমরা কোনোমতেই নিরস্ত হইব না, সন্তুষ্ট হইব না। প্রত্যেক জাতিরই তাহার জন্মগত অধিকার অনুসারে বাঁচিতে হইবে, বড় হইতে হইবে, উন্নত হইতে হইবে। আমরা সেই অধিকারের দাবী করিতেছি।" ১৯১৮ সালে হোমরুল অধিবেশনে তিনি বলেছিলেন, "দেশের আপামর জনসাধারণ, প্রজা ও কৃষক যাহাতে স্বায়ত্তশাসনের সুধাময় আস্বাদ পায়, সমগ্র দেশবাসী যাহাতে স্বাধীনতা সুখভোগ করিতে পারে, তাহাই আমাদের কামনা।" ঐ সভায় তিনি বাঙালী জাতির গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে বলেছিলেন, "এমন একদিন আসিবে, যখন ভগবানের আশীর্বাদে বাঙালী জাতি সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে, একটা জাতি বলিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে। আমার জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমি শুধু এই কামনাই করিতেছি। আমার ভিতর হইতে কে যেন আমাকে বলিয়া দিতেছে, ইহাই আমার একমাত্র কার্য। আমার যাহা কিছু প্রিয় যাহা কিছু শ্রেয়, আমি এই কার্যসাধনের জন্যই প্রয়োগ করিব, যদি তাহাতে আমার প্রাণ বিয়োগ ঘটে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? এই কাজ করিতে যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমি আবার এই পৃথিবীতে এই বাংলা দেশেই জন্মগ্রহণ করিব। আবার দেশের জন্য কাজ করিব।"

"দেশবাসীকে বলি—প্রথমে তোমার গৃহে অযত্নে রক্ষিত উপেক্ষিত দীপ প্রজ্বলিত কর—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং অতীতের আলোকে তোমার বর্তমান অবস্থা উপলব্ধি

কর। তাহার পর নির্ভীকভাবে জগতের সম্মুখীন হও এবং বাহির হইতে যে আলোক পাইতে পার তাহা গ্রহণ কর।"

ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও তিনি বলেছিলেন, "এমন একদিন আসিবে যখন ভারতবর্ষের কথা বিশ্ববাসীকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে।"

পূর্বেই বলেছি অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধু ধৃত ও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। ছ'মাস পরে জেল থেকে বেরিয়ে এসেই তিনি গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হন। এই কংগ্রেসে তিনি কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত না হওয়ায় সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়ে গয়াতেই তিনি 'স্বরাজ্যদল' গঠন করলেন। উদ্দেশ্য কাউন্সিলে ঢুকে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করা। অবশেষে কংগ্রেস 'স্বরাজ্যদল গঠন' সমর্থন করেন। এরপর সারা ভারত পরিভ্রমণ করে দেশবন্ধু স্বরাজ্যদলের স্বপক্ষে জনমত গঠন করতে লাগলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "গভর্নমেন্ট যে মুখোস পরে রাজ্য শাসন করছে আমি সেই মুখোস ছিঁড়ে ফেলতে চাই।"

স্বরাজ্যদলের পক্ষে প্রচার কার্য চালাবার জন্য তিনি 'ফরওয়ার্ড' নামে একখানি কাগজ বার করলেন। সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। সরকারের বহু গুপ্ত খবর প্রকাশ করে তিনি সরকারকে বিব্রত করতে থাকেন। ১৯২৩ সালে বাংলার কাউন্সিল নির্বাচনে দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদল অধিকাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কলিকাতা করপোরেশনের প্রথম নির্বাচনেও স্বরাজ্যদলের প্রার্থীরাই প্রায় সমস্ত ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। তখন দেশবন্ধু কলকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন এবং সুভাষচন্দ্র হন প্রধান কর্মকর্তা। মেয়র হয়েই দেশবন্ধু শহরবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নয়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। তিনিই কলিকাতা করপোরেশনের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করে দিয়েছিলেন।

দেশবন্ধুর অসামান্য প্রভাবে স্বরাজ্যদল বাংলায় ক্রমেই বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠছে দেখে সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। স্বরাজ্যদলের প্রভাব খর্ব করার জন্য বাংলা সরকার ১৯২৫ সালের ২৫শে অক্টোবর 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' জারী করলেন। এই অর্ডিন্যান্সের বলে বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক অনিলবরণ রায়, স্বরাজ্যদলের সম্পাদক সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা সুভাষচন্দ্র বসু কারারুদ্ধ হলেন। গভর্নমেন্টের এই অন্যায় আচরণে দেশবন্ধু বিক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "সুভাষকে ধরেছে, এবার গভর্নমেন্টকে কাঁপিয়ে ছাড়ব"। এই বেআইনী গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলিকাতার টাউন হলে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় দেশবন্ধু জ্বালাময়ী ভাষায় বললেন, "বাংলার যুবক, তোমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতার আগুন জ্বলিয়া উঠুক, স্বাধীনতার জন্য

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া এস, আত্মবিসর্জন দিতে দ্বিগুন তেজে জ্বলিয়া উঠ ! এই জরাজীর্ণ দেহ লইয়া সর্বাগ্রে আমি সম্মুখীন হইব। তোমরা আমার অনুসরণ কর। মা, একবার সংহার মূর্তিতে প্রকাশিত হও মা, আমরা সকলে তোমার সম্মুখে আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখি।"

করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারে অপর এক প্রতিবাদ সভায় দেশবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "স্বাধীনতার জন্য আমি জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছি। বিপ্লববাদীর বর্তমান পন্থা বিচার করলে আমি বিপ্লববাদী নই, কিন্তু আমার মন বিপ্লবের পক্ষপাতী। আজ এ স্থানে দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করতে পারি যে স্বাধীনতার জন্য জীবনপাত করিবার প্রয়োজন হলে আমি তাতেও প্রস্তুত।···স্বাধীনতার জন্য বিপ্লববাদীদের যে হৃদয়াবেগ, তা আমি অনুভব করছি।"

দিনের পর দিন দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশবন্ধুর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। শীঘ্রই তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। এদিকে যে অর্ডিন্যান্স বলে গভর্নমেন্ট সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি তরুণ নেতাদের কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন তার মেয়াদ ফুরিয়ে আসায় ১৯২৫ সালের ৭ই জানুয়ারি গভর্নমেন্ট ঐ অর্ডিন্যান্স আইন বিধিবদ্ধ করে তাঁদের দীর্ঘদিন আটকে রাখতে চাইলেন। সরকারের এই অন্যায় ও দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপে চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হলেন। রোগশয্যা থেকেই তিনি এর প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন। রোগযন্ত্রণার অস্থিরতা সত্ত্বেও তিনি বললেন, "৭ই আমাকে কাউন্সিলে যেতেই হবে, আমি মরি আর বাঁচি।" ৭ই জানুয়ারি তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে কথা বলতেও তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। ডাক্তারের জোর নিষেধ সত্ত্বেও দেশবন্ধু সকলকে ডেকে বললেন, "আজ আমাকে যেতেই হবে। আমার শরীরের আগে আমার কর্তব্য। এতে যদি মরেও যাই তবু কারুর বাধাই আমি শুনব না। আজ আমার দেশের সোনার ছেলেরা বিনা বিচারে নির্বাসিত, আর আমি নিজের তুচ্ছ শারীরিক কষ্টের জন্য কি আমলাতন্ত্রকে দেশের প্রতিনিধি দ্বারা সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়ে নেবার সুযোগ দেব ? প্রাণ থাকতেও তা হতে দেব না।" স্ট্রেচারে করে তাঁকে কাউন্সিলে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরের মধ্যে তিনি শায়িত অবস্থায় রইলেন। গভর্নর স্বয়ং অর্ডিন্যান্স আইনের সমর্থনে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের উপস্থিতি কাউন্সিলে যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করল। দেশের জন্য দেশবন্ধু মৃত্যুকে ভ্রূকুটি করছেন দেখে বিরোধীদের মন অভিভূত হয়ে পড়ল। তাঁরাও অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। দেশবন্ধু বিরাট জয়লাভ করলেন। তবে গভর্নরের অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে পরে অর্ডিন্যান্স আইনে পরিণত হয়।

১৯২৫ সালের এপ্রিল-মে মাসে ফরিদপুরে যে প্রাদেশিক সম্মিলন হয় তাতে চিত্তরঞ্জন

দেশবাসীর সামনে এক বিশেষ ও বাস্তব রাজনৈতিক আদর্শ তুলে ধরেন। তাঁর মতে জাতির বিকাশলাভের অবাধ প্রয়াসই স্বরাজ সাধনার পথ। ঐ অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করলেন যে অহিংসার পথে স্বায়ত্তশাসন লাভ না হলে তিনি ইংরেজের সঙ্গে সর্ব বিষয়ে অসহযোগিতা প্রদর্শন করবেন। অভিভাষণে তিনি বললেন, "ভারতে প্রজাশক্তির মধ্যে একযোগে একটা বিরাট হিংসামূলক গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা। স্বাধীনতাপ্রয়াসী পর্য্যুদস্ত আমরা, আমাদের হস্তে স্বাধীনতার যুদ্ধে ইহাই শেষ অস্ত্র। আমি বলি ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু ধর্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে মহাবীর গাণ্ডীবী যেমন সর্বপ্রথমেই পাশুপত প্রয়োগ করেন নাই, মহাবীর কর্ণও যেমন সর্বপ্রথমেই তাঁহার একাঘ্নী অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই—কোনো বীরই তাহা করেন না—আমরা তেমনিই সর্বপ্রথমে আমাদের শেষ অস্ত্র ব্যবহার করিব না, কিন্তু যখন সমস্ত ফুরাইয়া যাইবে, তখন ধর্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের রথী যিনি, তাঁহাকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া আমরা শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিব না। ভীত হইব না, কেন না আমরা জানি যে, এ যুদ্ধ পশুবলের বিরুদ্ধে মানুষের যে আত্মার বল তাহারই যুদ্ধ। ইহা ধর্মযুদ্ধ।"

দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাচ্ছিল। তাই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি দার্জিলিং যান। কিন্তু সেখানেও তাঁর বিশ্রাম ছিল না। রোগশয্যায় শুয়েই দেশের মুক্তির জন্য তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির পরিকল্পনা করতে লাগলেন। দেশপ্রেমই ছিল তাঁর প্রাণবায়ু। হঠাৎ ১৬ই জুন (১৯২৫) তাঁর জীবন দীপ নিভে গেল। দেশবাসীর উন্নতির জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য এমন মুক্তি-পাগল মনীষী জগতে একান্ত দুর্লভ। তাঁর ত্যাগ, তাঁর সাধনা, সর্বোপরি তাঁর দেশপ্রেম জাতির নিকট প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে আছে।

দেশবন্ধু তার জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দেশের জন্য অকাতরে ব্যয় করেছিলেন। এমন কি শেষে তাঁর বসত বাড়ীটিও জনসেবায় উৎসর্গ করেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলার আর এক ত্যাগব্রতী বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন, "অর্ধশতাব্দী ধরিয়া আমি বাংলার রাজনীতি আলোচনা করিতেছি। অনেকেই ইহার পূর্বে দেশের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দেশবন্ধুর ন্যায় অনন্যকর্মা ও সর্বত্যাগী হইয়া স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে এই প্রকার আত্মোৎসর্গ কদাপি দেখি নাই।"

দেশবন্ধু ঈশ্বরবিশ্বাসী হলেও তাঁর প্রধান ধর্ম ছিল দেশ সেবা। তাই তিনি বলেছিলেন, দেশের কাজ আমার ধর্মের অঙ্গ, উহা আমার জীবনের আদর্শ। আমার দেশের কল্পনায় আমি ভগবানের মুর্তির বিকাশ দেখিতে পাই।"

দেশের অসংখ্য নির্যাতীত মানুষই ছিল দেশবন্ধুর ঈশ্বর। তাদের সেবা তাদের মুক্তির কাজই ছিল তাঁর নারায়ণ পূজা।

তাই তিনি গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলতেন, "এবার কথা দিয়ে, মন্ত্র দিয়ে নারায়ণের পূজা করিয়া মিথ্যাচার করিব না। এবার নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—আমাদের দেশের এই অগণ্য নির্যাতীত, অবমানিত, নিরন্ন, দাসত্বনিগড়বদ্ধ, দেশবাসীই আমার সাক্ষাৎ নারায়ণ। এই জাগ্রত নারায়ণের পূজা করিব ইহাই আমার কাজ এবং নারায়ণ পূজা।" এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেছেন, "দেশ বলিতে আমি ইষ্ট দেবতাকেই বুঝি। পাশ্চাত্ত্যের দার্শনিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি জাতীয়তাকে বুঝিতে শিখি নাই। দেশকে সেবা করিলে মানবসমাজকে সেবা করা হয়। আর মানব সমাজের মনুষ্যত্বের সেবাতেই ভগবানের পূজা সমাপ্ত হয়।" তাই তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমাকে যদি বাঁচিতে হয় স্বরাজের জন্যই বাঁচিব, যদি মরিতে হয় স্বরাজের জন্যই মরিব।"

দেশবন্ধুর সাহিত্য-প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষা ও ভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলতেন, "সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য।" তাঁর সাহিত্যসাধনার মধ্যেও স্বদেশপ্রেম নিহিত।

দাসত্বকে দেশবন্ধু অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। দাসত্বের বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন, "যে দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল ক্রীতদাসের গলায় বলপূর্বক পরাইয়া দেয় সেও পাপ করে, আর যে ক্লীব ভীরু দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার সময় বাধা দেয় না, সেও পাপ করে।"

সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর মানস সন্তান। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সুভাষচন্দ্রের মধ্য দিয়েই পূর্ণতালাভের প্রয়াস পেয়েছে। সুভাষচন্দ্র তাঁকে রাজনৈতিক গুরুপদে বরণ করেছিলেন। প্রথম দর্শনেই দেশবন্ধু সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "এই সেই নেতা যিনি আমাদের লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিবেন।" সত্যই চিত্তরঞ্জন বাঙালী তথা ভারতবাসীকে লক্ষ্যে—স্বরাজের পথে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

কর্মে ছিল চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ নিষ্ঠা। একবার কোনো কাজ করবেন স্থির করলে কোনো বাধাবিপত্তিই তাঁকে বিচলিত করতে পারত না। নেপোলিয়ন যেমন বলেছিলেন—আমার সামনে কোনো আল্পস্ (পর্বত) থাকবে না—চিত্তরঞ্জন সেইরূপ কোনো অন্তরায়কে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। কর্মে তাঁর এই দৃঢ়তা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "সমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলরাশির ন্যায় তিনি সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার বেগে আপন আদর্শের পানে ছুটিতেছেন। প্রিয়জনদের আর্তনাদ অথবা অনুচরদের সাবধান বাণীও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিত না।"

শিক্ষা সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের একটা বিশেষ অভিমত ছিল। তিনি বলতেন, "মানুষের যে অন্তর্নিহিত শক্তি, তাহার যে আত্মসম্বিৎ, তাহার ঘুম ভাঙাইয়া দেওয়া, সিংহকে জাগাইয়া দেওয়া, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার ধর্মকে ফুটাইয়া তোলাই শিক্ষাদীক্ষার কার্য।"

"দুই আর দুই যোগ করিতে পারিলেই শিক্ষা সমাপ্ত হয় না, আমাদের দেশজননীর সেবাই প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়।"

দেশবন্ধুর দেশপ্রেমের পরিণতি বিশ্বপ্রেমে। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "দেশবন্ধুর স্বদেশপ্রেমের পরিণতি বিশ্বপ্রেম; কিন্তু তিনি স্বদেশপ্রেমকে বাদ দিয়া বিশ্বপ্রেমিক হইবার প্রয়াস পান নাই। অপর দিকে তাঁহার স্বদেশপ্রেম তাঁহাকে আভ্যন্তরিক স্বার্থপরতার দিকে লইয়া যাইতে পারে নাই।...তাঁহার স্বদেশপ্রেমের মধ্যে বাংলাকে ভুলিয়া যাইতেন না, অথবা বাংলাকে ভালবাসিতে গিয়া স্বদেশকে ভুলিতেন না। তিনি বাংলাকে ভালবাসিতেন প্রাণ দিয়া, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা বাংলার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না।"

ভারতবর্ষে তথা সমগ্র বিশ্বে বাঙালীকে তার গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আহ্বান জানিয়ে এবং যথেষ্ট সতর্ক করে দিয়ে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, "বাঙালী আবার বাঙালী হইতে না পারিলে ভারতবর্ষে তাহার স্থান নাই। পৃথিবীর এই মহাপ্লাবনে সে হয়ত বা এবার ভাসিয়া যাইবে, কুল পাইবে না। বাঙালীর বিরুদ্ধে এ প্লাবন শুধু ত্রয়োদশ শতাব্দীর সপ্তদশ অশ্বারোহীর অভিযান নয়। ইহা পলাশীপ্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকতার জার্ণদ্বারে ক্লাইভের পদাঘাতও নয়। আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি ইহা তাহা অপেক্ষাও নির্মম, তাহা অপেক্ষাও ভয়াবহ, তাহা অপেক্ষাও শোণিতপিচ্ছিল।"

"কোথায় বাংলার আত্মা, জাগরিত হও, বল সমস্বরে, এই মন্ত্র পাঠ কর—বল, এই রূপ আমার, এই প্রাণ আমার। বল, আমার অদৃষ্ট আমিই গড়িব, আমার সাহিত্য আমিই রচিব।"

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়

একটি মাত্র কবিতার মধ্য দিয়ে যিনি জাতীয় কবি-আখ্যা লাভ করেছেন তাঁর নাম গোবিন্দচন্দ্র রায়। আর তাঁর সেই বহু প্রশংসিত স্বদেশপ্রেমপূর্ণ কবিতার নাম— 'ভারত বিলাপ'। 'ভারত বিলাপে'র এই কবি গোবিন্দচন্দ্র ফরিদপুর জেলার দক্ষিণপাড় গ্রামে ১৮৩৮ সালে (বাংলা সাল ১২৪৫, ৬ই কার্তিক) জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সালেই 'বন্দেমাতরমে'র ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এবং জাতীয়তার অন্যতম মন্ত্রগুরু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যালয়ে তাঁর প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হয়েছিল। তার বেশী নয়। তবে বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ সম্ভব না হলেও তিনি নিজের অসাধারণ অধ্যবসায়গুণে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত এবং ফারসী জানতেন। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব পিতার সন্তান। পরে রামমোহন রায়ের গ্রন্থাদি পড়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ফলে পিতা গৌরসুন্দর রায় তাঁকে বাড়ী থেকে বার করে দেন। তখন গোবিন্দচন্দ্র ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি একাধিক স্থানে শিক্ষকতার কাজ করেন। পরে বরিশাল রাজকীয় জরিপ-বিভাগে মাসিক পনের টাকা বেতনের একটি কেরানীর চাকরি পান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও স্বাধীনচেতা মানুষ। ঐ সময় চাকরি করতে করতে তিনি কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী রাজকর্মচারীর দুশ্চরিত্রতার বিষয় 'ঢাকা প্রকাশ' নামক কাগজে প্রকাশ করেন। তার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার অভিসন্ধি চলে। তখন তিনি সপরিবারে কাশী চলে যান এবং সেখানে কাশীপ্রবাসী ডাঃ লোকনাথ মৈত্রর কাছে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা করেন। ঐখানে তাঁর চিকিৎসায় বেশ নামও হয়। এখান থেকে তিনি পরে আগ্রায় যান। এবং সেখানেও যথেষ্ট অর্থ ও সুখ্যাতি অর্জন করেন চিকিৎসা বিদ্যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি শত কাজের মধ্যেও বেশ কিছু সময় সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করতেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমির প্রতি অগাধ টান ছিল। দেশের দুর্দশায় তিনি

অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন এবং কবিতাও রচনা করতে পারতেন। তাই দেশের জন্য তাঁর নিদারুণ অন্তর্বেদনা গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'ভারত বিলাপ' কবিতায় :

কত কাল পরে, বল ভারত রে।
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে।

নিজ বাস ভূমে, পরবাসি হলে
পর দাস খতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে, ধনরত্ন সুখে
বহ লৌহবিনির্মিত হার বুকে।

নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে
পরিবর্ত ধনে দুর-ভিক্ষ নিলে।…

কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে
অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে।…

নিজ শোণিত শোষি, পরে পুষিলে
তুষিতে কুল শীল স্বধর্ম্ম দিলে।
পর বেশ মিলে, পর দেশ গেলে
তবু ঠাঁই মিলে নাহি দাস বলে।…

পর পাদ বিলেহীর জাতি কিসে
সুদু বন্ধন শৃঙ্খল চারি দিশে।

যত ভারত কামিনী, আছ ঘরে
বিরম প্রসবে কিছু কাল তরে।
কি হবে প্রসবে, অযুতে অযুতে
বলবীর্য বিবর্জ্জিত দাস সুতে।

যদি নাহি হবে, সুত শূর হয়ে
সুদু গর্ভ ব্যথায় কি কাজ সয়ে।…

ধর প্রীতি মনে, যদি দেশ বলে
ভাস রে সকলে ভাস অশ্রুজলে।
ত্যজ রে ত্যজ আত্ম, সুখের কথা
ত্যজ আমোদ ভোগ বিলাস বৃথা।

গোবিন্দচন্দ্রের এই সঙ্গীত তখন খুব প্রচার হয়েছিল। পথে ঘাটে লোকের মুখে মুখে তখন এই গান শোনা যেত। সঙ্গীতটি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

গোবিন্দচন্দ্র যমুনা নদীর তীরে আগ্রায় বাস করতেন। যমুনাকে দেখে দেখে প্রাচীন ভারতের কত গৌরব-কাহিনী তাঁর মনে ভীড় জমাত। তাই তিনি যমুনাকে সম্বোধন করে একটি গান লিখেছিলেন। তার নাম 'যমুনা লহরী।' এতে যমুনা প্রাচীন ভারতের বহু ঘটনার সাক্ষী বলে বর্ণনা করে স্বাদেশিকতার ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন।

নির্মল সলিলে, বহিছ সদা।
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে।
যুগ যুগ বহি, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল বুদ্বুদ, সহ কত রাজা,
পরকাশিল লয় পাইল ও।

গোবিন্দচন্দ্রের 'দিন কি এমন হবে' গানটিও দেশাত্মবোধক।

দিন কি এমন হবে এ ভারতে, দিন কি এমন হবে!
গাইবে সবাই, মিলি এক ঠাঁই, একি গান একি রবে।
ভূমি কি সাগরে, শান্তি কি সমরে,
স্বদেশে বিদেশে, স্ববশেতে ঘুরে
তুলিয়া গলা রে, গাবে বলভরে
ভাই ভাই যেন সবে।
দিন কি এমন হবে ।।
ছুটিবে চৌদিকে, খুঁজিবে খাজিবে,
দুখের মোচনে উপায় দেখিবে
কারু নাহি হবে, নাহি ভুলি রবে
আপনা স্বদেশে কবে।
দিন কি এমন হবে !!

স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস

এদেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষণায় পল্লী-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের দান বিশেষ উল্লেখনীয়। আজীবন অবর্ণনীয় দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটলেও জন্মভূমির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম ছিল। আর ছিল তাঁর আবাল্য কবিত্ব-শক্তি। ফলে, স্বদেশ-প্রেমমূলক বহু কবিতা তাঁর লেখনী মুখে প্রকাশিত হয়েছিল।

নব জাগ্রত বাংলার স্বদেশী আমলে তাঁর এই দেশপ্রেমের কবিতাগুলি দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ আনয়নে বিশেষ সাহায্য করেছিল।

১৮৫৫ সালের ১৬ই জানুয়ারি ঢাকা জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুর গ্রামে গোবিন্দচন্দ্র দাস জন্মগ্রহণ করেন। এই জয়দেবপুর গ্রামখানি ছিল প্রকৃতির অকৃত্রিম লীলানিকেতন। এর পার্বত্য শোভা, নিবিড় অরণ্যানী এবং অদূরে প্রবাহিত ছোট নদী চিলাই প্রভৃতির অতুলনীয় মনোরম সৌন্দর্য গোবিন্দচন্দ্র দাসের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। গোবিন্দচন্দ্র দাস তাই প্রকৃতির কবি, স্বভাব কবি। আর শৈশব থেকেই জন্মভূমির প্রতি তাঁর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাঁর এই জন্মভূমি-প্রীতি তাঁর কবিতাবলীর মধ্যে সুপরিস্ফুট:

> "শত স্বর্গ শত কাশী, তার চেয়ে ভালবাসি,
> অই যে অরণ্য পূর্ণা জননী আমার,
> শত গঙ্গা হ'তে ভাই, পুণ্যতোয়া ও চিলাই,
> কত ঘাট ওর তীরে মণিকর্ণিকার।...
> জননী দুহিতা নারী, যত কিছু সে আমারি,
> সে আমার যাগ যজ্ঞ, সে আমার ধ্যান।
> তাহারে ভুলিব কিসে, সে আছে শোণিতে মিশে,
> স্বপনেও দেখি তার সে চারু বয়ান!

অভাবের তাড়নায় গোবিন্দ দাস উচ্চপর্যায়ের শিক্ষা বেশী দূর করতে পারেন নি।

ইংরেজী শিক্ষালাভের কোনো সুযোগও তাঁর হয় নি। তাই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের কোনো প্রভাবই তাঁর রচনার মধ্যে নেই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় তিনিও খাঁটি বাঙালী কবি। দারিদ্র্যের তাড়নায় কবি একবার জন্মভূমি জয়দেবপুর ছেড়ে ময়মনসিংহ গিয়ে রায় চৌধুরী রাজভবনে চাকরি গ্রহণ করেন। স্বাধীনচেতা গোবিন্দচন্দ্রের নিকট চাকরি জীবন ছিল অত্যন্ত দুর্বিসহ, অভিশাপগ্রস্ত। তাছাড়া, স্ত্রী-কন্যা প্রিয়জনদের ছেড়ে থাকতে তাঁর খুবই কষ্ট হত। এই সময় জাতীয় জীবনের নানা গৌরব কাহিনী অবলম্বনে বহু প্রেরণাদায়ক দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেছিলেন। সংসারের নানা দুঃখ কষ্ট এবং প্রিয়জন বিয়োগজনিত শোক-সন্তাপের মধ্যেও কবি অসীম ধৈর্য্য প্রদর্শন করতেন। জীবন-সংগ্রামে তিনি কখনো বিচলিত হন নি। সংসার জীবনের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন :

"ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শত দিকে শত দুঃখ আসুক্—আসুক্।
এ সংসার কর্মশালা,
জলন্ত কালান্ত জ্বালা
কলঙ্ক দহিতে হবে থাবে যতটুক্।

কবির পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত সাদাসিদে। দরিদ্রের বেশ ধারণ করতে তিনি অধিক পছন্দ করতেন। বিলাসিতা ছিল তাঁর নিকট অবজ্ঞার বস্তু। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে বিলাসিতাই আমাদের জাতীয় জীবনের অধঃপতনের মূল কারণ। তিনি রাজা মহারাজা থেকে বহু সম্ভ্রান্ত বাড়ীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু সর্বত্রই তিনি অত্যন্ত সাধারণ বেশে যাতায়াত করতেন। অথচ তিনি সর্বত্র বিশেষ সমাদৃত হতেন। তিনি বলতেন, "বিলাসিতায় মানুষের নৈতিক চরিত্র অবনত,— জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও বিপন্ন এবং দেশের দৈন্যদশা চরমে উপস্থিত হয়। সর্বোপরি, বিলাসিতায় কর্মশক্তি বিনষ্ট করে—দাসত্বের শৃঙ্খল সুদৃঢ় করে—সামাজিক জীবনে জড়তা আনয়ন করে। ফলে, জাতীয় শক্তি ধীরে ধীরে ধ্বংশের পথে যাইতে থাকে।" এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত একটি কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোনো এক শ্রীপঞ্চমী পূজা উপলক্ষে দেবী সরস্বতীকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন :

"দেবি !
কি কাজে তোমারে পূজি ? বিফল কেবল !
সঞ্জীবনী শক্তিহীনা— ফেলে দাও তব বীণা,
ত্যজ বিলাসিনী বেশ—ভূষণ কমল !

একেই ভারত হায়, নিত্য অধঃপাতে যায়,
নিপাতে বিলাস শিক্ষা আরো হলাহল ;

দেবি !

এ দেশে এ দগ্ধরাজ্যে নাহি প্রয়োজন,
আমরা মরিলে বাঁচি, বাঁচিয়া মরিয়া আছি,
ভারতে জনম শুধু মরণ কারণ ।

যন্ত্রণার একশেষ,— এত কষ্ট এত ক্লেশ,
এখানে বিলাস বেশ ? নাহি প্রয়োজন,
ভারত নয়ন জলে ভাসিছে এখন !

একান্ত ভারত যদি না পার ত্যজিতে,
বিলাসের বেশগুলি, যত আছে ফেল খুলি,
সঞ্জীবনী শক্তিহীনা, দূর কর ভাঙ্গা বীণা,
ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার সহস্র বৎসর,
ত্যজ ও বিলাস বেশ কুসুমের থর ।"

'সৌরভ' নামক আর একটি কবিতায় গোবিন্দ দাস বিলাসিতার কুফল সম্বন্ধে নির্ভীক মত প্রকাশ করেছেন :

বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ মোহে অচেতন,
চাহিয়া দেখে না পাছে, কত নীচে নামিয়াছে,
কোথা হ'তে হইয়াছে কোথায় পতন !
কোথা ধর্মে অনুরক্তি, কোথা সে বিশ্বাস ভক্তি
কোথা সেই সত্যনিষ্ঠা কোথা সংযমন !
সকলি বিলাসে ভোর, নাহি কারো গায় জোর,
পড়িলে বিপদে ঘোর কাঁপে কলেবর ।"

কবি গোবিন্দচন্দ্র অত্যন্ত তেজস্বী ও নির্ভীক-হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। যা তাঁর নিকট অন্যায় বলে প্রতিভাত হত জীবন বিপন্ন করেও তার প্রতিকার করতে ইতঃস্তত করতেন না। তিনি ভাওয়ালের রাজ বাড়ীতে কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময় রাজাদের কোনো এক অন্যায় বিচারের প্রতিবাদে তিনি কর্ম ত্যাগ

করেছিলেন। তাঁর আত্মসম্মান জ্ঞান এত প্রবল ছিল যে ভবিষ্যৎ দুর্দশার কথা এতটুকুও ভাবেন নি। কিছুদিন পরে ভাওয়ালের এক অপদার্থ রাজা এক মিথ্যা অজুহাতে কবিকে নির্বাসন দণ্ড দিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করান। সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক কবি রাজার বিরুদ্ধে রাজ্যে অকথ্য অত্যাচার, অনাচার ও কুশাসনের বর্ণনা দিয়ে "মগের মুলুক" কাব্য লিখলেন। রাজ্যের নিরীহ রাজভক্ত প্রজাদের উপর পৈশাচিক অত্যাচারের কথা কবি তেজোদৃপ্ত ভাষায় প্রকাশ করেন। বিনাদোষে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি থেকে নির্বাসন দণ্ড হওয়ায় তিনি জনসাধারণের নিকট ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে যে কবিতা লেখেন তা অত্যন্ত করুণ :

"তোমরা বিচার কর—জনসাধারণ,
এ নহে সামান্য শাস্তি,
এ ভাই যৎপরোনাস্তি,
ফাঁসির পরেই এই চির-নির্বাসন!
বিনা দোষে কেন তবে,
এ শাস্তি আমার হবে?
দরিদ্র দুর্বল আমি এই কি কারণ?...
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয় দেশ ছাড়া,...
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা!
তোমরা বিচার কর—কে হয় তাহারা!

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ ও সত্যের পক্ষাবলম্বন করার মনোবৃত্তি না থাকায় কবি ধিক্কৃত স্বরে কঠোর ভাষায় লিখলেন :

"বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?
বৃথা ও ইংরেজী শিক্ষা
বৃথা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা;
হৃদয়ে নাহিক মোট জ্ঞানের উদয়;
এই যে ভাওয়ালবাসী,
নিত্য অশ্রুজলে ভাসি,
অবিচারে ব্যভিচারে ভস্মীভূত হয়,
কে করে কাহার খোঁজ,
অসুরেরা রোজ রোজ,
কত যে কুলের বধূ চুলে ধরি লয়!

বাঙালী জাতির ভীরুতার প্রতি কটাক্ষপাত করে কবি লিখেছিলেন:

"রেলে কি জাহাজে গেলে,
কেহ তারে ঠেলে ফেলে,
নিলে তার মা বোনেরে চুপ করে রয়।
জুতা, লাথি, ঝাঁটা, বেতে,
এরা না কিছুতে চেতে,
অচেতন জড়ে কবে ব্যথা বোধ হয়
দেও তারে শত গালি,
দেও তারে চুন কালি,
বেহায়ার তাতে কিবা লোক লাজ ভয়!
বাঙালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়?"

বিবাহে পণপ্রথা প্রচলিত থাকায় আমাদের সমাজে মেয়েদের বিবাহটা একটা বিরাট সমস্যায় আচ্ছন্ন। এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে কবি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। কুমারী মেয়ের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন:

"বাবা!
থাকুক আমার বিয়ে
চাই না আমি এম. এ, বি. এ.
কিন্‌তে হয় যা টাকা দিয়ে
ছাগল গরুর মতন
যাদের ছেলের হাটে গিয়ে।
সোনার চেইন সোনার ঘড়ী
গর্ব যাদের গলায় পরি,
অমন পশু কিনো না গো
টাকা কড়ি দিয়ে।...
থাকুক আমার বিয়া,—
দড়ি আছে কলসী আছে, ডুবব কিংবা ঝুলব গাছে,
তুষ্ট সমাজ তুষ্ট হোক্ সে নারীর রক্ত পিয়া!
রাজপুতানার মেয়ের মতো, করব না হয় জহর ব্রত,
তারাও নারী মোরাও নারী, নারীর হৃদয় দিয়া!

আত্মবিস্মৃত পরাধীন দেশবাসীর চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য কবি গোবিন্দদাস আজীবন

চেষ্টা করে গিয়েছেন। মৃতপ্রায় বাঙালী জাতিকে জাগাবার জন্য তিনি যেমন নানা ধিক্কার পরিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন, আবার আশার বাণীও শুনিয়েছেন। তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি বাংলার জাতীয় জাগরণে এক সময় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

যদি হে আসিলে জগন্নাথ,
কিন্তু কেন রথ খালি, হে কৃষ্ণ হে বনমালী,
কোথা সে অর্জুন তব সাথ
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা বৃকোদর বীর
সহদেব কোথা সে নকুল,
আজিও অজ্ঞাত বাস, আজো বিরাটের দাস,
আজিও কি ভাঙ্গে নাই ভুল ?
কোথা বীর ধনঞ্জয়, রহিয়াছে এ সময়
কেন সে হয় না আগুসার,
ক্লীব কাপুরুষ বেশে, ঘৃণিত দাসত্ব ক্লেশে,
জীবন যাপিবে কত আর ?

"আমরা হরিহর" কবিতার মধ্যে কবি ভারতে নানাজাতি, নানা প্রদেশ, নানা ধর্ম থাকা সত্বেও যে সবাই ভারতীয় এবং ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ সেই কথা বলতে চেয়েছেন। সবাই এক জোট হয়ে কাজ করলে যে ভারতের উন্নতি সম্ভব সে কথাও তিনি বলেছেন।

"আমরা বঙ্গ আমরা আসাম,
হোক না মোদের সহস্র নাম,
আমরা সদিয়া সিন্ধু সেতু-রামেশ্বর।
আমরা নাগা আমরা গারো,
কেহই ত পর নহি কারো
খড়্গী বর্গী গুর্খা জাঠ আর পার্শী সওদাগর।...
কামার কুমার জোলা তাঁতী,
হাড়ি মুচি সকল জাতি ;
মুনি ঋষি গরীব দুঃখী রাজা রাজেশ্বর।...
ভাই ভগিনী ত্রিশ কোটি,
আমরা যদি জেগে উঠি,
আমার তুমি জন্মভূমি কার বা রাখ ডর ?

আয় রে আমরা ত্রিরিশ কোটি,
ভাই ভগিনী সবাই যুটি,
লভি আজ সে নূতন শক্তি—নূতন কলেবর!
আয় রে আমরা আগাগোড়া,
ভাঙ্গা ভারত লাগাই জোড়া,
আয় রে পূজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর।

জন্মভূমি ভারতবর্ষকে আমরা স্বদেশ বলে থাকি। কিন্তু পরাধীনতার জন্য স্বদেশের কোনো কিছুতেই যে আমাদের অধিকার নেই সেই কথা কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর রচিত 'স্বদেশ' কবিতার মধ্যে:

"স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে? এ দেশ তোমার নয়;—
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্মা ভরা চুনি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়?
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়!
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়,
আইন কানুনের কর্তা তারা, তাদের স্বার্থ সকল ধারা
রিজার্ভ করা সুখ সুবিধা তাদের ভারতময়,
তোমার বুকে মেরে ছুরি, ভরছে তাদের তেরজুরি,
তাদের চার্চে তাদের নাচে তাদের বলে ব্যয়;
এক-শ রকম টেক্স দিবা, ব্যয়ের বেলায় তোমরা কিবা
গাধার কাছে বাধার বল বাঘের করে ভয়?
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়।"

জাতীয়তার উদ্গাতা

অতুলপ্রসাদ সেন
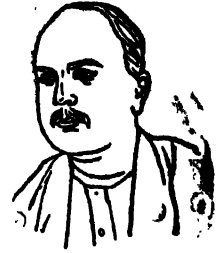
অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় ভক্তি-বিনম্র-সুরে যাঁরা দেশমাতৃকার বন্দনা গান গেয়ে দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন সুকবি অতুলপ্রসাদ সেন তাঁদের অন্যতম। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৭১ সালের ২৫শে অক্টোবর পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ঢাকা শহরে। এঁর পিতা ডাঃ রামপ্রসাদ সেন ঢাকা শহরের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক, ধর্মপ্রাণ ও সুবক্তা। আর ছিল তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রীতি। কবি অতুলপ্রসাদ পিতার এই সব গুণ পেয়েছিলেন। ১৮৯৪ সালে তিনি বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাস করে আসেন এবং লক্ষ্ণৌ শহরে ওকালতি করতে আরম্ভ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের দিকে বাংলার জাতীয় জীবনে যে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল, তা অতুলপ্রসাদের চিত্তকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে। মানবতা ও জাতীয়তার ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ মহাপ্রাণ অতুলপ্রসাদ রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা ও জনসেবামূলক নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। নতুন নতুন সুর সহযোগে এবং অতি সহজ সরল ভাষায় তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত সঙ্গীতগুলি ছিল অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর। তাঁর রচিত সঙ্গীতগুলিকে অনেক সময় রবীন্দ্র সঙ্গীত বলে ভুল হয়। তাঁর এই সৃষ্টি ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টিতে যখন বাংলাদেশ মুগ্ধ, তখনই অতুলপ্রসাদ বাঙালীর হৃদয় গভীরভাবে জয় করলেন। এতেই বোঝা যায় তাঁর রচনা কত শক্তিশালী ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ বলতেন, "অতুল অতুলনীয়"। তাঁর সাহিত্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে কবিগুরু স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ "পরিশেষ" কাব্যগ্রন্থ অতুলপ্রসাদকে উপহার দেন। "আশীর্বাদ" শীর্ষক উৎসর্গ পত্রের কয়েক পংক্তির উদ্‌ধৃতি উল্লেখযোগ্য :

"বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শতস্রোতে রস-বন্যাবেগে···
আজি পূর্ব বায়ে

বঙ্গের অম্বর হ'তে দিকে দিগন্তরে
সহস্র বর্ষণধারা গিয়াছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে ;
দিল বঙ্গ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।"

কবিগুরুর কথা অতীব সত্য। অতুল প্রসাদের 'জাগরণী সঙ্গীত'গুলি যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দেশবাসীর নিকট এগুলি জাতীয় মন্ত্রস্বরূপ। অনেক স্বদেশী সঙ্গীত সাময়িক উত্তেজনাপূর্ণ—পরাধীনতার তীব্র জ্বালায় পরিপূর্ণ। অতুলপ্রসাদের জাতীয় সঙ্গীতগুলি হঠাৎ কাউকে ক্ষেপিয়ে তোলে না। বরং দেশমাতৃকার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনমিত করায়। স্বদেশসেবার সংকল্পে জনচিত্তকে করে উদ্বোধিত। তাঁর স্বদেশী সংগীতগুলি ভারতবাসীর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণার দ্যোতক। ভাষার সরলতা, ভাবের গভীরতা ও সুরের মধুরতায় অতুলপ্রসাদের জাতীয় সঙ্গীতগুলি অনবদ্য। এগুলি অযথা কাউকে উত্তেজিত করে না। বরং উত্তেজনা প্রশমিত করে ধীরস্থিরভাবে দেশের অবস্থা অনুধাবন করতে শেখায়। তাঁর এই জাতীয় সঙ্গীতগুলি কোনো বিশেষ যুগের নয়। এগুলি সর্বযুগের এবং সকল ভারতবাসীর প্রেরণার বিষয়। যখন সমবেতকণ্ঠে গীত হয় :

"উঠ গো, ভারত-লক্ষ্মী! উঠ আদি জগত-জন-পূজ্যা!
দুঃখ-দৈন্য সব নাশি ; কর দূরিত ভারত-লজ্জা
ছাড় গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে!…
কাণ্ডারী নাহিক কমলা! দুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে,
তোমার অভয় পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।…
জননী দেহ তব পদে ভক্তি ;
দেহ নব আশা, দেহ নব শক্তি ;
এক সূত্রে কর বন্ধন আজ,
ত্রিংশতি কোটী দেশবাসী জনে।"

তখন কার না চিত্তে স্বদেশপ্রেমের শিহরণ জাগে? সুদীর্ঘ দিনের পরাধীনতার পাপে জাতি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। দৈন্য ও হতাশায় যখন জাতীয় জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন,

তখন সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ভারতের গৌরবময় অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কবি দেশবাসীকে শোনালেন :

"বল, বল, বল, সবে, শতবীণা-বেণু রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে।
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।...
ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা ;
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা ;
নানক, নিমাই করেছিল ভাই,
সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান,
ত্রিশকোটী দেহ হবে এক প্রাণ ;
এক জাতি প্রেম-বন্ধনে।...
মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজকুল জন্মেনি মিছে ;
দুদিনের তরে হীনতা সহিছে,
জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য
আসিবে আবার আসিবে।"

সকলের সুপরিচিত ভারতের বাণী-আত্মার অবলম্বনে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত অতি সহজ সরল সঙ্গীতটি ভারতবাসীর চিরকালের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণার প্রতীক।

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নত-শির,—নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ-জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান
সাথে আছে ভগবান,—হবে জয়।...
তেত্রিশ কোটী মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন ;
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন—
ঐ দেখ প্রভাত উদয়!

যে ভারতবর্ষ অতীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় উন্নতির উচ্চ শীর্ষে আরোহণ করেছিল, সে ভারতবর্ষ আজ কোথায়? কবে আবার তার সেই পূর্ব গৌরব ফিরে আসবে?—এইসব প্রশ্ন করে কবি লিখছেন:

"ভারত-ভানু কোথা লুকালে?
পুনঃ উদিবে কবে পূরব ভালে?
হা রে বিধাতা! সে দেব কান্তি
কালের গর্ভে কেন ডুবালে?
আছে অযোধ্যা—কোথা সে রাঘব!
আছে কুরুক্ষেত্র—কোথা সে পাণ্ডব!
আছে নবদ্বীপ—কোথা সে ভক্তি!
আছে তপোবন—কোথা সে তপোধন।
কোথা সে কালা কালিন্দী-কূলে
কোথা সে জাতি যাহারে বিশ্ব
পূজিত কালের প্রভাত কালে?"

জাতিভেদ প্রথাই ভারতের পরাধীনতাজনিত অধঃপতনের কারণ। কবি বলছেন যে এই শত শতাব্দীর অভিশপ্ত জাতিভেদ-প্রথা বিলুপ্ত হলেই জাতির দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন হবে।

"জাতির গলায় জাতের ফাঁস,
ধর্ম করছে সর্বনাশ,
নিজের পায়ে পর্‌লি পাশ,
দাসত্ব ঘোচে না তাই।
ছাড় দেখি রে রেশারেশি,
কর্ প্রাণে প্রাণে মেশামেশি,
তখন তোদের সব বিদেশী
দাস না ব'লে বল্‌বে ভাই।"

যে যুগে বাংলা না জানাকেই শিক্ষিত বাঙালীরা গৌরবের বিষয় বলে মনে করত, তখনই ইংরেজী শিক্ষিত বিলেত-ফেরত অতুলপ্রসাদ মাতৃভাষার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রত্যেক বাঙালী যাতে মাতৃভাষাকে ভালবাসে, সেজন্য তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিল না। তিনি 'উত্তরা' নামে একখানি পত্রিকার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টা ও প্রেরণার ফলে 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে'র জন্ম হয়। মাতৃভাষার

মাহাত্ম্য বর্ণনা করে তিনি এমন একটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যা প্রত্যেক বাঙালীর চিত্তকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলে। তিনি বুঝেছিলেন যে মাতৃভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকে মাতৃভূমির প্রতি পরিপূর্ণ অনুরাগ জন্মাতে পারে না। বাংলার জাতীয় জাগরণে অতুলপ্রসাদের দান অবিস্মরণীয় :

"মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালবাসা!...
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আনল মালা জগত জিনে!
তোমার চরণ-তীর্থে আজি
জগত করে যাওয়া-আসা
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে,
ডাকনু মায়ে 'মা, মা' ব'লে
ঐ ভাষাতেই বলব, হরি,
সাঙ্গ হ'লে-কাঁদা-হাসা।"

অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষাগুরু বিপ্লবী মহানায়ক অরবিন্দ ঘোষ

"লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে—আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্ত পানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, না স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি, এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে।···এই ভাব লইয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন।"

এই হল বিপ্লবী মহানায়ক অরবিন্দের স্বদেশ-ভাবনা। সমগ্র জাতিকে তিনি এই ভাবনায় ভাবিত ও অনুপ্রাণিত করে তুলেছিলেন। স্বদেশ তাঁর দৃষ্টিতে জড় পদার্থ নয়—জাগ্রত জীবন্ত দেবী, পরমারাধ্যা জননী। এইভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলেই তিনি দেশমাতৃকার বন্ধন-মোচনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

১৮৭২ সালের ১৫ই অগস্ট কলিকাতা মহানগরীতে অরবিন্দের জন্ম হয়। পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন সুচিকিৎসক। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। দেশের গরীব দুঃখীদের তিনি অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করতেন। পিতার এই স্বজাতিপ্রীতি পুত্র অরবিন্দের চরিত্রে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। আর এক মনীষীর প্রভাবও অরবিন্দের চরিত্রে অসাধারণ। ইনি হলেন অরবিন্দের মাতামহ, জাতীয়তার অগ্রদূত, স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্তক ঋষি রাজনারায়ণ বসু। সুশিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ডাঃ কৃষ্ণধন অরবিন্দ ও তাঁর দুই বড় ভাইকে বিলেতে রেখে আসেন। তখন অরবিন্দর বয়স মাত্র সাত বছর। সেখানে অধ্যয়নকালে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় তিনি যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি আই. সি. এস. (ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় গ্রীক ও লাতিন ভাষায় তিনি রেকর্ড নম্বর পান। কিন্তু অশ্বারোহণের পরীক্ষায় তিনি ইচ্ছা করেই উপস্থিত হন নি; কারণ, তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল যে তাঁকে দিয়ে মহৎ কর্ম সাধিত হবে।

বিলেতে বিদ্যার্থী জীবনেই অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তন হয়। পাশ্চাত্য দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজনীতি ইত্যাদি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতীয় দর্শন, পুরাণ, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় সভ্যতার বিশালতায় তাঁর তরুণ মন অভিভূত হয়ে পড়ল। মহিমময়ী মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর মস্তক অবনত হল। এই সময় তিনি পরাধীন ভারতের দুর্দশার কথা গভীরভাবে চিন্তা করতেন। বিলেতে স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা গঠিত 'ভারতীয় মজলিস' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা বিশ্বাস করতেন যে আবেদন নয়, বিপ্লবের মধ্য দিয়েই ভারতকে স্বাধীন করতে হবে। অরবিন্দ এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন। পরে তিনি এর সম্পাদকও হয়েছিলেন। তিনি এই মজলিসে কতকগুলি বিপ্লবী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তৎকালীন ভারতের নরমপন্থী নেতা দাদাভাই নৌরজী তখন বিলেতে ছিলেন। কিশোর অরবিন্দ নৌরজীর রাজনৈতিক মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বিলেতে অবস্থান কালের শেষের দিকে অরবিন্দ নিজের নামানুসারে "লোটাস এণ্ড ডাগার" (কমল ও কৃপাণ) নাম দিয়ে একটি বিপ্লবিক সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। এই সমিতির সভ্যদের এই বলে শপথ নিতে হত যে, বিদেশী শাসন-শৃঙ্খল থেকে যে যে-উপায়ে পারে দেশকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। ইহাই তাঁর পরবর্তীকালের বিপ্লবী জীবনের ভূমিকা বলা যেতে পারে।

বিলেতে বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের সঙ্গে অরবিন্দের আলাপ হয়। মহারাজ তাঁর চরিত্রে, প্রতিভায় ও মানবিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বরোদার সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত করে আনেন। এখানে নানা গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে ব্যাপৃত থেকেও জ্ঞানানুশীলনে তিনি বিরত ছিলেন না। বরোদায় বেশ মোটা টাকাই মাইনে পেতেন। খাওয়া-পরায় সামান্য টাকা ব্যয় করে বাকী সব টাকায় বই কিনতেন। এতেও কুলোত না। প্রায় প্রতি মাসে তাঁকে ঋণ করতে হত। বড় বড় প্যাকিং বাক্স ভর্তি হয়ে দেশ বিদেশের নানা বই আসত তাঁর কাছে। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক পুস্তকে তাঁর আবাস কক্ষটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মহারাজ তাঁর নির্মল চরিত্র ও জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। শীঘ্রই তিনি অরবিন্দকে রাজকার্য থেকে মুক্ত করে কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করলেন। এবার তিনি সর্বক্ষণ অধ্যয়নে নিমগ্ন হলেন। বিলেতে থাকার জন্য ভারতীয় কোনো ভাষা জানতেন না। এখন তিনি সংস্কৃত, বাংলা, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষা শিখলেন। তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে জীবনযাপন করতেন। তাঁর পরনে ছিল মোটা পাড়ের বিশ্রী ধুতি, গায়ে মোটা মেরজাই, আর

মাথায় লম্বা চুল। অধ্যয়ন ও স্বদেশ-ভাবনা ছাড়া আর কোনো দিকেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সংসারের কোনো কিছুর প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল না। এমন কি নিজের সম্বন্ধেও ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি বলতেন, "নিজের কথা যত কম প্রকাশ করা যায় ততই ভাল।" তাঁর বাংলা শিক্ষার সহায়ক সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় বলেছেন, "দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া কেহ যদি বলিত, 'ঐ হিমালয়' তাহাহইলেও বোধহয় ততদূর বিস্মিত ও হতাশ হইতাম না।"

অরবিন্দের বরোদার জীবন আত্মপ্রস্তুতি ও আত্মচেতনার জীবন। এখানে মাতৃভূমির শৃঙ্খল-মুক্তির উদগ্র কামানায় তিনি সর্বদিক থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন। বোম্বাই থেকে কে. জি. দেশপাণ্ডে 'ইন্দুপ্রকাশ' নামে একখানি রাজনীতিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। অরবিন্দ ঐ পত্রিকায় জাতীয়তা ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। তৎকালীন কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির তীব্র সমালোচনা করে তিনি লিখলেন, "কতকগুলি ইংরেজী শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিদের জন্যই এই নীতি। ইহাতে কোটি কোটি নিরন্ন, দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোকের কোনো উপকারই হইবে না। দেশে এখন এমন আন্দোলনের প্রয়োজন যাহাতে দরিদ্র জনসাধারণের উপকার হয় এবং সেই সঙ্গে শাসকবর্গের চৈতন্যোদয় হয়।" অপর এক প্রবন্ধে লিখলেন, "যে দেশের শাসনতন্ত্র দেশবাসীর সম্মতি লইয়া রচিত হয় নাই, সেই শাসনতন্ত্রের কাছে আবেদন, প্রার্থনা অথবা নিয়মানুগ আন্দোলন নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র।"

অরবিন্দের জীবনে স্বদেশ-ভাবনা সুদৃঢ় করণে বঙ্কিম সাহিত্য ও তাঁর 'বন্দে মাতরমে'র প্রভাব অপরিসীম। 'আনন্দমঠ' পাঠের পর 'বন্দেমাতরম্'কে তিনি প্রথম থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মহামন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। 'ইন্দুপ্রকাশে' 'বন্দেমাতরম্' ও 'ঋষি বঙ্কিম' সম্বন্ধে অনেকগুলি ভাবগম্ভীর মনোরম প্রবন্ধ লেখেন। 'বন্দেমাতরম্'কে শুধু শ্লোগান হিসেবে নয়, ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের বীজমন্ত্ররূপে যাতে সমগ্র ভারতবাসী গ্রহণ করে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি একাধিক প্রবন্ধে এর ব্যাখ্যা করেছিলেন। ভারতের তরুণদের নিকট 'বন্দেমাতরমে'র অভূতপূর্ব শক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, "যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেইদিন আমাদের হৃদয় মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিল, মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশমাতা, স্বদেশ ভগবান এই বেদান্ত শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুত্থানের বীজস্বরূপ।...মাতৃমূর্তি তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, তোমরা মাতৃপূজা ও মাতৃসেবা করিতে শিখিয়াছ। এখন অন্তর্নিহিত মাতাকে আত্মসমর্পণ করো—মা তোমাদিগকে যন্ত্র করিয়া এত সত্বর, এমন সবলে কার্য সম্পাদন করিবেন যে জগত স্তম্ভিত হইবে।"

বরোদায় অধ্যাপনার কাজ করার সঙ্গে সঙ্গেই অরবিন্দ ভারতের ভাবী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। মহারাষ্ট্র ও বাংলায় তাঁর গোপন রাজনৈতিক কার্য-কলাপ সুরু হয়। এই দুই প্রত্যন্ত প্রদেশে তাঁর অনুপ্রেরণায় জাতীয়তাবোধের পুনরুজ্জীবন দেখা দিল। মারাঠা কেশরী লোকমান্য তিলকের সঙ্গে তাঁর আদর্শগত গভীর সংযোগ ঘটল। তাঁদের উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় মহারাষ্ট্র ও বাংলা এক অভূতপূর্ব ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করল। অপরদিকে স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদীপ্তা মন্ত্রশিষ্যা নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের যোগসূত্র স্থাপিত হল। বাংলাদেশকেই অরবিন্দ তাঁর কর্মক্ষেত্র করা স্থির করলেন। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র আদর্শে তিনি 'ভবানী মন্দির' নামে পনের ষোল পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। শক্তিমূর্তি মা ভবানীর একটি স্তব দিয়ে গ্রন্থের আরম্ভ। বিপ্লবীদের নিকট ইহা ছিল উৎসাহের বিরাট উৎস। ভবানী মন্দির রচনার উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যুভয় দূর করা। গুপ্ত সমিতির সভ্যদের বিপ্লববাদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে মা ভবানীর নিকট আত্মসমর্পণ করে দীক্ষা নিয়ে মৃত্যুভয় অতিক্রম করতে হত। তৎকালীন বৃটিশ সরকার পুস্তিকাখানির প্রচার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তারা বলেছিল, "পুস্তিকাটি ধর্মীয় আদর্শকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিকৃতকরণের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।"

১৯০২ সালে অরবিন্দ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ও বরোদার মহারাজার দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলায় পাঠালেন বিপ্লবীদল গঠন করতে। তাঁদের সঙ্গে দিলেন কয়েকখানি করে ভবানীমন্দির। ফলে কলিকাতায় সুবিখ্যাত 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলার কোনো কোনো জেলায় এর শাখা সমিতি স্থাপিত হল। সবচেয়ে প্রশংসনীয় কাজ প্রদর্শন করল মেদিনীপুর। সেখানে 'যুবসংঘ', 'তরুণসংঘ', 'ভবানীমন্দির' প্রভৃতি নানা গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠল। অরবিন্দ বরোদায় থেকে এই সব সমিতির খোঁজ খবর রাখতেন এবং সুষ্ঠু পরিচালনার নির্দেশ দিতেন। মাঝে মাঝে নিজে বাংলায় এসে গুপ্ত সমিতিগুলির কার্যকলাপ পরিদর্শন করে যেতেন। একবার তিনি মেদিনীপুরে যান এবং নিজ হাতে বন্দুক ছুঁড়ে গুপ্ত সমিতির একটি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ঐ সময় বিখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর এক হাতে তলোয়ার আর অন্য হাতে গীতা দিয়ে স্বয়ং এই বলে দীক্ষা দিয়েছিলেন, "ভারতের অধীনতা মোচনের জন্য সব করবো। সমিতির তরফ থেকে যখন যা আদেশ আসবে, তা পালন করতেই হবে, নচেৎ মৃত্যুদণ্ড।" কালে আরও বহু বিপ্লবীকে অরবিন্দ এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করেছিলেন।

মাতৃভূমির মুক্তির কামনায় অরবিন্দ একদিকে যেমন গোপনে দেশকে সংগঠন করছিলেন, অপরদিকে নিজেকেও তৈরী করছিলেন সংসারের মায়ামোহ থেকে মুক্ত করতে। নানা কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকের জীবনই তিনি গড়ে তুলেছিলেন। এক কথায় সন্ন্যাসীর তপঃক্লিষ্ট জীবনই তিনি যাপন করতেন। জাতীয়তাই ছিল তাঁর ধর্ম। 'বন্দেমাতরমে'র ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর আদর্শ পুরুষ। এঁদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার চিন্তায় তিনি সর্বক্ষণ বিভোর হয়ে থাকতেন এবং বাংলা তথা ভারতকে এই ত্রয়ী মহামানবের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হবার আহ্বান জানাতেন। মাতৃভূমির মুক্তির উদগ্র কামনায় ভগবানের নিকট তাঁর অহর্নিশ একটি মাত্র সকাতর প্রার্থনা ছিল : "হে আমার পরম দেবতা, যদি তুমি থাকো, আমার মনের কথা জানতেও তোমার বাকী নেই। আমি তো নিজের জন্য কিছু চাইছি না—ধন, মান, পুত্র, পরিজন, যশ, ঐশ্বর্য। আমায় তুমি শক্তি দাও—এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করবার শক্তি।"

বাংলার জাতীয় জীবনে অভূতপূর্ব জনজাগরণ দেখে বিদেশী ইংরেজ শাসক ভীত হল। তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করে এই জাতীয় জাগরণের মূলে কুঠারাঘাত করতে চাইলেন। সাম্রাজ্যবাদী শয়তানের এই দুরভিসন্ধিকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য অরবিন্দ প্রস্তুত হতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু করার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। বঙ্গভঙ্গ বিল যাতে পাস না হয় সেই উদ্দেশ্যে জনমত গঠন করার জন্য ১৯০৫ সালে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে অরবিন্দ বরোদা থেকে বাংলায় এলেন। বহু সভাসমিতিতে নিনি বক্তৃতা দিলেন। ঘোষণা করলেন যে জনমতকে উপেক্ষা করে যদি ব্রিটিশ সরকার বাংলা ভাগ করে, তাহলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, অসহযোগ, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, সরকারী বিদ্যালয়সমূহ বর্জন এবং স্বদেশী গ্রহণ করতে হবে। আর বললেন যে সংগ্রামের মন্ত্র হবে 'বন্দেমাতরম্'।

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আইন পাস হয়ে গেলে সমগ্র বাংলাদেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। চারিদিক থেকে অরবিন্দের প্রস্তাবের পক্ষে জোর সমর্থন আসতে লাগল। ৭ই অগস্ট টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় তাঁর প্রস্তাবটি তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হল।

সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম সুরু হয়ে গেল। বাইরে চলল অসহযোগ, আর ভিতরে চলতে লাগল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অগ্নিসাধনা। অরবিন্দ বরোদা থেকে চিরতরে বাংলায় চলে এলেন। নব প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে'র তিনি হলেন অধ্যক্ষ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করা। ছাত্রেরা তাঁর

চরিত্রে, জ্ঞানে, স্বদেশপ্রেমে অভিভূত হল। তারা তাঁকে শুধু একজন আদর্শ অধ্যক্ষ হিসেবে নয়, পরাধীন দেশের নিপীড়িত জাতির জাগ্রত আত্মার মূর্ত প্রতীক হিসেবে ভক্তি করত। অরবিন্দই ভারতে ছাত্রজাগরণের প্রথম পুরোধা। ছাত্রদের সামনে দেশসেবার সুমহান্ আদর্শ তুলে ধরে তিনি বলতেন, "আমার অন্তরের একান্ত কামনা তোমাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকজন মহান হউক; কিন্তু তোমাদের নিজের জন্য নহে, তোমাদের অহঙ্কার তৃপ্ত করিবার জন্য নহে। মহান্ হও দেশমাতার জন্য, ভারতকে মহান্ করিবার জন্য, যাহাতে ভারত পৃথিবীর জাতিবর্গের মধ্যে উন্নত শিরে দাঁড়াইতে পারে—যেমন সে পুরাকালে ছিল, যখন জগৎ তাহার নিকট জ্ঞান ভিক্ষা করিত।... তোমরা জীবিকা অর্জন করিবে যাহাতে মার জন্য বাঁচিতে পার। তোমরা বিদেশে যাইবে, যাহাতে জ্ঞান আহরণ করিয়া মার সেবা করিতে পার। শ্রম করিবে যাহাতে মা সমৃদ্ধিশালিনী হন; ক্লেশ স্বীকার করিবে যাহাতে তিনি তৃপ্ত হন। যদি তোমাদের আমার প্রতি সহানুভূতি থাকে, আমি তাহা ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে চাহি না—আমি মনে করিতে চাহি, ইহা আমি যে আদর্শের জন্য কাজ করিতেছি তাহার প্রতি সহানুভূতি।"

কিছুদিন পরে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করে অরবিন্দ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগ দিলেন। এই সময়ে তাঁর প্রথম কীর্তি ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা প্রকাশ। এই পত্রিকায় এমন জ্বালাময়ী ভাষায় স্বরাজ ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন যে সমগ্র ভারতবর্ষ সহস্র বৎসরেরর সুপ্তি থেকে জেগে উঠে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। 'বন্দেমাতরমে'র বাণী দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমের বন্যায় ডুবিয়ে দিল। 'বন্দেমাতরমে'র ব্যাখ্যা করে অরবিন্দ লিখলেন, "প্রেম জীবন্ত হয়ে ওঠে যখন, তখন ভাগবত মহিমা দেশরূপ মাতৃমূর্তিতে প্রকাশিত হয়।"

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করে তিনি লিখেছিলেন, "ভারতের স্বাধীনতালাভ আমাদের জন্মগত অধিকার। এই আন্দোলনের পেছনে আছে ঈশ্বরের করুণাময় দিব্যশক্তি। সুতরাং এই আন্দোলনে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। কোনো অশুভ শক্তিই এর গতিরোধ করতে সমর্থ হবে না।"

রাজদ্রোহমূলক লেখার অভিযোগে অরবিন্দ বন্দী হলেন। 'বন্দেমাতরম্' বন্ধ হয়ে গেল। ফলে সমগ্র বাংলা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির চেতনাকে ভাষা দিয়ে অরবিন্দকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানালেন: "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।" প্রমাণাভাবে অরবিন্দ শীঘ্রই মুক্তি পেলেন। এবার তিনি আরও অধিক

উৎসাহে অত্যন্ত নির্ভীকভাবে ও স্পষ্টভাষায় জাতীয়তার বাণী প্রচার করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করে গঠন করার কাজেও তৎপর হলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের এক গোপন দল গঠিত হল। অরবিন্দ হলেন এই দলের গুরু, পরামর্শদাতা ও অধিনায়ক। ১৯০৮ সালের ১২ই এপ্রিল বারুইপুরের এক জনসভায় অরবিন্দ উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "ভগবান আমাদিগকে স্বাধীন করিবেন—এই কথা যখন আমরা বলিতে পারিব, তখন পৃথিবীতে এমন কোনো ক্ষমতা নাই যে আমাদিগকে পরশাসনের অধীন রাখিতে পারিবে।··· চলার পথে বাধা বিঘ্ন দেখিয়া শঙ্কিত হইও না—যত বড় বাধাই তোমার সম্মুখে থাকুক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তোমরা স্বাধীন হও ইহাই বিধাতার বিধান এবং তোমরা নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভ করিবে।"

এইভাবে অরবিন্দের তেজোদীপ্ত বক্তৃতাদির ফলে সমগ্র দেশ উদ্বেল হয়ে উঠল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি জাতিকে উন্মাদ করে তুলল। বিদেশী শাসকের বুঝতে বাকী রইল না যে কি স্বদেশী, কি সন্ত্রাসবাদী সব আন্দোলনের প্রেরণার উৎস অরবিন্দ। কিন্তু এতদিন তাঁকে শাস্তি দেওয়ার সুযোগ তারা করে উঠতে পারে নি। অবশেষে ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল কিংসফোর্ড সাহেবকে বোমার আঘাতে হত্যা করতে গিয়ে ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সমস্ত বিপ্লবী আড্ডায় পুলিস হানা দিয়ে বিপ্লবীদের কারারুদ্ধ করল। অরবিন্দও এই সূত্রে গ্রেপ্তার হলেন। আলীপুর কোর্টে অরবিন্দসহ সমস্ত বিপ্লবীদের মামলা চলে। ইহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'আলীপুর বোমা মামলা।' অরবিন্দকে করা হয়েছিল মামলার প্রধান আসামী। আদালতে অরবিন্দ তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন, "স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে আমি প্রধান অপরাধী। স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ যদি আইন বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি দোষী—একথা স্বীকার করি। আমি যাহা করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিব কেন? ইহারই জন্য আমি জীবনধারণ করিয়াছি। স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন। ইহাই যদি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়, তাহা হইলে আর সাক্ষী সাবুদের প্রয়োজন কি? আমি এখানে উপস্থিত এবং এ অভিযোগ আমি স্বীকার করিতেছি।···আমি মনে করি, আমাদের কাজ হইতেছে দেশবাসীকে বলা, তাহাদিগকে উপলব্ধি করানো যে পৃথিবীর জাতি-সমূহের মধ্যে ভারতের বিশিষ্ট দান আছে, ভারতের একটি মিশন আছে, সমগ্র মানবজাতির জন্য তাহা করিতে হইবে। ইহাই যদি আমার অপরাধ হয়, তাহা হইলে আপনাদের আইনে যে শাস্তি আছে তাহা আমাকে প্রদান করুন। আপনারা

আমায় কারারুদ্ধ করিতে পারেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু আমার এই অপরাধ আমি কিছুতেই অস্বীকার করিব না। আমি অকুণ্ঠভাবেই বলিতে চাই—স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা আইনের কোন ধারাতেই অপরাধ নয়।" এমন নির্ভীক জবানবন্দী ভারতের রাজনীতিক মামলার ইতিহাসে খুবই কম।

অরবিন্দের এই বিখ্যাত মামলা পরিচালনা করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ইংরেজ সরকার অরবিন্দকে দোষী সাব্যস্ত করবার জন্য নানা ফন্দিফিকির অবলম্বন করেছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের অপূর্ব প্রতিভাবলে তাদের সমস্ত দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হয়। ১৯০৯ সালের ৬ই মে প্রায় এক বছর পরে অরবিন্দ বেকসুর মুক্তিলাভ করেন। মামলার শেষদিনের বক্তৃতায় চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বলেছিলেন: "আমি আজ শুধু এই কথাই আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই যে, একদিন যখন আজকের এই বাদানুবাদ, আজকের এই দ্বন্দ্ব, এই উত্তেজনা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, একদিন যখন আজ যিনি অভিযুক্ত হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আর অপরাধী বেশে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, সেদিন লোকে দেশপ্রেমের কবি বলেই এঁর নাম কীর্তন করবে, সেদিন লোকে এঁর স্মৃতির পদতলে অর্ঘ্য নিয়ে আসবে দেশাত্ম-বোধের ঋষি বলে, সেদিন এঁরই বাণী ভারতবর্ষের সমুদ্রতট উল্লম্ফন করে দেশান্তরে নব নব মানবের হৃদয়ের নিত্য প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলবে।"

এরপর অরবিন্দের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল হয়ে উঠে। রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে থাকেন। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষই পরবর্তীকালের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর জীবনধারা ভিন্ন পথে পরিচালিত হলেও জাতীয়তার যে বিরাট ঐতিহ্য তিনি রেখে গিয়েছেন তা চিরকাল বাংলা তথা ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করবে।

জাতীয়তার চারণকবি মুকুন্দ দাস

জাতীয়তা তথা স্বাধীনতার গান গেয়ে যাঁরা বাংলার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত উপেক্ষিত, অবহেলিত সুপ্তিমগ্ন অজ্ঞ জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, চারণকবি মুকুন্দ দাস তাঁদের অন্যতম। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার বানারিগ্রামে বাংলা ১২৮৫ সালে মুকুন্দ দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর দে বা 'যজ্ঞা'। পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা দেশসেবক অশ্বিনীকুমার দত্তের সংস্পর্শে এসে মুকুন্দ দাসের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার হয়। তাঁর স্বাভাবিক কবি প্রতিভা ছিল। তাছাড়া, গান গাইবার এবং যাত্রাভিনয় করবার ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসাধারণ। অশ্বিনীকুমারের প্রেরণায় মুকুন্দ দাস স্থির করেন যে তিনি দেশাত্মবোধক গান গেয়ে এবং যাত্রাভিনয় করে দেশের আপামর জনসাধারণকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলবেন। তাঁর প্রথম প্রকাশ্য যাত্রাভিনয় 'মাতৃপূজা'। তৎকালীন বিদেশী ইংরেজ সরকার তাঁর কয়েকটি গানের মধ্যে রাজদ্রোহমূলক পঙ্‌ক্তি আবিষ্কার করেন এবং ঐসব গানের মাধ্যমে জনজাগরণের আশঙ্কায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। বিচারে তাঁর আড়াই বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কারাগারে তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ—ঘানিটানার কাজ দেওয়া হয়। কারাগারের নানা নির্যাতনের মধ্যেই তিনি তাঁর পত্নীবিয়োগের সংবাদ পান। কিন্তু দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ পূজারী মুকুন্দ দাস এতে ভেঙে পড়েন নি বা সংকল্পচ্যুত হন নি। জেল থেকে বার হয়েই শিশুপুত্র ও বালিকা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে আবার স্বদেশী যাত্রাগানে মনোনিবেশ করেন। স্বদেশী করাকে তিনি তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মুকুন্দ দাস ছিলেন কালীর সাধক। বরিশালের উপকণ্ঠে এক কালী মন্দিরকে অবলম্বন করে তাঁর দেশপ্রেমের সকল সাধনা, সকল স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। জাতীয় জীবনে গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য তিনি 'আনন্দময়ী আশ্রম' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি স্বদেশী ভাবধারায় 'সমাজ', 'পল্লীসেবা', 'ব্রহ্মচারিণী', 'কর্মক্ষেত্র' প্রভৃতি যাত্রা-নাটকের বই প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর এইসব যাত্রা এবং 'মাতৃপূজা', 'পথ', 'সাথী' প্রভৃতির অভিনয় সারা বাংলাদেশে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর গান গাওয়া ও অভিনয় নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। মুকুন্দ দাসের অসাধারণ যাত্রাভিনয়ের কথা তখন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে অতি উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে ব্যক্ত হত। কোথাও মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা হবে শুনলে বহু দূরদূরান্ত থেকে পায়ে হেটে লোকে তাঁর যাত্রা শুনতে যেত। সত্যি কথা বলতে কি তিনি তাঁর দেশপ্রেমের

নিষ্ঠা ও সুঅভিনয়ের দ্বারা বাঙালীর হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। বড় বড় রথী মহারথী দেশনায়কদের সমগ্র অগ্নিময়ী বক্তৃতায় যা না কাজ হত মুকুন্দ দাসের এক রাত্রির অভিনয়ে তার চেয়ে ঢের বেশী স্বদেশীভাব প্রচার হত। বাংলাদেশের পল্লীর সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাবার জন্য মুকুন্দ দাসের দান অতুলনীয়। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি জাতীয়তার মহান্ মন্ত্র অবিশ্রান্তভাবে প্রচার করে গিয়েছেন। সদলবলে যাত্রাভিনয় করতে করতে তিনি ১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসে একদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ইহলোক ত্যাগ করেন।

মুকুন্দ দাসের রচনাগুলির অধিকাংশই সব সমাজ-সংস্কারমূলক। স্বদেশপ্রেমিক চারণ কবি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে চরম অধঃপতন দেখে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে মানুষের স্বার্থপরতা, নীচতা কবি চিত্তকে বেদনাহত করে তুলে। এই প্রসঙ্গে সমাজ নাটকের একটি গান বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

ভাইরে, মানুষ নাই এদেশে !
এ দেশের সকল মেকি, সকল ফাঁকি ;
যে যার মজে আপন রসে।

দেখছি কত সব মস্ত,
আপন নিয়েই ব্যস্ত।
আর মুখখানা বড় মিষ্ট,
তার অন্তর ভরা বিষে।
কথার বেলায় বৃহস্পতি,
কাজে কেউ না ঘেঁষে।
বলতে গেলে এসব কথা—
ওঠে, পাগল ব'লে, হেসে।

স্বার্থ ছাড়া কথা কয় না,
অর্থ ছাড়া কাজ করে না,
দেখতে শুনতে রকমটি বেশ,
চেনবার জো নেই বেশে।
যে দেশ সকল দেশের সেরা,
সে দেশের এমনি ধারা !
দেখে শুনে ইচ্ছা হয়,
চলে যাই বিদেশে।

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে জাতীয় জীবনে নবজাগরণের জোয়ার এসেছে। শতাব্দীর সুপ্তি থেকে ভারত জাগছে। সে আজ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত। কবির কামনা—ভারত আবার গুরুর আসনে সমাসীন হবে :

এসেছে ভারতের নব জাগরণ, পেয়েছে ভারত নূতন প্রাণ।
মাতৃমন্ত্রে লয়েছে দীক্ষা, জগতে শিক্ষা করিবে দান।
স্তম্ভিত করি' বিশ্ব-মানবে,
শিষ্য করিবে জগতখান্।
কহিছে সে আজ পূর্ণ বারতা, শোনরে সকলে পাতিয়া কান।

জাতির নব জাগরণের ক্ষণে আর ঘুমিয়ে না থেকে জীবন মরণ পণ করে স্বরাজ-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন কবি স্বদেশবাসীকে :

বান এসেছে মরা গাঙে,
খুলতে হবে নাও।
তোমরা এখনো ঘুমাও॥
কত যুগ গেছে কেটে, দেখেছ কত স্বপন
এবার বদর্ বলে ধর বৈঠা, জীবনমরণ পণ।...

তাই কবি আরও বললেন :

জাগতে হবে, উঠতে হবে,
লাগতে হবে কাজে,
জগত মাঝে কেউ বসে নেই ;
মোদের কি ঘুম সাজে।...
যাদের মা উপবাসী,
তাদের মুখে রঙ্গ হাসি,
দেখে মুকুন্দ মরে যায় আজ
ঘৃণা অভিমান লাজে।

কবি বলছেন মাতৃভূমির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত হাসি খেলায় অলস আবেশে সময় অতিবাহিত করা চলে না।—

হাসিতে খেলিতে আসি নি এ জগতে,
করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধনা।
দেখাতে হবে আজি জগতবাসী সবে,
এখনো ভারতের যায় নি রে চেতনা।
গভীর ওঙ্কারে হুঙ্কারি দে রে ডাক,
শিহরি উঠুক্ বিশ্ব, মেদিনীটা ফেটে যাক্।
আমাদের জন্মভূমি দেবতার লীলাভূমি,
দেবগণ আসুক নেমে, পূর্ণ হোক বাসনা।
সার্থক হবে তবে এ জনম সবাকার,
ছেলের গৌরবে হবে গরবিনী মা আমার।
জগৎ লুটিবে পায়, ঘুচে যাবে যত দায়,
মিটে যাবে মুকুন্দের চিরদিনের কামনা!

এ বিশাল বিশ্বে সকলেই কর্মব্যস্ত। আমাদেরও আলস্যে সময় অতিবাহিত না করে কর্মে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। তাই কবি দেশবাসীকে আহ্বান করে বলছেন :

করমের যুগ এসেছে, সবাই কাজে যেতে গেছে,
মোরা শুধু রব কি শয়ান ?
রহিব সবার নীচে, চলিব সবার পিছে,
সহিব শত অপমান !
নিজেরে ভেবো না হীন, ধনী, মানী, দুখী, দীন ;
রাজা-প্রজা সকলি সমান।
সে সুরে সুর মিলাইয়ে করম-পতাকা লয়ে,
দলে দলে হও আগুয়ান।
দ্বেষ-হিংসা পায়ে দলে, আয় ছুটে আয় চলে,
চল্লিশ কোটি হিন্দু-মুসলমান।
তরী বুঝি ছেড়ে যায়, ঘাটে আর খেয়া নাই,
'ভয় নাই', মাঝি ভগবান।
তোদের পূর্ব-পুরুষগণে একদিন এই ভুবনে,
উড়ায়েছিল বিজয়-নিশান।
তাঁহাদের সন্তান তোরা, জগতে নাই তোদের জোড়া,
মাতাজী তাই তোদের পূজা চান।

মাতৃভূমির মুক্তি-সংগ্রামে কবি দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন :

'বন্দেমাতরম' বলে,
নাচরে সকলে, কৃপাণ লইয়ে হাতে।
দেখুক্ বিদেশী, হাস' অট্টহাসি ;
কাঁপুক মেদিনী ভীম-পদাঘাতে !
হও আগুয়ান, ভয় কি রে তোর !
বিজয়-পতাকা তুলে নিয়ে হাতে।

শত্রু-নিধনে কবি সকলকে মৃত্যু-ভয় তুচ্ছ করে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করছেন :

ভয় কি মরণে ? রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর-রঙ্গে।
তাথৈ তাথৈ থৈ, দ্রিমি দ্রিমি দ্রম্ দ্রম্—
ভূত-পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।

দানব-দলনী হয় উন্মাদিনী !
আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে ?
সাজরে সন্তান, হিন্দু-মুসলমান,
থাকে থাকিবে প্রাণ, না হয় যাইবে প্রাণ ;
লইয়ে কৃপাণ, হওরে আগুয়ান,
নিতে হয়-মুকুন্দেরে নিয়ো গো সঙ্গে।

পুণ্য মুক্তি-আহবে অংশ গ্রহণ করতে কবি মুকুন্দ দাস বাঙালীকে বিশেষভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, ভেতো ও ভীতু বলে বাঙালী জাতির যে অপবাদ আছে তা দূর হবে। এবং স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলনে বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হবে—এ ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

আয়রে বাঙালী, আয় সেজে আয়,
আয় লেগে যাই দেশের কাজে।
দেখাই জগতে, নহে ভীত বাঙালী,
দাঁড়াইতে জানে বীর সমাজে।
কোটি কণ্ঠে আজ 'জয় মা' বলিয়া,
দ্বেষ-হিংসা আজি চরণে দলিয়া,
দাঁড়া রে বাঙালী আপন ভুলিয়া,
সাজাই বাঙলা নূতন সাজে।
মাভৈঃ, ওঠ্ রে, ও বাঙালী বীর !
কত কাল র'বি নত করি শির !
শুনেছি রে 'জয় বাঙালী জাতির'
অনাহত শব্দভেরীর মাঝে।

কবি স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিকদের জোর কদমে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে বলছেন :

চল্ রে চল্ রে চল্
করমের নিশান উড়ায়ে চল্।
বাজে 'মা' নামের ভেরী,
ধরা হোক্ রে টলমল্।

বসে কি ভাবিস্ তোরা ?
ডাকছে মা, দিসনে সাড়া !
তোরা কি জ্যান্তে মরা
হ'লিরে সকল।
দেবতা ঐ মাথার 'পরে,
অভয় দিচ্ছে অভয়-করে।
যায় যদি প্রাণ দেশের তরে,
পাবি মোক্ষ-ফল।

শিক্ষিত বেকার যুবকদের তিনি শ্রমমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অনুপ্রাণিত করেছেন :

বি. এ, এম. এ, পাস করে, চাকরি যদি নাহি মিলে,
কিসের ভাবনা করিস রে ভাই, মিশে যা না চাষার দলে।
শক্ত ক'রে লাঙ্গল ধর্, খেটে-খুটে খামার ভর্ ;
দুদিন পরে দেখতে পাবি, ঘুচে গেছে হাহাকার।

স্বরাজলাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে চারণ-কবি ভবিষ্যৎ বাণী করলেন :

স্বরাজ সেদিন মিলিবে যেদিন
চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ,
তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে
সপ্তমে তোরা তুলিবি তান।

তাছাড়া, কবি আরও গাইলেন :

কামার, কুমার, চামার, মুচি,
তারাই কাজের, তারাই শুচি।
ধর জড়িয়ে গলা তাদের,
আজ ভুলে আপন-পর।

জাতির শক্তির উৎস মাতৃজাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য কবি দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করলেন। তিনি বললেন যে ভারতের নারীশক্তি জাগলে দেশে বীর সন্তানের অভাব হবে না।

মায়ের জাতি জাগিয়ে তোল।
সকল কাজের ঐ ত গোড়া,
আজ ভেঙ্গে দে রে তাদের গোল॥ ··

মায়ের জাতি উঠলে গড়ে
ছেলে মিলবে ঘরে ঘরে,
বাজবে আবার বিজয় ভেরী,
জয় ডঙ্কা সানাই ঢোল ॥

মাতৃজাতিকে আহ্বান জানিয়ে কবি গাইলেন :

জাগাও সকলে আজি, নিদ্রিতা শকতি—
তোমাদেরই হাতে, মাগো, ভারতের মুকতি।
শিখাও সন্তানে মাতৃ-ভকতি,
করম-মন্ত্রে দীক্ষিত কর সবে
বীর-সাজে সাজিয়ে দে সন্তানগণে—
অবহেলে তারা জয়ী হোক্ রণে ;
অর্ঘ্য দিতে মাতৃ-চরণে
সমবেত হোক সবে 'ব্যোম্ ব্যোম্ হর' রবে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় মুকুন্দ দাসের গানে দেশের নারীসমাজ অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছিলেন। যখন কোনো সভা-সমিতিতে কবি গাইতেন :

ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী ;
কভু হাতে আর পরো না
জাগ গো ও জননী, ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না ॥

অমনি সঙ্গে সঙ্গে সভায় উপস্থিত সমস্ত মহিলা হাতে হাত ঠুকে বিদেশী চুড়ি ভেঙে ফেলতেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হত। কখনো বা কবি কিঞ্চিৎ আশাহত হয়ে গাইতেন :

ডাকবো কি শুনবে কিরে
আছে কি কারো কান ?
পাবো কি এমন ছেলে
দেশের লাগি কাঁদে প্রাণ ॥

ভারতবাসীকে স্বাধিকার-সচেতন করিয়ে কবি গাইলেন :

মুকুন্দ বলে, "ওগো ভারতবাসী, শোন গো আজ—
তোমরা পার না কি ধরিতে বীরের সাজ ?
দেখাতে পার না কি, বোঝাতে পার না কি,
ভারত-মাঝে ভারতবাসীর কতটুকু অধিকার ?"

এইভাবে জাতীয়তার চারণকবি মুকুন্দ দাস স্বরচিত অজস্র গানে ও অভিনয়ে সমগ্র বাঙালী জাতিকে স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তার ভাবধারায় মাতিয়ে তুলেছিলেন। বাংলার জাতীয় জাগরণে মুকুন্দ দাসের অবদান অসামান্য।

স্বাধীনতার আপোষহীন সংগ্রামী সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র

স্বাধীনতা যুদ্ধের আপোষহীন অবিরাম সংগ্রামী সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মহান্ ভারতীয় জাতির নব জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক। তিনি ছিলেন জাতির সর্বপ্রকার দুর্বলতা ও অক্ষমতার বহু উর্ধ্বে। আপোষমূলক কোনো নির্বীর্য পন্থায় ভারতের স্বাধীনতা আসতে পারে এমন দুর্বল কল্পনা কখনো তাঁর মনে স্থান পায় নি। তিনি ছিলেন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের পক্ষপাতী।

১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক শহরে সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতা জানকীনাথ বসু ছিলেন কটকের খ্যাতনামা উকিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান্, বিদ্যোৎসাহী ও তেজস্বী পুরুষ। সরকারী উকিল হলেও তিনি সরকারের কোনো অন্যায় কার্যের সমর্থন করতেন না। আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি বিদেশী সরকারের দমন-নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে "রায়বাহাদুর" উপাধি বর্জন করেছিলেন। মাতা প্রভাবতী দেবী ছিলেন আদর্শ হিন্দু রমণী। দীন-দরিদ্রের দুঃখ দুর্দশায় তাঁর সুকোমল মাতৃ-হৃদয় বিগলিত হত। তাদের দুঃখ মোচনের জন্য তিনি সর্বদাই মুক্ত হস্তে দান করতেন। পিতার বিদ্যানুরাগিতা ও নির্ভীকতা এবং মাতার পরদুঃখকাতরতা সুভাষচন্দ্রের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। বসুপরিবারের আদি নিবাস ছিল চব্বিশ-পরগনা জেলার কোদালিয়া গ্রামে। আইন ব্যবসায়ের জন্য জানকীনাথ বাংলাদেশ ছেড়ে কটক গিয়ে বসবাস করেন।

একটা কথা প্রচলিত আছে যে "বাড়ন্ত মূলো পত্রে চেনা যায়" অথবা "সূর্যোদয় দেখে জানা যায় দিন কেমন যাবে।" সুভাষচন্দ্রের কিশোর জীবনেই স্বদেশী ভাব ও সেবাবৃত্তি এমন স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছিল যে সেই কিশোর সুভাষের মধ্যেই পরবর্তীকালের স্বাধীনতার বাণীমূর্তি মানবপ্রেমিক সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের সম্ভাবনা নিহিত ছিল। ছোটবেলা স্কুল পড়ার সময় তিনি সাহেবী পোশাক কোট, প্যান্ট পরে স্কুলে যেতেন। কিন্তু কিছু দিন ধরে লক্ষ্য করলেন যে তিনি ছাড়া আর সব ছেলে এবং শিক্ষকমশাইরা

ধুতি, জামা পরে স্কুলে আসেন। তখন তিনি বুঝলেন যে ধুতি জামাই এদেশের লোকের জাতীয় পোশাক। তারপর থেকে তিনি কোট, প্যান্ট ছেড়ে ধুতি, জামা পরে স্কুলে যেতে লাগলেন। একদিন জানকীবাবু সুভাষচন্দ্রকে হঠাৎ ধুতি জামা পরার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি নির্ভীকভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, "এই তো আমাদের জাতীয় পোশাক। সব ছেলেই তো এই পোশাকে স্কুলে যায়?" আমি কেন সাহেবী পোশাক পরে স্কুলে যাব?"

ছাত্র জীবনেই সুভাষচন্দ্র দীন-দরিদ্রের দুঃখ-মোচন, আর্তের পরিত্রাণ এবং নিঃসহায় রোগীর শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করে আনন্দ পেতেন। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে অসহায়কে সাহায্য করা এবং বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্তদের পরিচর্যা করার একাধিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁর সেই সব সেবার আদর্শ তাঁর সমসাময়িক সহপাঠী বন্ধু ও অন্যান্য ছাত্রসমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের আদর্শ ছাত্র।

সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনে তিনটি মহান্ আদর্শ প্রবল আকার ধারণ করে। প্রথম ও প্রধান আদর্শ হল বিদ্যাভ্যাস দ্বারা জীবন গঠন করা, বড় হওয়া, খ্যাতিলাভ করা। দ্বিতীয় হল ধর্মচর্চা—ধ্যান ধারণার দ্বারা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করা। আর তৃতীয় আদর্শ হল দেশ ও দশের সেবা করা, দরিদ্র দেশবাসীর দুঃখ দূর করা, পরাধীন মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা। সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের প্রথম দীক্ষাগুরু ছিলেন কটক র‍্যাভেন্স কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস। সবদিক থেকে আদর্শ শিক্ষক বেণীমাধবের চরিত্রের প্রভাব ছিল সুভাষচন্দ্রের উপর অপরিসীম। সুভাষচন্দ্রের নিজের ভাষায়, "শিক্ষকদের মধ্যে একজনই মাত্র আমার মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। তিনি হলেন আমাদের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস। প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ...মনে মনে ভাবতাম, মানুষের মতো মানুষ হতে হলে ওঁর আদর্শেই নিজেকে গড়তে হবে।"

সুভাষচন্দ্রের পরিচালনাধীনে র‍্যাভেন্স স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা একবার বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ফাঁসির দ্বিতীয় বার্ষিকী দিবস পালন করেন। ঐ পুণ্য দিনটি তাঁরা না খেয়ে কাটিয়েছিলেন। স্কুলের পড়ার সময় সুভাষচন্দ্র খবরের কাগজ থেকে বিপ্লবীদের ছবি কেটে তাঁর পড়ার ঘরে টাঙিয়ে রাখতেন। এ সব তাঁর দেশপ্রেমেরই সুস্পষ্ট লক্ষণ। স্বদেশসেবামূলক নানা কাজে লিপ্ত থেকেও তীক্ষ্ণধী সুভাষচন্দ্র ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। মাত্র দু'নম্বরের জন্য তিনি প্রথম হতে পারেন নি। এর পর তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময়

তিনি ধর্মালোচনা ও জনসেবার কাজে রত হন। মির্জাপুর স্ট্রীটে বিপ্লবীদের আড্ডা ছিল। ঐ আড্ডার সভ্যদের আদর্শ ছিল আজীবন চিরকুমার থেকে দেশের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করা। সুভাষচন্দ্রও ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় তাঁর মনে ধর্মজিজ্ঞাসা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে। ঐ সময় তিনি গুরুর সন্ধানে পশ্চিম ভারতের বহু তীর্থ পর্যটন করেন। কিন্তু নিরাশ হয়ে তাঁকে বাড়ী ফিরতে হয়। অবশেষে রামকৃষ্ণ আশ্রমে মিশে এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়ে তিনি জীবনের আদর্শ স্থির করেন। সুভাষচন্দ্রের নিজের কথায়, "...দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম।.. তাঁর লেখা থেকেই তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি হৃদয়ঙ্গম্ করতে পেরেছিলাম।...মানব জাতির সেবা এবং আত্মার মুক্তি—এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ।...বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনের আমূল পরিবর্তন এনে দিল।...চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন আদর্শ পুরুষ।" বিবেকানন্দের বাণী থেকেই তিনি দেশ ও জাতির মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গের প্রেরণা পেয়েছিলেন।

দিনে দিনে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে জাতীয় মর্যাদাবোধ অত্যন্ত প্রবল হতে থাকে। তিনি যখন বি. এ. পড়েন, তখন ওটেন নামে এক সাহেব ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক সময় আপত্তিজনক মন্তব্য করতেন। একবার বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি "ভারতবাসীরা বর্বর" বলে ফেললেন। সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওটেনকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করান। কিন্তু তাতেও তাঁর ঔদ্ধত্য না কমায় সুভাষচন্দ্র তাঁকে চপেটাঘাতে ধরাশায়ী করে স্বদেশের অবমাননার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেন। এইখানেই সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ সংগ্রামী জীবনের আভাষ নিহিত।

ওটেন সাহেবকে প্রহার করার জন্য সুভাষচন্দ্র কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়ে কটকে চলে গেলেন। এবং সেখানে জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। সহপাঠী ও বন্ধুদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জনকে বেছে নিয়ে তা'দের স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁদের দলের প্রধান কাজ ছিল রোগীর শুশ্রূষা এবং বাড়ী বাড়ী থেকে অর্থ সংগ্রহ করে গরীবদের সাহায্য করা। সুভাষচন্দ্র তাঁর দলকে নিয়ে নানা স্বদেশী গান গাইতে গাইতে প্রত্যেক দিন ভোরে কটক শহরের রাস্তায় প্যারেড করে বেড়াতেন। কটকের বহু ছাত্র সুভাষচন্দ্রের আদর্শে জেগে উঠেছিল। কিছুদিন পরে কলকাতায় ফিরে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষের চেষ্টায় তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। এই সময় তিনি 'ভারতরক্ষা বাহিনীর ইউনিভারসিটি ইউনিটে' ভর্তি হয়ে সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা,

নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে শিবির জীবন যাপন করতেন। বন্দুক চালনা, কুচকাওয়াজ প্রভৃতি সৈনিক শিক্ষার সব কিছুতেই সুভাষচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। নিষ্ঠার সঙ্গে অর্জিত এই সামরিক শিক্ষার বলেই পরবর্তীকালে তিনি আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গঠন করে তার সুযোগ্য সর্বাধিনায়ক হতে পেরেছিলেন।

দর্শন শাস্ত্রের অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সুভাষচন্দ্র বি. এ. পাস করেন। তারপর আই. সি. এস. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পিতা জানকীনাথ তাঁকে বিলেতে পাঠালেন। বিলেতে থাকাকালে তাঁর আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত সংযত। অন্যান্য ছাত্ররা যখন হাল্কা হাস্য-পরিহাসে বৃথা সময় অতিবাহিত করত, তখন দেখা যেত স্বল্পবাক্ গম্ভীর মূর্তি সুভাষচন্দ্র কোনো গুরুত্বপূর্ণ চিন্তায় বা অধ্যয়নে গভীরভাবে নিমগ্ন রয়েছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "আমাদের এমন ব্যবহার করতে হবে, যাতে তারা (ইংরেজরা) প্রত্যেক কথায় বুঝতে পারে, আমরা ওদের চেয়ে ঢের বড়, ঢের বেশী সভ্য।" সেজন্য তিনি একান্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে চালাতেন, যেন কোনো অন্যায় কোনো ভুল না হয়, কোনো ভব্যতার ব্যতিক্রম না ঘটে। তিনি জানতেন যে কোনো ব্যক্তি বা জাতি যদি তার গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদা বজায় রাখে, তবে তাকে অসম্মান করতে কেউ সাহস পায় না। মাতৃভূমির মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রয়াসের অন্ত ছিল না। রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা এবং নানা বিষয়ে অধ্যয়নে ব্যাপৃত থেকেও মাত্র আট মাস পড়ে আই. সি. এস. পরীক্ষায় সুভাষচন্দ্র চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ইহা তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। এবার তাঁর ইংরেজ সরকারের অধীনে একটি উচ্চ চাকরি পাওয়ার কথা। কিন্তু সোনার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে দাসত্ব করার জন্যই সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয় নি। সোনার বাংলায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, ভারত তথা বিশ্বের পরাধীন মানব জাতির মুক্তি সাধনার জন্য। বাল্যকাল থেকেই সুভাষচন্দ্র স্বপ্ন দেখেছিলেন বিশ্বমানবের সেবার ও মাতৃভূমির মুক্তির। কাজে কাজেই আই. সি. এস.-এর চাকরি গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। আত্মীয়-স্বজন এমনকি তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মণ্টেগুর অনুরোধ উপেক্ষা করেও তিনি ঐ পদে ইস্তফা দিলেন। এতদিনে তিনি যেন বিরাট বন্ধন থেকে মুক্তি পেলেন। আর সংকল্প নিলেন দেশ সেবার কঠিন ব্রতে।

১৯২১ সালে ভারতের মাটিতে পা দিয়েই সুভাষচন্দ্র ছুটলেন ভারতের জনগণ চিত্ত-অধিনায়ক অর্ধনগ্ন ফকির মহাত্মা গান্ধীর নিকট, যিনি তখন এদেশের বিজাতি বিদেশী শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছেন এক নতুন সংগ্রাম—অহিংসা অসহযোগ

আন্দোলন। মহাত্মাজী তাঁকে বাংলায় ফিরে গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নির্দেশক্রমে মাতৃভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে বললেন। সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতায় ফিরে এসে বাংলার নবজাগ্রত তরুণের রাজা চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁকে অসহযোগ-আন্দোলনের কর্মীদলের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। এবং সকল কাজে স্বীয় দক্ষিণ হস্তস্বরূপ বিবেচনা করতে লাগলেন। চিত্তরঞ্জনই হলেন সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু। সুভাষচন্দ্রের নিজের ভাষায়, "আত্মোৎসর্গের পবিত্র ও জীবন্ত বিগ্রহ প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চরণে দেশসেবায় আমার প্রথম শিক্ষা দীক্ষা। তাঁহার জীবদ্দশায় সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার পতাকা অনুসরণ করিয়াছি। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও তাঁহার মহিমময় জীবনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া একনিষ্ঠভাবে জীবনের পথে চলিব, এই সঙ্কল্প মনের মধ্যে পোষণ করি। সর্ব মঙ্গলময় ভগবান আমার সহায় হউন।" গুরুশিষ্যের অপরিহার্য সম্পর্ক সম্বন্ধে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন, "জুলাই-অগস্ট মাসে সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়াও বাঙালী জীবনের ইন্দ্রপদ পরিত্যাগ করিয়া সেবাব্রত লইয়া দেশবন্ধুর সঙ্গে মাতৃভূমির সেবাকল্পে আত্মোৎসর্গ করেন। এই অকৃত্রিম তেজস্বী ধীমান্ কর্মীটিকে পাইয়া দেশবন্ধুর আনন্দের অবধি ছিল না।...স্বরাজ-সাধনায় সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতা জাতীয় ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করিল।"

অসহযোগ আন্দোলনে দেশের বিদ্যায়তনগুলি বর্জিত হলে, তরুণদের শিক্ষার জন্য দেশবন্ধু 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করলেন। সুযোগ্য কর্মী সুভাষচন্দ্রকে করলেন তার অধ্যক্ষ। এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পাবলিসিটি অফিসার বা প্রচারাধ্যক্ষের কর্মভারও তাঁর উপর অর্পিত হল। সেবা কার্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হলে সুভাষচন্দ্র হলেন তার জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং বা অধ্যক্ষ। এই প্রথম তিনি সামরিক জীবনের মর্যাদা উপলব্ধি করেন।

১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ এলেন ভারত পরিদর্শনে। কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে হরতাল প্রতিপালিত হল ভারতের সর্বত্র। কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে হরতাল অভূতপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এই সম্পর্কে ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধুর সঙ্গেই বন্দী হলেন। ছ'মাস কারাবাসের পর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

চিত্তরঞ্জন 'ফরওয়ার্ড' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। সুভাষচন্দ্র হলেন তার সম্পাদক। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি পরিচালনা করেছিলেন উক্ত পত্রিকা। দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদল গঠনে সুভাষচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য দল কলকাতা

করপোরেশন অধিকার করলে দেশবন্ধু হন মেয়র এবং সুভাষচন্দ্র হন 'চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার'। এতে কলকাতা করপোরেশনের কর্ম-ব্যবস্থায় যুগান্তর সংসাধিত হয়। সুভাষচন্দ্রের কর্মনৈপুণ্যে করপোরেশনে এক নূতন জীবনের সঞ্চার হল। এতদিন ওখানে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাই ছিল প্রবল। এখন থেকে ওতে জাতীয় আদর্শ অনুপ্রবিষ্ট হল। করপোরেশনের প্রত্যেকটি কর্মচারী ও সভ্যকে বিদেশী পোশাক ত্যাগ করে জাতীয় পোশাক খদ্দর ধারণ করতে হল। করপোরেশনের অনেক পদে নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়োগ করা হতে লাগল। এছাড়া, সুভাষচন্দ্র মনোযোগ দিলেন জনসাধারণের কল্যাণের দিকে। নাগরিকদের জন্য তিনি বিনা খরচায় প্রাথমিক শিক্ষা ও ওষুধ-পথ্য পাওয়ার সুযোগ দান করলেন। কলকাতার রাস্তা-ঘাট অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা হল। পার্কগুলিকে মনোরম দৃশ্যে সজ্জিত করা হল। ঐ সময় কলকাতা এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছিল। আরও বহু জনকল্যাণ-মূলক কাজের পরিকল্পনা তাঁর ছিল। কিন্তু শীঘ্রই বিদেশী শাসকের বিষদৃষ্টি পড়ল তাঁর উপর। ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর তিনি বন্দী হলেন। এই প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন,

"গর্বিত ধনবানের হস্ত হইতে সমবেদনাময় সেবক-সম্প্রদায়ের হস্তেই করপোরেশন আসিয়া পড়িত, গরীবের সেবা হইত, মাছ দুগ্ধ খাইয়া কলিকাতার লোক বাঁচিত, বিষাক্ত তৈল ও ঘৃতের সহায়তায় ডিস্পেপ্সিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিত না, কিন্তু সব বিফল হইল। সুভাষচন্দ্র অমাত্য-তন্ত্রের কবলে নিপতিত হইলেন।"

বিনা বিচারে আটক করে সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে রাখা হয়েছিল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেখান থেকে তাঁকে বহরমপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তিনি ভারতের বাইরে ব্রহ্মের মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত হন। সেখানে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেই তাঁর দিন কাটে। কিন্তু মাতৃভূমির প্রতি তাঁর এমন প্রগাঢ় প্রেম ছিল যে মান্দালয় কারাবাসের যন্ত্রণাকে তিনি হাসিমুখে উড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর কোনো এক বন্ধুকে পত্রে লিখেছিলেন, "পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত করে যে জ্বালা বোধ হয়, সে জ্বালার মধ্যেও যে কোন সুখ পাওয়া যায় না, তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি, তাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসি বলে আজ আমি এখানে (কারাগারে), তাঁকে বাস্তবিকই ভালবাসি, এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয়, বন্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষত-বিক্ষত হলেও, তার মধ্যে সুখ আছে, শান্তি আছে, তৃপ্তি আছে।...এখানে না এলে বুঝতাম না সোনার বাংলাকে কত ভালবাসি।...কে আগে জানতো বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার

আকাশ, বাংলার বাতাস, এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।" আর একবার অন্য এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "প্রাতে কিম্বা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয়, মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়েকটি বঙ্গ-জননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্তত বলে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায়,

"তোমরই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা
বহিতে আমার সুখ।"

মান্দালয় জেলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাওয়ায় ইংরেজ সরকার তাঁকে ১৯২৭ সালের মে মাসে ছেড়ে দেন। এই মান্দালয় জেলেই তাঁর দেহে ক্ষয়-রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসকরা সুভাষচন্দ্রকে পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তখন দেশের এক অনিশ্চিত অবস্থা। সে অবস্থায় দেশের মুক্তি পাগল সুভাষচন্দ্রের পক্ষে বিশ্রাম গ্রহণ অসম্ভব ছিল। তিনি সেই অসুস্থ শরীরেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। ভারতের রাজনৈতিক দাবী কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ করার জন্য সাইমন কমিশন এল ভারতে। কংগ্রেস নির্দেশ দিলেন কমিশনকে বয়কট করবার। সুভাষচন্দ্র এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি বললেন, আবেদন নিবেদনের পালা অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন সংগ্রাম ঘোষণার প্রয়োজন। সবরমতী আশ্রমে গিয়ে মহাত্মাজীকে বললেন তাঁর মনের কথা। আর তাঁকে হতে বললেন সংগ্রামের অধিনায়ক। কিন্তু মহাত্মাজী রাজী হলেন না। তিনি বললেন, সংঘবদ্ধ সংগ্রামের জন্য দেশ প্রস্তুত নয়। ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এলেন সুভাষচন্দ্র। দেশের তরুণদের নিকট তিনি জানালেন তাঁর এই ক্ষোভের কথা। তীব্র সমালোচনা করলেন মহাত্মার সংগ্রাম-বিমুখতার। সেই দিন থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে দু'টি ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হল। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সংঘর্ষ। পুরাতন পন্থীরা চাইলেন নিয়মতান্ত্রিক পথে আপোষ নিষ্পত্তির দ্বারা রাজনৈতিক অধিকার আদায় করতে। আর নূতন দল চাইলেন সংগ্রামের পথে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে। প্রথম দলের নেতা গান্ধীজী আর দ্বিতীয় দলের নেতা হলেন সুভাষচন্দ্র।

১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে। এই সময় সুভাষচন্দ্র এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে তিনি স্বয়ং তার জি. ও. সি. হলেন। যথাযথ সামরিক কায়দায় অপূর্ব শৃঙ্খলার সঙ্গে কংগ্রেসের অধিবেশনের কাজে সহায়তা করে সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালনার যে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখালেন, তাতে সবাই বিমুগ্ধ হলেন।

এই কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রকাশ্য মতভেদ দেখা দিল। কারণ, অধিবেশনে উত্থাপিত গান্ধীজীর প্রস্তাব ছিল আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব—এক বছরের মধ্যে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র বজ্র-নির্ঘোষে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে। তিনি দাবী করলেন ব্রিটিশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক-রহিত পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের দাবী—এই প্রস্তাব ঘোষণা করা প্রয়োজন। তিনি বললেন,

"সুদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতার প্রার্থী আমরা নহি। ইহা আমাদের অবিলম্বে প্রাপ্য বস্তু।"

তিনি আরও বললেন,

"আপনারা সকলেই জানেন, দেশে জাতীয় আন্দোলনের উষাকাল হইতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা বলিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই বুঝিয়াছে—ডোমিনিয়ান্ স্টেটাস্‌কে কখনও স্বাধীনতা বলিয়া ব্যাখ্যা করে নাই।"

মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবদ্বয়ের ভোট গ্রহণ করা হল। ভোটে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব গৃহীত না হলেও তিনি হতোদ্যম হলেন না। তিনি তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করতে লাগলেন। সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে তিনি বক্তৃতা দিতে লাগলেন। বাংলা তথা ভারতের তরুণ সমাজ তাঁর আদর্শে বিশেষভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠল। ছাত্র সমাজের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। ভারতের মুক্তিযুদ্ধে দেশের শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ই উপযুক্ত সৈনিক হওয়ার যোগ্য বিবেচনা করে তিনি তরুণ ছাত্রসমাজের মধ্যে সংগঠনের কাজে লিপ্ত হন। স্বীয় শৌর্য, বীর্য এবং ভাষণ ও প্রবন্ধাদি রচনা দ্বারা তিনি তাদের জাতীয়তার মন্ত্রে ও মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেন। দেশমাতৃকার মুক্তি আহবে তিনি বাংলার তরুণদের উদাত্ত আহ্বান জানালেন,

"ওগো বাংলার যুবক সম্প্রদায়, স্বদেশ-সেবার পুণ্য যজ্ঞে আজি আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যে যেখানে যে অবস্থার আছ, ছুটে এসো। চারিদিকে মায়ের মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠেছে। ঐ যে পূর্ব গগনে ভারতের ভাগ্য-দেবতা তরুণ তপন-এর রূপে দেখা দিয়েছেন। স্বাধীনতার পুণ্য আলোক পেয়ে চীন, জাপান, তুরস্ক, মিশর পর্যন্ত আজ জগৎ-সভায় উন্নতশিরে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমরা কি এখনও মোহাবেশে ঘুমিয়ে থাকবে? তোমরা ওঠো, জাগো, আর বিলম্ব করলে চলবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী বণিককে গৃহপ্রবেশের পথ দেখিয়ে তোমাদের পূর্ব পুরুষরা যে পাপ সঞ্চয় করে গেছেন, এই বিংশ শতাব্দীতে তোমাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ভারতের নব-জাগ্রত জাতীয় আত্মা আজ মুক্তির জন্য হাহাকার করছে। তাই বলছি, তোমরা সকলে এসো, ভ্রাতৃবন্ধনের 'রাখি' পরিধান করে মায়ের মন্দিরে দীক্ষা নিয়ে আজ এই প্রতিজ্ঞা কর যে, মায়ের কালিমা তোমরা ঘুচাবে, ভারতকে আবার স্বাধীনতার সিংহাসনে বসাবে এবং হৃতসর্বস্বা ভারত লক্ষ্মীর লুপ্ত গৌরব ও সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করবে। বঙ্গ জননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মতো গ্রহণ করতে পার—তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে।... তোমরাই তো দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ। আজ এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের দিনে স্বাধীনতার বাণী যখন চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে তখন কি তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে?"

বাংলাদেশকে, বাঙালী জাতিকে সুভাষচন্দ্র গভীরভাবে ভালবাসতেন। বাংলার ঐতিহ্যে তিনি গর্বানুভব করতেন। বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি বিরাট ধারণা পোষণ করতেন। তাই তিনি বলেছিলেন,

"স্বরাজ-সংগ্রামে বাংলার স্থান সর্বাগ্রে। আমার মনের মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবেই এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার গুরুভার প্রধানতঃ বাঙালীকে বহন করতে হবে।...বাঙালীকে এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে—শুধু ভরতবর্ষে কেন—পৃথিবীতে তার একটা স্থান আছে—এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে। বাঙালীকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, আর স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভারত সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করবার শক্তি এবং জাতীয় শিক্ষার সমন্বয় করবার প্রবৃত্তি একমাত্র বাঙালীর আছে।"

ভারতীয় সভ্যতার প্রতি সুভাষচন্দ্রের ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। তিনি অতি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে শুধু ভারতের নিজের জন্য নয় সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্যই পরাধীন ভারতের মুক্তি একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি বলেছিলেন, "ভারতীয় জাতি একাধিকবার মরেছে—কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতের অস্তিত্বের সার্থকতা ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎ-সভায় শুনাতে হবে; ভারতের শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্বমানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না।...তাই ভারতের মনীষিগণ কত তমোময় যুগের মধ্যেও নির্নিমেষ নয়নে ভারতের জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁদের সন্ততি আমরা, আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য সফল না করে কি মরতে পারি?"

ছাত্রজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলতেন, "ছাত্র জীবনের উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষা পাস ও স্বর্ণপদক লাভ নহে—দেশ সেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জন করা। দেশ মাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব—ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত্; এই সাধনার আরম্ভ ছাত্র-জীবনেই করিতে হইবে।"

তিনি আরও বলতেন,

"মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল অন্তরায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা। যেখানে যখন অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার দেখিবে সেইখানে নির্ভীকহৃদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রতিবাদ করিবে এবং নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।…স্কুলে, কলেজে, ঘরে, বাইরে, পথে ঘাটে, মাঠে যেখানে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিবে সেখানে বীরের মত অগ্রসর হইয়া বাধা দাও—মুহূর্তের মধ্যে বীরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।…আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে শক্তি কিছু যদি সংগ্রহ করিয়া থাকি তাহা শুধু এই উপায়েই করিয়াছি।"

দেশের যুব শক্তিকে আহ্বান করে সুভাষচন্দ্র বললেন, "এস আমরা এক সঙ্গে বলি—আমরা মানুষ হব; নির্ভীক, মুক্ত খাঁটি মানুষ হব। নূতন স্বাধীন ভারত আমরা ত্যাগ, সাধনা ও প্রচেষ্টা বলে গড়ে তুলব। আমাদের ভারতমাতা আবার রাজরাজেশ্বরী হবেন; তাঁর গৌরবে আমরা আবার গৌরবান্বিত হব। কোথাও বাধা আমরা মানব না; কোনও ভয়ে আমরা ভীত হব না। আমরা নূতনের সন্ধানে, অজানার পশ্চাতে চলব। জাতির উদ্ধারের দায়িত্ব আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করব। ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করে আমরা আমাদের জীবন ধন্য করব; ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে বসাব।"

এইভাবে নানা উদ্দীপনাময় অভিভাষণের দ্বারা সুভাষচন্দ্র বাংলা তথা ভারতের সমগ্র যুব সমাজের চিত্তকে হরণ করে নিলেন। জাতীয়তার যে নূতন সঞ্জীবনী মন্ত্র তিনি প্রচার করলেন, তার ফলে জাতায় জীবনে এল পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রবল স্পৃহা। জাতীয়তা বা স্বাধীনতার এই নব মন্ত্র তাঁর লেখা 'তরুণের স্বপ্ন', 'ভারতপথিক', 'মুক্তি-সংগ্রাম', 'নূতনের সন্ধানে'…প্রভৃতি গ্রন্থে বিধৃত।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের জীবন অত্যন্ত ঘটনাবহুল। ভারতের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর হৃদয়-শোণিত। স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে তিনি কোনো কিছুই কল্পনা করতে পারতেন না। তাঁর সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি জাতায় কংগ্রেসকে সর্বোপরি বিরাট মহাভারতীয় জাতিকে সংগ্রামী করে তুলতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি প্রাণান্তকর পরিশ্রমে বহু প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, বহু প্রতিষ্ঠানের

সভাপতিত্ব করেছেন এবং বহু শোভাযাত্রা পরিচালনা করে বহুবার প্রহৃত ও কারারুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল এক দুর্ণিবার শক্তি। ঘরে বাইরে থেকে যতই আঘাত এসেছে তাঁর উপর, তাঁর স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প ততই দুর্বার হয়ে উঠেছে। এমন স্বাধীনতা-সংগ্রামী পৃথিবীর ইতিহাসেও খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৩০ সালে সুভাষচন্দ্র কলকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। তারপর তিনি উত্তর বঙ্গ পরিভ্রমণ করেন। পাবনা মিউনিসিপ্যালিটি-প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "নাগরিক জীবন, রাজনীতিক জীবন ও সামাজিক জীবনকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন জীবন মনে করা যাইতে পারে না। অভ্যন্তর হইতে একটা বিরাট আদর্শ উদ্ভূত না হইলে নাগরিক জীবন সুন্দর ও পূর্ণ হওয়া সম্ভব নহে, স্বাধীনতা ব্যতীত সেই আদর্শ উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব।...প্রভাত-সূর্যোদয়ে যেমন সুদীর্ঘ রজনীর তমসাবৃত মেঘমালা দূরে পলায়ন করে, তেমনি আমরা শীঘ্রই দেখিব যে যুগযুগান্তরব্যাপী পরাধীনতা প্রভাতের কুজ্ঝটিকার মতো অন্তর্হিত হইবে এবং স্বাধীনতা-সূর্য জাতির ললাটে গৌরবময় বিজয়টীকা পরাইয়া দিবে।"

অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আবার মতভেদ দেখা দিল। গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র তীব্র প্রতিবাদ করতে থাকেন। গান্ধীজী প্রভাবিত কংগ্রেসের এই আপোষ-মীমাংসার সিদ্ধান্তে দেশের যুব-সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন। করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনকালে তাঁরা 'নও-জোয়ান কংগ্রেস' নামে অপর একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। তরুণ সম্প্রদায়ের এই সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হলেন সুভাষচন্দ্র। এই সম্মেলনে গান্ধী-আরউন-চুক্তি এবং গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হল। নও-জোয়ান কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হলে সেই মণ্ডপেই নিখিল ভারত লাঞ্ছিত রাজনীতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। তাতেও সুভাষচন্দ্র সভাপতিত্ব করলেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন, "আইন-অমান্য-আন্দোলন বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া মহাত্মাজী দেশের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে গুরুতর ক্ষতি করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বড়লাটের চুক্তি দেশের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা মাত্র।"

১৯৩১ সালের ৩১শে মার্চ করাচী-মিউনিসিটিপ্যালিটি কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র সুভাষচন্দ্রকে এক স্বাগত-অভিনন্দনে 'লর্ড-মেয়র' বলে সম্বর্ধিত করেন। এই অভিনন্দনের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেন যে এই পরাধীন দেশে লর্ড বা প্রভু বলে কেউ নেই—সকলেই দাস।"

এর পরের ঘটনা হল হিজলী জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিশের লাঠি ও গুলি

চালানো এবং দু'জন রাজনৈতিক বন্দী—তারকেশ্বর সেন ও সন্তোষকুমার মিত্রের হত্যা। ব্রিটিশের এই বর্বর দমননীতির বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র করপোরেশনের মেয়র ও অল্‌ডারম্যানের পদ ত্যাগ করলেন। কংগ্রেস এই ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ না করায়, কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদও ত্যাগ করেন। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পুলিশের জুলুম ইত্যাদি বিষয়ে মহাত্মার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য বোম্বাই যান। গান্ধীজী তখন সবেমাত্র বিলাত থেকে গোলটেবিল-বৈঠকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ করে কলকাতায় ফিরে আসার পথে মধ্যপ্রদেশের কল্যাণ স্টেশনে তিনি পুলিশ কর্তৃক ধৃত হলেন, ১৯৩২ সালের ২রা জানুয়ারি। বাংলার বাইরে বিভিন্ন জেলে তাঁকে আটক রাখা হয়। ফলে তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটে। ডাক্তারের পরামর্শমতো স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ভারতের বাইরে যাওয়ার জন্য ভারত-সরকার তাঁকে মুক্তি দিলেন। ১৯৩৩ সালের ৮ই মার্চ তিনি অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরে পৌঁছান। সেখানে বসেই তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'ভারতীয় সংগ্রাম' (Indian Struggle). এই পুস্তক বিলেতে ছাপা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন ভারত সরকার ভারতে এই পুস্তকের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

পরে দেশে ফিরে, ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র 'হরিপুরা' কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি এবং সর্বোপরি ভারতের স্বাধীনতার দুর্নিবার স্পৃহার পরিচয় প্রকাশ পায়। সভাপতির অভিভাষণে তিনি দেশের মুক্তি-সংগ্রামের কথা ঘোষণা করলেন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে। তিনি বললেন সংগ্রামের পথই স্বাধীনতার পথ। আপোষের পথে স্বাধীনতা আসা অসম্ভব। মতবিরোধ সত্ত্বেও শেষে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে। তিনি বললেন, "মহাত্মাজী, জাতির এই পরম-লগ্নে জাতির ভাগ্য-বিধাতার কাছে, তোমার শতায়ু প্রার্থনা করি। আজ বিশেষ করে তোমাকেই প্রয়োজন। এই শতধা-বিভক্ত জাতিকে এক করবার জন্যে, তোমাকে প্রয়োজন, যাতে এই সংগ্রামের মধ্যে জগৎ খুঁজে পায় তার সংগ্রাম-বিভ্রান্তির সংশোধন-মন্ত্র। তোমাকে প্রয়োজন, ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ ব্যাখ্যার জন্য।...জগতের সাম্রাজ্য-লিপ্সার বিরুদ্ধে—মুক্ত ভারত মানে মুক্ত মানবতা।"

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে 'ত্রিপুরী কংগ্রেসে' সুভাষচন্দ্র আবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করে। কিন্তু আবার সেই মতবিরোধ তীব্রভাবে দেখা দিল সংগ্রামের নীতি নিয়ে অহিংসার মন্ত্রগুরু

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে। কংগ্রেসকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলবার যে কল্পনা তিনি এতদিন ধরে করে এসেছিলেন, তা সফল করার কোনো উপায় না দেখে তিনি সভাপতির পদ পরিত্যাগ করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি সংগ্রাম-পন্থী স্বতন্ত্র দল গঠন করলেন। 'ফরওয়ার্ড' হল তাঁর দলের মুখপত্র। তখন কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ তাঁকে তিন বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করলেন। সুভাষচন্দ্র আহ্বান জানালেন দেশের তাজারক্ত তরুণ ছাত্র সমাজকে সাম্রাজ্যবাদের দুঃশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে। প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী দম্ভের মিথ্যা প্রতীক হলওয়েল মনুমেণ্টের প্রতি। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করে যে এই মনুমেণ্ট দাঁড়িয়েছিল তা অপসারণের দাবী জানিয়ে সুভাষচন্দ্র ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেন। এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি সরকার কর্তৃক ধৃত ও বন্দী হন। কিন্তু আন্দোলন এমন তীব্র হয় যে মিথ্যার এই জমাট স্তূপটিকে সরকার অপসারিত করতে বাধ্য হন।

বারবার কারারুদ্ধ হয়ে কারাগার তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে সোজা মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়। তাই তিনি স্থির করলেন বিদেশী অত্যাচারী শাসক যদি স্বেচ্ছায় তাঁকে মুক্তি না দেয়, তাহলে তিনি নিজেই মুক্তি অর্জন করবেন, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তাই তিনি সরকারকে চিঠি লিখে জানালেন, "...এভাবে শুধু বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অবিচার আর অন্যায়ের সঙ্গে বারবার আপোষ করে, নিজের অস্তিত্ব অপমানের মূল্যে কিনে বেঁচে থাকা আমার আদর্শের বিপরীত ধর্ম। তাই স্থির করেছি, এই অপমানের মূল্য দিয়ে নিজের বেঁচে থাকাকে আর কিনতে চাই না। তাই স্বেচ্ছায় এই জীবন বিসর্জন দিতে সংকল্প গ্রহণ করেছি। সরকার আমাকে অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগ করে কারাগারে বন্দী করে রাখতে চান, তার প্রতিবাদে আমি জানাচ্ছি, হয় আমাকে মুক্তি দাও, নতুবা আমার মুক্তি আমি নিজেই অর্জন করবো। আমি বেঁচে থাকবো কি থাকবো না, তার দায়িত্ব একান্ত আমার নিজের।... আমি জানি, এই পৃথিবীতে যা কিছুই বস্তু, তা সবারই আছে মৃত্যু। জানি মৃত্যু নেই স্বপ্নের, মৃত্যু নেই আদর্শের, মৃত্যু নেই মানুষের মনের। আমি হয়ত আমার স্বপ্নের জন্য মরে যেতে পারি কিন্তু জানি আমার মৃত্যুর পরেও আমার সেই স্বপ্ন বেঁচে থাকবে, একদিন না একদিন তা সত্য হয়ে উঠবে শত সহস্র মানুষের জীবনে।...আমার আত্মা একদিন অনুরূপ শত শত আত্মায় জীবন্ত হয়ে উঠবে, আমার অসমাপ্ত কর্মকে সার্থক করে তুলবে, ...আমার মৃত্যু দিয়ে আমার জাতি বেঁচে উঠবে, সেই জীবন্ত জাতির মধ্যে আমিই বেঁচে থাকব... ।"

এই চিঠির শেষে সত্যাগ্রহী সুভাষচন্দ্র জানিয়ে দিলেন ২০শে নভেম্বর তিনি মহাব্রত আরম্ভ করবেন। নির্দিষ্ট দিনেই তিনি অনশনব্রত সুরু করলেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ৫ই ডিসেম্বর তাঁকে মুক্তি দিলেন। রোগজীর্ণ দেহে বাড়ী ফিরে এসে সুভাষচন্দ্র গৃহের এক নির্জন কক্ষে শয্যা নিলেন। বল্লেন তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না। দু-একজন অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কেউ আসত না তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ব্রিটিশ শাসক তাঁর মৌনতাকেও ভয় পেত। তাই তারা সতর্ক প্রহরী বসিয়েছিল বাড়ীতে। তার মধ্যে একদিন সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ী থেকে অন্তর্হিত হলেন। ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ পার হয়ে কাবুলে গেলেন। ওখানে কয়েকদিন অবস্থান করে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার মস্কোয় যাবার প্রয়াস পান। কিন্তু কোনো সুবিধা করতে না পারায় তিনি অবশেষে রোম হয়ে বার্লিনে পৌছলেন। উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের বাইরে থেকে দেশ উদ্ধারের চেষ্টা করা। একটা সুযোগও হঠাৎ জুটে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীদের সঙ্গে বিশেষ সুবিধা করতে না পারায় ইংরেজরা ব্রহ্মদেশ, সিঙাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যদের অসহায় ভাবে ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছিল। ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ভারতীয় সৈন্যরা জেনারেল মোহনসিংহ-এর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হল। ঠিক ঐ সময় জাপানে অবস্থানকারী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এসে এই সব সৈন্যদের নিয়ে 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' গঠন করলেন। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে না পারায় তিনি সুভাষচন্দ্রকে বার্লিনে সংবাদ পাঠালেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য। ত্বরিতে চলে এসে সুভাষচন্দ্র এলোমেলো সৈন্যবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করলেন। তাঁর পতাকাতলে সমস্ত সৈন্য মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে গেল। তিনি হলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নেতাজী। জাপানীরা আজাদ হিন্দ বাহিনীকে তাঁবেদার করে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তা হতে দেন নি। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা বজায় রেখেই এই বাহিনীর নেতৃত্ব করেছিলেন। ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই দিন তিনি আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন। তিনি শপথ নিলেন, "ভগবানের নামে শপথ গ্রহণ করিতেছি, যতদিন এই দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন আমি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিব।" তারপর তিনি তাদের বললেন, "ভারতের স্বাধীনতার সেনাদল! আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গর্বের দিন। আজ ঈশ্বর আমাকে এই কথা ঘোষণা করার অপূর্ব সুযোগ এবং সম্মান দিয়েছেন যে, ভারতকে স্বাধীন করার জন্য সেনাদল গঠিত হয়েছে।

হে আমার সতীর্থগণ, সেনাদল! তোমাদের রণধ্বনি হোক্—'দিল্লী চলো, দিল্লী চলো।' প্রাচীন দিল্লীর লাল কেল্লায় বিজয়োৎসব সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না। মনে রেখো যে তোমাদের মধ্য থেকেই স্বাধীন-ভারতের ভাবী সেনানায়ক-দল গড়ে উঠবে।...পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক হওয়ার চেয়ে বড় সম্মান এবং গৌরবের বিষয় অন্য কিছুই নাই। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি—আলোক এবং অন্ধকারে, দুঃখে এবং সুখে, পরাজয়ে এবং বিজয়ে আমি সর্বদা তোমাদের পাশে-পাশে থাকিব ; বর্তমানে তোমাদের আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখ-কষ্ট, দুর্গম অভিযান এবং মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু দিতে অসমর্থ।"

এই বাহিনীর মধ্যে নারী বাহিনীও ছিল। ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম বীরাঙ্গনা ঝাঁসির রানীর নামে এটির নাম হয়েছিল 'ঝাঁসির রানী বাহিনী'।

মতাদর্শে কংগ্রেস এবং মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বিরোধিতা থাকলেও, বাইরে গিয়ে সুভাষচন্দ্র উভয়ের প্রতিই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সৈন্যদলকে তিনি গান্ধী ব্রিগেড, নেহেরু ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড প্রভৃতি নামে বিভক্ত করেছিলেন ও তিনি সর্বপ্রথম গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে জানিয়েছিলেন শ্রদ্ধা মিশ্রিত অসংখ্য প্রণাম। বলেছিলেন ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে গান্ধীজীই হবেন সর্বাধিনায়ক। তাঁরই অহিংসা মন্ত্রের পতাকাতলে অহিংস সৈনিক হয়ে থাকবে আজাদ হিন্দ্ সৈনিকগণ।

আজাদ হিন্দ্ বাহিনী সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী গঠন করলেন আজাদ হিন্দ্ সরকার, স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র যা তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভা ও দুঃসাহসিকতার চরম নিদর্শন। আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠন করে নেতাজী ঘোষণা করলেন যে এ সরকার স্বাধীন ভারত সরকার হিসাবে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আচরণ করবে ও প্রত্যাশা করবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ব্যবহার। এই সরকার ও সৈন্যবাহিনী পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। নেতাজী প্রবাসী ভারতীয়দের আহ্বান জানালেন, "করো সব্ নিচাওয়ার, বনো সব্ ফকীর" (সর্বস্ব দিয়ে ফকীর হও)। বহু ধনী ব্যবসায়ী এমন কি সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবনের সমস্ত সঞ্চয়—যথা সর্বস্ব নেতাজীর হাতে তুলে দিলেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে সফল করতে। নেতাজী বলতেন, "তুম্ হাম্‌কো খুন্ দো, ম্যায় তুম্‌কো আজাদী দুঙ্গা" (তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দোব)। আজাদ হিন্দ্ বাহিনী যখন ভারত সীমান্তের পানে এগিয়ে চলেছে জোর কদমে, তখন নেতাজী তাদের উৎসাহিত করে বললেন, "ঐ দূরে, বহুদূরে ঐ নদীর ওপারে, ঐ বনভূমি আর পর্বত পেরিয়ে রয়েছে আমাদের দেশ, চির-ইপ্সিত জন্মভূমি, যার কোলে বসে প্রথম এই পৃথিবীকে দেখেছি, আর আজ আবার ফিরে চলেছি মার কোলে।"

ঐ শোন, ভারত ডাকছে, ডাকছে ভারতের রাজধানী, চিরনগরী দিল্লী, ডাকছে আটত্রিশ কোটি আশি লক্ষ ভারতবাসী, ভাই ভাইকে ডাকছে, রক্তে এসে পৌঁচেছে রক্তের ডাক।"

অমিতবিক্রমে সংগ্রাম করতে করতে আজাদ হিন্দ বাহিনী মণিপুর রাজ্যের ইম্ফল অবধি এগিয়ে এসে এখানে ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করে। কিন্তু পরে চারিদিকের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। অবশেষে তাদের পরাজয় ঘটে। ১৯৪৫ সালের ২৪শে এপ্রিল নেতাজী ব্রহ্মদেশ থেকে আবার অন্তর্হিত হন। পরাজিত হলেও স্বাধীনতা সংগ্রামের যে জলন্ত দৃষ্টান্ত নেতাজী রেখে গেলেন, তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ বাহিনী মহাভারতীয় জাতির প্রাণে শৌর্য, বীর্য ও পৌরুষের প্রতিষ্ঠা করেছে। জাতির অন্তরে তার অমোঘ প্রেরণা সদা জাগ্রত, যা যুগ যুগ ধরে জাতিকে অফুরন্ত প্রেরণা যোগাবে। বর্তমান স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূলেও তো নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর অবদান অসামান্য। একবার সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আহ্বান করে 'দেশনায়ক' আখ্যায় বরণ করে বলেন, "তরুণ বাংলা তথা ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সুভাষচন্দ্র, তাঁর নেতৃত্বে দেশের মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার হবে। বাংলাদেশের জননায়কের পদ সুভাষচন্দ্রের। তিনি দেশের অন্তরের বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন, এই আশা নিয়ে আমি সুদৃঢ়-সংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি।"

সুভাষচন্দ্র জীবিত কি মৃত এই বিষয়ে ভারতবাসী আজও কোনো সঠিক প্রমাণ পায় নি। তাই আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে সমগ্র ভারতবর্ষ আজও বিভ্রান্ত। এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের সুহৃদ্ সাহিত্যিক বিজয়রত্ন মজুমদার বলেছেন, "সুভাষচন্দ্র জীবিত অথবা লোকান্তরিত, কেহ জানে না। আই. এন. এ-র (আজাদ-হিন্দ-ফৌজ) দৃঢ় বিশ্বাস, সুভাষচন্দ্র জীবিত, সুভাষচন্দ্রের দেশবাসী মনে করে, পরাধীন ভারতের চির-জাগ্রত আত্মার মতো ভারতের মুক্তিকামী সুভাষচন্দ্র মৃত্যুঞ্জয়ী, অবিনশ্বর।

নেতাজী জীবিত কি মৃত, তাহাতে কিছু আসে যায় না। গ্যারিবল্ডি কি মরিয়াছেন? শিবাজী কি মৃত? রাণা প্রতাপসিংহ চিরদিন অমর! জর্জ ওয়াশিংটনের বিনাশ নাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও চিরজীবী!

শুধু ভারতের নয়, শুধু এশিয়ার নয়, পৃথিবীর যেখানে যে দেশে, যে কোনো পরাধীন জাতি আছে, সেইখানেই, সেই দেশে, সেই মানব-সমাজের প্রত্যেকটি নরনারী সুভাষচন্দ্রের নামের পাদমূলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইবে।"

চির-বিদ্রোহী কবি

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার মন্ত্রপ্রচারে কাজী নজরুল ইস্‌লাম অনন্যসাধারণ। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা ভাষায় আর কোনো কবি এত স্বদেশী গান ও কবিতা লেখেন নি। বাংলা সাহিত্য নজরুলের মধ্যেই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়। বিদ্রোহীরূপে, বিপ্লবের কবিরূপে, নজরুল সমগ্র দেশে সুপরিচিত। বাল্যকাল থেকেই তিনি পরাধীনতার তীব্র জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। আর তাঁর সেই অন্তরের মর্মজ্বালা ব্যক্ত করেছেন বিদ্রোহের অগ্নিক্ষরা ভাষায়। তাঁর বিপ্লবী সাহিত্য বাংলাদেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। নেতানির্বিশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত যোদ্ধা তাঁর লেখায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই তাঁকে নেতারও নেতা বলা যায়। যেখানে অন্যায়, অবিচার ও অসত্য দেখেছেন, তারই বিরুদ্ধে কবি তাঁর লেখনী ধারণ করেছেন। জাতির জড়তার বিরুদ্ধে, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, জাতিভেদের বিরুদ্ধে, হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, সর্বোপরি মাতৃভূমির স্বাধীনতা-অপহরণকারী অত্যাচারী শোষক বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে নজরুল তাঁর আপোষহীন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে বাংলা সন ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ বিদ্রোহী কবি নজরুল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ফকীর আহম্মদ ও মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। ফকীর আহম্মদ সাহেব সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন। নজরুল যখন বালক মাত্র, তখন ফকীর সাহেব ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে বাল্যকাল থেকেই নজরুলকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাই বোধ হয় কবির ছেলেবেলার নাম ছিল 'দুঃখুমিয়া'। কিশোর বয়স থেকেই এই দুঃখুমিয়া অপরের দুঃখেও বিশেষ ব্যথা অনুভব করতেন। ঐ সময় তাঁর আর এক নাম ছিল 'তারাক্ষেপা'। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো উপাধি কবির

ছিল না বটে; কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। বাল্যকাল থেকেই তাঁর জানবার কৌতূহল ছিল উদগ্র। অধ্যয়নস্পৃহাও ছিল সুতীব্র। হাতের কাছে যখন যা বই পেতেন, তাই পড়ে শেষ করতেন। এইভাবে ইংরেজী, বাংলা ও ফার্সী সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার সুসমৃদ্ধ করেছিলেন ?

নজরুলের পিতা ফকির আহম্মদ সাহেব কাব্যামোদী ছিলেন। বাংলা ও ফার্সী কাব্যে তাঁর অনুরাগ ছিল। ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত তাঁর এক কাকাও কাব্য চর্চা করতেন। ঐ কাকার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে নজরুল বালক অবস্থাতেই কবিতা লিখতে সুরু করলেন। এগার বছর বয়সে তিনি 'লেটোর' দলে যোগ দেন। এই লেটোর দল গ্রাম্য গাথা গেয়ে লোকের মনোরঞ্জন করে বেড়াত। বালক নজরুল প্রথমে এই লেটোর দলে গান গাইতেন। পরে সময়োপোযোগী গান, প্রহসন, যাত্রা, নাটক প্রভৃতি লিখে গ্রামে গ্রামে দল নিয়ে অভিনয় করতেন। লেটোর দল থেকেই নজরুলের সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ। এই সময় কবির পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠে। তখন কবি নজরুল গ্রাম থেকে পালিয়ে এসে আসানসোলে এক রুটির দোকানে আট টাকা মাইনের একটি চাকরি নেন। তাঁকে এখানে চাকরের কাজ করতে হত। মালিক তাঁর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করত!

আবাল্য কবি নজরুল দেশের পরাধীনতার জন্য অন্তরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করতেন। তাঁর বয়স যখন সতেরো বছর, তখন তিনি ইংরেজের কবল থেকে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করে পূর্ণ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। বহু চিন্তা-ভাবনার পর স্থির করলেন যে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে ইংরেজকে তাড়ান সম্ভব নয়। তখন তিনি ইংরেজের সৈন্যদলে ঢুকে সামরিক শিক্ষা উত্তমরূপে শিখে এবং দেশের তরুণদের শিখিয়ে ইংরেজকে আঘাত হানবার পরিকল্পনা করলেন। এই সংকল্প নিয়ে ১৯১৬ সালে তিনি উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালী পল্টনে যোগ দিলেন। এজন্য তাঁকে করাচিতে সৈন্য ব্যারাকে অবস্থান করতে হয়। সামরিক শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অধ্যয়ন এবং কাব্য রচনাও চলত সমানতালে। তিন বছর সৈন্যদলে কাটিয়ে নজরুল ১৯১৯ সালে কলিকাতায় ফিরে এলেন। এই কলিকাতায় বসেই কবি তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখলেন। উহা প্রথমে 'মোসলেম ভারত' মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয় এবং পরে ১৯২১ সালে পুনর্মুদ্রিত হয় 'বিজলী' পত্রিকায়। এই একটি মাত্র কবিতা লিখেই নজরুল যশের উচ্চ শিখরে আরোহণ করলেন। বাংলা সাহিত্যাকাশে তিনি এক নতুন জ্যোতিষ্করূপে পরিগণিত হলেন। বাংলার ঘরে ঘরে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। 'বিদ্রোহী' কবিতা সারা দেশে এমন উন্মাদনা সৃষ্টি করল যে একই মাসে 'বিজলী' পত্রিকা দু'বার ছাপতে

হয়েছিল। পরে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতারূপে প্রকাশিত হয়। কয়েক শতাব্দী ধরে পরাধীনতার পাপে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। তার আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস বোধ প্রায় বিনষ্ট হতে বসেছিল। তাই কবি জাতিকে সর্বপ্রকার দীনতা ও কাপুরুষতার উর্ধ্বে তুলতে চেয়ে লিখলেন :

"বল বীর
বল উন্নত মম শির !
শির নেহারি আমারি নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির।"

সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য পরাধীন দেশগুলির উপর যে সব আইন জারী করেছে তা মানবতাবিরোধী। তিনি অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে গোপন অস্ত্র 'টর্পেডো' ও 'মাইনে'র মতো কাজ করতে চান। তাই বলেছেন :

"আমি মানি নাকো কোন আইন
আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন।"

যে সাম্রাজ্যবাদী দুষ্টচক্র বিশ্বের বহু দেশকে পরাধীন করে রেখে অশান্তির সৃষ্টি করছে, কবি তাদের নিক্ষত্রিয় করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তাই তিনি লিখলেন :

"আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব আনিব শান্তি শান্ত উদার—
আমি হল বলরাম স্কন্ধে
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে—
—নবসৃষ্টির মহানন্দে।"

চিরবিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর কঠোর সংকল্পের কথা ঘোষণা করে বলছেন যে যতদিন না পৃথিবীতে অন্যায় অত্যাচার বন্ধ হয় ততদিন তিনি শান্ত হবেন না। তিনি বলেছেন :

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত॥"

সবশেষে চিরবিদ্রোহী কবি আবার তাঁর বিদ্রোহী আত্মার আত্মপরিচয় দিচ্ছেন,

"আমি চিরবিদ্রোহী বীর
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা
চির-উন্নত শির"।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতেরস্বাধীনতা-সংগ্রামে এই "বিদ্রোহী" কবিতাটি সংগ্রামীদের

নিকট প্রেরণার এক অফুরন্ত উৎসস্থল ছিল। সর্বত্র সভা-সমিতিতে এই কবিতা আবৃত্তি করা হত। পরে ব্রিটিশ সরকার এই কবিতাটির আবৃত্তি ও পঠন-পাঠন আইন করে বন্ধ করে দেয়। ১৯২০ সালে কলিকাতা-কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর 'অহিংস অসহযোগ' আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হবার এক বছর পরে ১৯২২ সালে সারা ভারতে বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয়। তাতে স্কুল, কলেজ, আইন-আদালত সব বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় কবি নজরুল অজস্র বিপ্লবাত্মক কবিতা লিখে মুক্তি-সংগ্রামের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহ-গ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' এই সময় প্রকাশিত হয়। অগ্নিবীণার কবিতাগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশের আপামর জনসাধারণের মনে জাতীয়তার আগুন ধরিয়ে দেয়। কবি নিজেও তখন বাংলার গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরে স্বরচিত স্বদেশী কবিতাসকল আবৃত্তি ও গান করে দেশবাসীকে মাতিয়ে তুলতেন। সংগ্রামের জয় ঘোষণা করে এবং পুরাতন জীর্ণদশাগ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করে নতুন দেশ গঠনের উদাত্ত আহ্বান জানালেন চির-নতুনের চির বিদ্রোহী-কবি নজরুল :

"এবার মহা-নিশার শেষে
আস্‌বে ঊষা অরুণ হেসে করুণ বেশে।
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়।"

কবির দেশাত্মবোধ ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ বিদেশী শাসক সেই সত্যকে টুটি টিপে মারতে চায়। তাই কবি দেশভক্তদের আহ্বান জানিয়েছেন যারা কারাগারকে ভেঙে ফেলবে :

"সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই কিরে কেউ সত্য-সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়?
শিকলগুলো বিকল ক'রে পায়ের তলায় মাড়ায়,
বজ্র-হাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায়?
নাজাত-পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা,
ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষের খাঁচা?
ঝুটার পায়ে শির লুটাবে, এতই ভীরু সাঁচা?"

অসহযোগ আন্দোলনে যখন সেচ্ছাসেবকরা দলে দলে কারা ও মৃত্যুবরণ করতে লাগলেন। তখন কবি নজরুল মুক্তিকামীদের হৃদয় আশায় উদ্দীপনায় ভরে দিয়ে গাইলেন :

"কাঁদিব না মোরা, যাও কারা মাঝে যাও তবে বীর-সঙ্ঘ হে,
ঐ শৃঙ্খলই করিবে মোদের ত্রিশ কোটি ভ্রাতৃ-অঙ্গ হে।
মুক্তির লাগি মিলনের লাগি আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ
হিন্দু-মুসলিম চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরই বিজয়-গান।
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি তরবারী
আমরা তাদেরই ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা গীত তারি।"

দেশবাসীর মন থেকে জড়তা, ভীরুতা ও নিষ্ক্রিয়তা দূর করে জাতিকে বিপ্লবমুখী করে তোলবার জন্য নজরুল ১৯২২ সালের ১২ই অগস্ট 'ধুমকেতু' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। অত্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিত এই 'ধুমকেতু' দেশের মধ্যে বিরাট প্রেরণার সঙ্গে সঞ্চার করল। 'ধুমকেতু' যা ছাপা হত, চাহিদা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কেনবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। 'ধুমকেতু'তে নজরুল লিখেছিলেন, "মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে 'জয় প্রলয়ঙ্কর' বলে 'ধুমকেতু'কে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা সুরু হল। আমার কর্ণধার আমি। আমাকে পথ দেখাবে আমার সত্য।...এদেশের নাড়ীতে নাড়ীতে অস্থিমজ্জায় যে পচন ধরেছে তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না।...দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামী, মেকি তা সব দূর করতে 'ধুমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনী।...'ধুমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।...পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে। সকল কিছু নিয়ম-কানুন, বাঁধন, শৃঙ্খলমানা নিষেধের বিরুদ্ধে।...সত্যকে জানবার জন্য বিদ্রোহ চাই।...বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ যদি করতে পার, প্রলয় যদি আনতে পার তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই—কল্যাণ আসবেই।"

'ধুমকেতু'র উগ্র বিপ্লবী মনোভাব ও দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট এর জনপ্রিয়তা দেখে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকার ভীত হল। এবং বিদ্রোহী কবির লেখনী স্তব্ধ করে দেবার সুযোগ খুঁজতে লাগল। এমন সময় একদিন কবি আহ্বান জানালেন অসুর-নাশিনী দুর্গাকে অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী-শাসক ব্রিটিশ শত্রুকে বধ করার জন্যে :

"আর কত কাল রইবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গকে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসী
ভূভারত আজ কসাইখানা আসবি কখন সর্বনাশী।"

কবিতাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ নজরুলের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করল এবং 'ধূমকেতু'র সমস্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করল। কবি কিছুদিন ফেরার হয়ে ঘুরে বেড়ালেন। শেষে একদিন পুলিশ তাঁকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করে কলিকাতায় নিয়ে এল। ব্যাঙ্কশাল পুলিশ কোর্টে বিচার আরম্ভ হলে তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য বহু উকিল বিনা পারিশ্রমিকে এগিয়ে আসেন। তাঁর বিচারক ছিলেন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইন হো। তিনিও একজন কবি ছিলেন। কিন্তু মানবপ্রেমিক স্বাধীনতাকামী কবির প্রতি সাম্রাজ্যবাদের অনুচর বিচারক কবির কোনো সহানুভূতি ছিল না। রাজদ্রোহের অভিযোগে ১৯২৩ সালের ৮ই জানুয়ারি নজরুলের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তিনিই বাংলাদেশে একমাত্র সাহিত্যিক দেশাত্মবোধক কবিতা রচনার জন্য যাঁর কারাদণ্ড হয়। কারাদণ্ড ঘোষিত হবার পর কবি আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষায় এমন এক জবানবন্দী দিয়েছিলেন যা বাংলা সাহিত্যে চির অমর হয়ে আছে। কবি বলেছিলেন :

"আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজদ্রোহী। তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত। একধারে—রাজার মুকুট; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আর জন সত্য, হাতে ন্যায়-দণ্ড। রাজার পক্ষে—রাজার নিযুক্ত রাজ বেতনভোগী রাজ-কর্মচারী। আমার পক্ষে—সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অন্তকাল ধরে সত্য—জাগ্রত ভগবান।...রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে রুদ্র। রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ; আমার পক্ষে যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমার্থ। রাজার বাণী বুদ্‌বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র।" ...আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ। কেননা আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা; উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্য বারি, ভগবানের আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস।...কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো—একি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন সায় দিয়া, হয়ত সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত-আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায় শাসন-লিখা বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলে কি আমি আজ রাজদ্রোহী?

শুনেছি আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির

বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলাশেষের শেষ খেয়া ঐ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে। আর রক্ত ঊষার নব শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে। তাকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন, তাই আমাদের উভয়ের অস্ততারার আর উদয়তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না।

কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার শান্ত কোল এ অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে। পরাধীনা অনাথিনী জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কিনা জানি না, যদি হয় বিচারককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব।...আমার ভয় নাই। আমি অমৃতস্য পুত্রঃ। আমি জানি—

"ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন
আছে তার আছে ক্ষয় ;
সেই সত্য আমার ভাগ্য বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।"

বিচারের পর কবিকে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়। কিছুদিন পরে সাধারণ কয়েদীর মতো কোমরে দড়ি বেঁধে হুগলী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে রাজবন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হত। বিদ্রোহী নজরুল সমস্ত বন্দীদের নিয়ে জেলের ঐ অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন ও অনশন ধর্মঘট সুরু করলেন। সেখানে কবি বহু গান রচনা করেছিলেন। একদিন কবি একটি গান রচনা করে গাইলেন :

"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী।"

বিক্ষুব্ধ রাজবন্দীরা এই গান শুনে তাঁদের মুক্তি সংগ্রামের সফলতার কামনায় অধীর হয়ে উঠতেন। জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের প্রতিকারে কঠোর সংকল্প গ্রহণ করতেন। নজরুল রাজবন্দীদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন ভেবে তাঁর উপর জেল কর্তৃপক্ষ নির্যাতন সুরু করল। তাঁর হাতে হাত-কড়া ও পায়ে বেড়ি পরিয়ে অন্যান্য রাজবন্দীদের থেকে পৃথক করে নির্জন "সেলে" স্থানান্তরিত করা হল। কবি সঙ্গে সঙ্গে "শিকল পরার গান"টি রচনা করে হাতকড়া সেলের লোহার গরাদের সঙ্গে ঘা মেরে বাজিয়ে গেয়ে উঠলেন :

"এই শিকল পরা ছল্ মোদের এ শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল!
তোমার বন্দী কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়,
এই বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করবো মোরা জয়,
এই শিকল বাঁধা পা' নয় এ শিকল ভাঙা কল।"

রাজবন্দীরা যাতে নির্ভীক হয়ে উঠতে পারে, তারা যাতে তাদের সংকল্পে অধিকতর দৃঢ় হয়, সেজন্য কবি একের পর এক কবিতা লিখে গেয়ে যেতে লাগলেন। অনেক সময় কাগজ কলম, পেন্সিল কিছুই থাকত না। সম্পূর্ণ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করেই মনে মনে গানগুলি রচনা করে গাইতেন। এই সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত "সেবক" কবিতা রচনা করেন। কবির সঙ্গে এমনকি সাধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত কবির সংস্পর্শ পেয়ে দেশভক্ত হয়ে উঠেছিল। 'সুপার বন্দনা', 'ভাঙার গান', 'মরণ-বরণ', 'বন্দী-বন্দনা' প্রভৃতি নজরুল জেলে রচনা করেছিলেন।

নজরুলের অনশনের খবর বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ায় সমগ্র দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলং-এ ছিলেন। সেখান থেকে তার করে তিনি নজরুলকে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ জানালেন—"Give up hunger-strike, our literature claims you." এ তারবার্তা নজরুলের কাছে পৌছল না। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সাক্ষাৎ করতে গিয়ে অনুমতি পেলেন না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে কলিকাতায় এক বিরাট জনসভায় হুগলী জেলে রাজবন্দীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। দেশবাসীর আন্দোলনে ও রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে ইংরেজ সরকার রাজবন্দীদের দাবী মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে নজরুল চল্লিশ দিন পরে অনশন ভঙ্গ করেন।

কবি জেল থেকে বেরিয়ে এলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে তাঁকে এলবার্ট হলে জাতির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অভিনন্দনের উত্তরে কবি নজরুল বলেছিলেন, "আমাকে বিদ্রোহী বলে খামকা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনদিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, আমারো অনেক আগে থেকে মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি ওতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।"

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির এক অধিবেশনের সভাপতিরূপে নজরুল তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন, "সকল ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা বিসর্জন দিতে হবে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে নয়, ন্যায়ের অধিকারের দাবীতেই আমাদিগকে বাঁচতে হবে।

আমরা কারও নিকট মাথা নত করব না—রাস্তায় বসে জুতো সেলাই করব। নিজের শ্রমার্জিত অর্থে জীবনযাপন করব—কিন্তু কারও দয়ার মুখাপেক্ষী হব না।…আমি আমার জীবনে এ শিক্ষাকেই গ্রহণ করেছি। দুঃখ সয়েছি, আঘাতকে হাসিমুখে বরণ করেছি, কিন্তু আমার অবমাননা কখন করিনি। নিজের স্বাধীনতাকে কখন বিসর্জন দিই নি। 'বল বীর চির উন্নত মম শির।'

অবনত মানুষের যুগযুগ সঞ্চিত অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও কবি সবল হস্তে লেখনি ধারণ করেছিলেন। "জাতের নামে বজ্জাতি" লিখে তিনি জাতিভেদ প্রথার তীব্র নিন্দা করলেন। এজন্য তিনি দেশের প্রাণ তরুণদের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে প্রাচীনপন্থীদের পোষা টিয়া এবং তরুণদের আকাশের পাখীর সঙ্গে তুলনা করলেন :

> "জিঞ্জির-পায়ে দাঁড়ে ব'সে টিয়া, চানা খায় ; —গায় শিখানো বোল,
> আকাশের পাখী! ঊর্ধ্বে উঠিয়া কণ্ঠে নতুন লহরী তোল্।
> তোরা ঊর্ধ্বের-অমৃত-লোকের, ছুড়ুক নীচেরা ধুলাবালি ;
> চাঁদেরে মলিন করিতে পারে না কেরোসিনী ডিবি কালি ঢালি'।
> বন্য-বরাহ পঙ্ক ছিটাক, পাঁকের ঊর্ধ্বে তোরা কমল,
> ওরা দিক কাদা, তোরা দে সুবাস, তোরা ফুল—ওরা পশুর দল !"

নজরুলের জাতীয় সঙ্গীতগুলি বহু শতাব্দীর জড়তাপ্রাপ্ত অর্ধচেতন জাতিকে আঘাতের পর আঘাত হেনে সুপ্তি থেকে জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁর পূর্বগামী রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিরা বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করে দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন বটে ; কিন্তু নজরুলের মতো এমন উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারেন নি। নজরুলের রচনার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহের সুর ছিল। তাই তাঁর গান গেয়ে, কবিতা আবৃত্তি করে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, হাসিমুখে ফাঁসীর মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেছে। অসহযোগ আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবকরা প্রচণ্ড মার খেত। কিন্তু নজরুলের গান ও কবিতা তাদের সব ব্যথা ভুলিয়ে দিত। নজরুলই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে সমর-সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর রচিত 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল', 'অগ্র পথিক হে সেনাদল', 'টলমল টলমল পদভরে বীরদল চলে সমরে', 'বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ,' 'চলরে চপল তরুণদল', 'নাহি ভয় নাহি ভয়', প্রভৃতি সমরসঙ্গীতগুলি জাতির চিত্তকে উদ্বেল করে তুলছিল। শুধু এ দেশের নয় আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসেও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।